রেহমান সোবহান

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ঃ

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য

”বেশি-বেশি বই পড়ুন

আলোকিত জীবন গড়ুন”

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

বাংলাদেশের অভ্যুদয়

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য

রেহমান সোবহান

রেহমান সোবহান আমাদের দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ। কিন্তু তাঁর পরিচয় কেবল এর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। সেই ষাট দশকের গোড়ায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের উপনিবেশবাদী আচরণ—শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের স্বরূপ যাঁরা উদ্‌ঘাটন করেছিলেন অকাট্য যুক্তি ও তথ্য সহকারে তিনি তাঁদের অন্যতম। সে এক নিরলস ও অসমসাহসী লড়াই সেদিন তাঁদেরকে লড়তে হয়েছিল পাকিস্তানি শাসক ও তাদের বশংবদ আমলা-অর্থনীতিবিদদের বিরুদ্ধে। আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে যা সুদৃঢ় ভিত্তি দিয়েছে। তাঁদের প্রস্তাবিত 'দুই অর্থনীতি'র ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছিল ছ' দফা দাবিতে। *বাংলাদেশের অভ্যুদয় : একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য* বইটির প্রথম অংশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সে অর্থনৈতিক ভিত্তি ও তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাসকেই লেখক অত্যন্ত যত্ন ও প্রচুর তথ্য সহযোগে তুলে ধরেছেন। সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে সে পর্বের এত বিশদ, অনুপুঙ্খ বিবরণ সম্ভবত এ বইটিতেই প্রথম দেয়া হয়েছে।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী লাহোরে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠক, সত্তরে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো প্রণয়ন, একাত্তরের মার্চে অসহযোগ আন্দোলন—ইয়াহিয়া-ভুট্টো ও তাদের সহযোগীদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহকর্মীদের শাসনতান্ত্রিক আলোচনা এসব প্রতিটি পর্বেও লেখকের ছিল সক্রিয় ভূমিকা। একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমাদের ইতিহাসের সে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বিবরণও লেখক বস্তুনিষ্ঠভাবে এ বইয়ে দিয়েছেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন দিনগুলোতে বিদেশে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত সংগঠনেও, অন্যান্য অনেকের সঙ্গে, রেহমান সোবহান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ব্রিটেনে, যুক্তরাষ্ট্রে, ফ্রান্সে, জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে তিনি একদিকে পাকিস্তানিদের গণহত্যা ও বর্বরতার চিত্র তুলে ধরেছেন অন্যদিকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ও সেখানকার প্রেসের অপপ্রচারের মোকাবেলা করেছেন। তথ্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের অবদানের কথা আমাদের অনেকেরই হয়ত কমবেশি জানা। কিন্তু কীভাবে, কত কঠিন চেষ্টা ও শ্রমে, আর কত প্রতিকূলতা উজিয়ে, তাকে সম্ভব করে তুলতে হয়েছিল তার কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা পাঠক এই বইটিতে পাবেন।

প্রফেসর রেহমান সোবহান তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন শিক্ষক হিসেবে। বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। এছাড়া বিভিন্ন সময় তিনি বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর মহাপরিচালক, জাতিসংঘ উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটির সদস্য ইত্যাদি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের উপদেষ্টা পরিষদে তিনি ছিলেন পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা। বর্তমানে তিনি সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান। অর্থনীতিবিদ হিসেবে তাঁর গবেষণা বা কাজের ক্ষেত্র হল প্রধানত সরকারি খাত, বিরাষ্ট্রীয়করণ, সাহায্য ও উন্নয়ন, রাষ্ট্রের ভূমিকা, পল্লী উন্নয়ন, ভূমি সংস্কার, এবং অতি সাম্প্রতিককালে, শাসনপদ্ধতি। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Rethinking the Role of the State in development, Public Allocative Strategies Rural Development and Poverty Alleviation : A global Perspective, Debt Default to the Development Finance institutions, From Aidependence to Self-reliance, Agrarian Reform and Social Transformation, Planning & Public Action for Asian Women.

প্রকাশনার পাঁচ দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© লেখক

দ্বিতীয় মুদ্রণ
মে ২০০০
প্রথম মাওলা সংস্করণ
জুন ১৯৯৮

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১৯৪৬৩

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ
বাংলাবাজার কমপিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
বসুন্ধরা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড
৫১/৫২ বনগ্রাম লেন, ঢাকা ১১০০

দাম
একশত টাকা মাত্র

ISBN 984 410 102 6

BANGLADESHER ABBHUDAY : By Rehman Sobhan. Published By Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed By Quyyum Chowdhury. Price : Taka One Hundred Only.

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাককে—
আমার শিক্ষায় যাঁর অবদান অপরিসীম,
যাঁর সস্নেহ বন্ধুত্ব আমাকে ও আমার পরিবারকে
ঘিরে রেখেছে বছর বছর ধরে

ভূমিকা

এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়বিষয়ক রচনাগুলো আমি গত বিশ বছরের মধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার জন্য লিখেছিলাম।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো লেখা হয়েছিল—এভাবেই রচনাগুলোকে বিচার করলে ভালো হবে। গ্রন্থটি তাই কোনো ইতিহাস হয়নি, তবে ইতিহাসবিদদের কাঁচামাল হিসেবে এটি ব্যবহৃত হতে পারে। এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বাংলাদেশ কর্তৃক তিন খণ্ডে প্রকাশিত বাংলাদেশের ইতিহাস গ্রন্থটির জন্যই বিশেষভাবে ১৯৯১ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কিত প্রথম অধ্যায়টি লেখা হয়েছিল। ঐ ইতিহাসগ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণের জন্য মূল লেখাটি ইংরেজিতেই লেখা হয়েছিল। এশিয়াটিক সোসাইটির সদয় অনুমতিক্রমেই সেই অধ্যায়টির বাংলা অনুবাদ এই গ্রন্থে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে।

বাঙালি ও পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদগণ ও সে-সময়কার অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারকদের মধ্যে যেসব বিতর্ক অনুষ্ঠিত হত সেগুলোতে আমিও জড়িত থাকতাম। আমার সেই অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছি বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিবিষয়ক প্রথম অধ্যায়টি। অধ্যায়টিতে সে-সময়কার কিছু অ্যাকাডেমিক কাজ ও প্রতিবেদন থেকে নেওয়া মালমশলা ব্যবহার করা হয়েছে। বাঙালি অর্থনীতিবিদরা কিন্তু তখনই রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় সম্মুখ সারিতে চলে এসেছিলেন। ফলে, আমি যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের এক নবীন ও স্বল্পপরিচিত শিক্ষক ছিলাম, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বঞ্চনা নিয়ে লেখা আমার রচনাগুলো কিন্তু যথেষ্ট প্রচার লাভ করেছিল, কেননা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ঘিরে আবর্তিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আমাদের অ্যাকাডেমিক কাজ যথেষ্ট খোরাক জোগাত। পাকিস্তানি শাসকমহলের অনেক ক্ষমতাবান ব্যক্তিই আমার রচনাসমূহের বিরুদ্ধে আপত্তি বা প্রতিবাদ প্রকাশ করেছেন, যাঁরা ভিন্নতর পরিস্থিতিতে এক নগণ্য শিক্ষকের রচনাকে অনায়াসেই উপেক্ষা করতেন। কিন্তু যেহেতু পার্লামেন্টের প্রকাশ্য বিতর্কে এবং জনসভাসমূহে আমাদের যুক্তি, প্রমাণ ও পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হত, সেজন্যে এগুলোকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেওয়া সহজ ছিল না। প্ল্যানিং কমিশনে কর্মরত এক পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদের কাছে শুনেছিলাম যে বাঙালি অর্থনীতিবিদদের যুক্তি-প্রমাণ খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে ডেপুটি চেয়ারম্যানের আদেশে সেখানে নাকি একটা ছোট সেল খোলা হয়েছে। কথাটা শুনে বেশ মজা পেয়েছিলাম। আমার বয়েস যখন ত্রিশও হয়নি—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র লেকচারার মাত্র—তখনই আমাকে

বিভিন্ন সেমিনারে, মঞ্চে পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী এম. শোয়েব, প্ল্যানিং কমিশনে পরপর নিযুক্ত দুই ডেপুটি চেয়ারম্যান সায়ীদ হাসান ও এম এম আহমেদ প্রমুখ বাঘাবাঘা লোকদের সঙ্গে প্রকাশ্য বিতর্ক করতে হয়েছে; বিতর্কে দাঁড়াতে হয়েছে আইউব আমলের মন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর সঙ্গে যখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ১৯৬২ সালে কোনো এক ঐতিহাসিক ঘটনা উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ক্লাবে বক্তৃতা করেছিলেন; পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী মনজুর কাদিরের সঙ্গেও আমাকে বিতর্কে নামতে হয়েছে।

আবার, আমার তিরিশ বছর বয়েস হওয়ার আগেই প্রয়াত এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যান্য নেতার সঙ্গে আমাকে অর্থনৈতিক কর্মপন্থা ও রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে আলোচনায় বসতে হয়েছে। আমি একজন বিশিষ্ট দক্ষ অর্থনীতিবিদ ছিলাম বলেই আমার পক্ষে এসব সম্ভব হয়েছিল, তা কিন্তু নয়—এর কারণ ছিল আমাদের রচনাসমূহে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের আশু করণীয়গুলোর ইঙ্গিত থাকত, গোটা দেশব্যাপী প্রবহমান প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ধারাকে এ-ব্যাপারে আমাদের রচনাসমূহ খেই ধরিয়ে দিত এবং পাকিস্তানি শাসকশ্রেণীর অনাবৃত স্নায়ুতে খোঁচা দিত। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার এই বোধটা আমাদের মতো নবীন অর্থনীতিবিদদের মনে সেই সময়কার রাজনৈতিক সংগ্রামগুলোতে অংশগ্রহণের একটা দায়বদ্ধতার চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল, যার ফলে আমাদের কাছে আমাদের পেশাগত কাজটা ছিল নিছক শিক্ষকতার চাইতেও অনেক বড় কিছু। বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কিত এই প্রথম অধ্যায়টি তাই কোনো অ্যাকাডেমিক অনুশীলন মাত্র নয়, এটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতা ও নিজস্ব অভিজ্ঞতারই ফসল।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমার এই জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটি আমি তুলে ধরেছি দ্বিতীয় অধ্যায়ে, যা প্রকৃতপক্ষে একাত্তরের মার্চের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে এক অংশগ্রহণকারীর পর্যবেক্ষণেরই তুল্য। সাপ্তাহিক ফোরাম-এ ৬ মার্চ ও ১৩ মার্চে লেখা আমার দুটি রচনায় (প্রথমটি স্বনামে, দ্বিতীয়টি বাংশেদ আখতার ছদ্মনামে—যা আমি বেশ ক'টি রাজনৈতিক রচনা লিখতে গিয়ে ব্যবহার করেছি) আমি চেষ্টা করেছি স্ব-শাসনের সম্ভবত অনন্যসাধারণ সেই কাহিনী-পর্যায়টিকে তুলে ধরতে, যখন ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নিজেকে শাসন করেছিল। একাত্তরের মার্চে সংঘটিত ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে খাটো করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রতি আজকালকার সরকারি বৈরিতা যেভাবেই হোক বছরের পর বছর ধরে আমাদের নিন্দা করে আসছে।

আমার ধারণায়, ১৯৭১ সালের পহেলা থেকে ছাব্বিশ মার্চ—এই ছাব্বিশ দিনেই বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে এক স্বাধীন জাতিতে পরিণত হয়েছিল, যার ফলে কখন স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল বা কে তা ঘোষণা করেছিলেন এই প্রশ্নটি অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করার যে-প্রবণতা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনাকে গ্রাস করেছে এটা তারই আরেকটি দৃষ্টান্ত। গোটা মার্চ মাস জুড়ে বঙ্গবন্ধু যা এবং যতটা সাধন করেছিলেন, অর্জন করেছিলেন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোনো ইতিহাসে অন্য কোনো নেতাই সেরকমটি করতে পারেননি। সম্মিলিতভাবে একটা

আধুনিক সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করে বাংলাদেশে উপনিবেশবাদী শাসনকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যাগ করতে এবং পরে দেশ পরিচালনায় তাঁর কর্তৃত্বকে স্বেচ্ছায় মেনে নিতে তিনি সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে শান্তিপূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। পাকিস্তানের বাঙালিদের দ্বারা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব-কর্তৃত্বকে নিঃশর্তে মেনে নেবার ফলেই বস্তুত বাংলাদেশ এক স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক বৈধতা প্রমাণিত হয়েছিল এবং সারা বিশ্বে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জনগণের বৈধ মুখপাত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চে রাতের বেলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন আঘাত হেনেছিল, তখন সে-কারণেই বাংলাদেশের জনগণ তো বটেই, বস্তুত গোটা সভ্য দুনিয়াই তাদেরকে নিজের ভূখণ্ডে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনকারী কোনো বৈধ সরকার হিসেবে দেখেনি, বরং গণহত্যা চালিয়ে একটি স্বাধীন জাতিকে পুনরায় জিতে নেবার চেষ্টারত সশস্ত্র আক্রমণকারী হিসেবেই দেখেছিল। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হবার এই বোধ বা চেতনাটিই পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনীতে কর্মরত বাঙালিদেরকে সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে যোগ দিতে এবং বাংলাদেশের আপামর সাধারণ জনগণকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর (এখন তাদের কাছে এক বিদেশী দখলদার বাহিনীরূপে প্রতিভাত) কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা রক্ষার্থে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

স্বাধীনতার মনস্তাত্ত্বিক ভিতটা তাই তৈরি হয়ে গিয়েছিল একাত্তরের মার্চেই, যখন প্রথমবারের মতো বাঙালিরা দখলদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে শিখল, এবং "বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো" স্লোগানটির বাস্তবতাকে গ্রহণ করল। এভাবেই তারা মার্চেই শিখে গেল কীভাবে সেনাবাহিনীর যানবাহন চলাচলকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য ব্যারিকেড তৈরি করতে হয়। বাংলাদেশের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত সর্বত্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে পুলিশের অস্ত্রাগার লুট করে প্রায় সেকেলে বন্দুক হাতে তুলে নিতে তারা কোনো হুকুমের অপেক্ষা করেনি। তারা একরূপ করেছিল এ-কারণেই যে ২৫ মার্চের মধ্যেই তারা জাতীয় মুক্তির জন্য এক সংগ্রামে নিজেদেরকে বঙ্গবন্ধুর পেছনে ঐক্যবদ্ধ একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে দেখতে শুরু করেছিল। ফলে স্বাধীনতার ঘোষণাকে ইতিমধ্যেই বাস্তবতায় পরিণত একটি বিষয়কে বৈধতাদানের একটা আইনগত আনুষ্ঠানিকতারূপেই দেখা হয়েছিল।

ঢাকায় অবস্থানরত বিশ্বের সাংবাদিকবৃন্দও একাত্তরের ২৫ মার্চ নাগাদ স্ব-শাসনাধীন বাংলাদেশের এই বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আর তা সারা বিশ্বের সামনে তুলেও ধরেছিলেন। ফলে চট্টগ্রামে স্থাপিত একটা ক্ষীণ রেডিও ট্রান্সমিটার থেকে কোনো এক প্রায়-অপরিচিত মেজর যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন, তখন এরকম একটি ঘোষণার ভিত্তি সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে জল্পনা-কল্পনা করতে হয়নি, কেননা একাত্তরের ২৫ মার্চের মধ্যেই বিশ্বের ঘরে ঘরে শেখ মুজিবুর রহমান এক আলোচিত নাম—এবং বিশ্বের মানুষ তাদের টেলিভিশনের পর্দায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে প্রত্যক্ষ করে ফেলেছে।

এই গ্রন্থে আমাদের ইতিহাসের সেই উল্লাসজনক মুহূর্তগুলো নিয়ে লেখা আমার রচনাগুলোই প্রকাশ করা হয়েছে, কেননা সেই অসাধারণ সময়কালে পরিব্যাপ্ত প্রতি মুহূর্তের উত্তেজনা ও রোমাঞ্চের ভাবটা রচনাগুলো ধরে রেখেছে। ১৯৭১ সালের মার্চে বাংলাদেশ জুড়ে মুক্তির যে মাতাল-করা চেতনা পরিব্যাপ্ত ছিল, একাত্তর-পরবর্তী প্রজন্মের খুব কম লোকেরই তা জানা আছে। ৬ মার্চ ও ১৩ মার্চের ফোরাম-এ

প্রকাশিত রচনা দুটো নতুন প্রজন্মকে তাই মুক্তিযুদ্ধ ও তার প্রত্যক্ষ অধিকারগুলো সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা ও প্রেক্ষিত প্রদানে সাহায্য করতে পারে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চেতনাটি ধরে রাখার লক্ষ্যে একটি সংস্কারমুক্ত স্বাধীন মতামতসমৃদ্ধ সাময়িক পত্রিকা হিসেবে ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে হামিদা হোসেন, কামাল হোসেন, জিয়াউল হক ও আমি ফোরাম বের করি। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পরপরই সামরিক আইনের এক আদেশবলে অন্য দুএকটি পত্রিকার সঙ্গে এটিও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এ-আদেশটির আসলে কোনো দরকার ছিল না, কেননা এর আগেই কামাল সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে; সাতাশে মার্চের অপরাহ্ণে আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে পাকিস্তানি সৈন্যরা আমার বাড়িতে এলে কোনোরকমে তাদের কবল থেকে পালিয়ে বাঁচি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে আমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সম্পৃক্ততাসহ এই কাহিনীটিও তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসসংক্রান্ত সরকারি নথির পঞ্চদশ খণ্ডের জন্যে আমি বিশেষভাবে এই স্মৃতিকথাটি লিখেছিলাম। 'ভোরের কাগজ' পরে এটি বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে। ভোরের কাগজের কলামে প্রকাশিত সেই রচনাটিই হুবহু এখানে পত্রস্থ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জন্যে এটা দুর্ভাগ্যজনক যে স্বাধীনতার ২৩ বছর পরও বাংলাদেশের স্বাধীনতার কোনো নিশ্চিত ও চূড়ান্ত ইতিহাস লেখা হয়নি। এশিয়াটিক সোসাইটির কাজ এবং স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কিত রচনাবলীর কাজ অবশ্যই মূল্যবান, কিন্তু আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মেজর রফিকুল ইসলাম, জেনারেল সফিউল্লাহ, মুযীদুল হাসান কিংবা জাহানারা ইমামের মূল্যবান স্মৃতিকথাগুলোও যেমন ইতিহাস নয়, এগুলোও তা-ই। এই খণ্ডটিকেও তাই অবশ্যই মুক্তিসংগ্রাম-বিষয়ক আরও একটি স্মৃতিকথা হিসেবেই বিচার করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত-না একটি নিশ্চিত নির্ভরযোগ্য চূড়ান্ত ইতিহাস-রচনার আন্তরিক প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে—যে-ইতিহাস যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠভাবে মুক্তিসংগ্রামকে তার সঠিক, যথাযথ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে স্থাপন করবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা বর্তমান প্রজন্মের মনে ইতিহাসের জায়গায় মিথ্যে, অবাস্তব অতিকথাকেই স্থায়ীভাবে গেঁথে দিতে থাকব। ফলত একটা পুরো প্রজন্মই তারা কীভাবে একটি জাতিতে পরিণত হল সে-বিষয়ে কোনো জ্ঞান ছাড়াই এবং ফলে, কেন একটি জাতি হিসেবে তাদেরকে টিকে থাকতে হবে, তার কোনো ধারণা ছাড়াই সাবালকত্ব প্রাপ্ত হবে। উপসংহারে মার্কিন দার্শনিক জর্জ সান্টায়ানার একটি উক্তিকেই আবার উদ্ধৃত করতে হচ্ছে : "অতীতকে যারা ভুলে যায়, সেই অতীতকেই পুনরায় যাপন করার দণ্ড তাদের ভোগ করতে হয়।"

পাঠকশ্রেণীর কাছে আমার এ-সমস্ত রচনার কতকগুলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই গ্রন্থের প্রকাশক ভোরের কাগজ-এর কাছে আমি ঋণী। এর ফলে আমার পাঠকসংখ্যা অগুনতি বেড়ে যাবে। এই গ্রন্থটি যদি আরও বেশি করে লেখায়, বিতর্কে এবং পরিণামে আমাদের পণ্ডিত সমাজকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি ব্যাপক ইতিহাস-রচনায় উদ্বুদ্ধ করতে অবদান রাখে, তা হলেই ইতিহাস-অভিসারী এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থকতা খুঁজে পাবে।

ঢাকা
১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪

রেহমান সোবহান

সূচিপত্র

বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি ১৩
অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্ব-শাসনে ৭৩
মুক্তিযুদ্ধ দেশে-বিদেশে ৮৭

বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি ১

বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি

পরিধি

এ-অধ্যায়ে ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সে-সময় পূর্ববাংলার বাঙালিরা পাকিস্তানের নাগরিক ছিল। তবে এটা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে, বাঙালি জাতীয়-চেতনার বিকাশের ইতিহাস পূর্ববর্তী আরও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ-পর্যায়ে অর্থনৈতিক বঞ্চনার অনুভূতি বাঙালিদের চেতনায় সংক্রমিত হতে শুরু করে। এ-চেতনার প্রাথমিক অভিব্যক্তি ঘটে পাকিস্তানের জন্য বাঙালি মুসলমানদের সংগ্রামের মাধ্যমে। পূর্ববাংলার জনমন থেকে আপেক্ষিক বঞ্চনার অনুভূতি দূর করতে পাকিস্তান সরকার ব্যর্থ হয় এবং এ-ব্যর্থতা ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের শক্তিগুলোকে জোরদার করে তোলে ও ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটাতে সহায়তা করে। এ-অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তির বিভিন্ন দিক। কাজেই এ-অধ্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাক-১৯৪৭ কালপর্ব সম্পর্কে মাত্র ভাসাভাসাভাবেই আলোচনা করা হবে।

একথা বলা যায় যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলে ছিল আপেক্ষিক অর্থনৈতিক বঞ্চনার অনুভূতি। পূর্ববাংলার বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসন অর্জনের সংগ্রাম এ-বিশ্বাসকে ভিত্তি করে অগ্রসর হয় যে, বাঙালিদেরকে নিজেদের অর্থনৈতিক ভাগ্যনির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা না দেওয়াতেই অঞ্চলটি আপেক্ষিক বঞ্চনার শিকার হয়েছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বাঙালিদের ক্ষমতার হিস্যা পাওয়ার এবং পূর্ববাংলা অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনলাভের লড়াইকে ঘিরে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে পাকিস্তানে যে একটি সম্মিলিত জাতিরাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি তার কারণ ছিল ক্ষমতার অংশ প্রদান কিংবা বাঙালিদেরকে স্বায়ত্তশাসনদানে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর অস্বীকৃতি। ক্ষমতা বহুল পরিমাণে পশ্চিম পাকিস্তানে রেখে দেওয়ার এ-বাধ্যবাধকতার উদ্ভব হয়

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদ বিলিবণ্টনের ওপর নিয়ন্ত্রণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে ন্যস্ত থাকার ফলে। পাকিস্তানে রাজনৈতিক ক্ষমতার এই বাস্তবতা এবং ক্ষমতার চাবিকাঠি হাতে না পাওয়ার বঞ্চনার প্রতিকারে অপারগতাজনিত হতাশা বাঙালিদের মনে সদাজাগ্রত ছিল। এটাই তাদের বঞ্চনাবোধকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তোলে।

বর্তমান অধ্যায়টি ছয়টি অংশে বিভক্ত। সূচনায় রয়েছে বঞ্চনা ও জাতীয়তাবাদসংক্রান্ত কিছু ধারণাগত বিষয়ের উপর আলোচনা। দ্বিতীয় অংশে পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালিদের অংশগ্রহণের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে রয়েছে ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে বঞ্চনা যে-আকার ধারণ করে তার বস্তুগত মাত্রা বা পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা। বাঙালিদের মধ্যে বঞ্চনার অনুভূতি তীব্রতর করে তোলার ব্যাপারে পাকিস্তান রাষ্ট্র ও তার নীতিসমূহ কী ভূমিকা পালন করেছে তা-ই চতুর্থ অংশের আলোচ্য বিষয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতাবাদী মনোভাব কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তা বাঙালিদের বঞ্চনার অনুভূতিকে কীভাবে প্রবলতর করেছে সে-বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে পঞ্চম অংশে। বাঙালিদের এই বঞ্চনাবোধ দূরীকরণে পাকিস্তান সরকারের ব্যর্থতা রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামকে কতটুকু ত্বরান্বিত করেছে সেটা আলোচিত হয়েছে ষষ্ঠ ও শেষ অংশে।

ধারণাগত বিষয়সমূহ

জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে জাতীয়তাবাদ কথাটা দ্বারা কী বোঝাতে চাই সেটাই আগে উপলব্ধি করতে হবে। এ-আলোচনা প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদকে আমরা ভৌগোলিকভাবে সীমাবদ্ধ একটি স্থানে বসবাসরত একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর জাতীয় পরিচয়ের অনুভূতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। অনুরূপ জনগোষ্ঠীকে অবশ্যই চিন্তাচেতনা, সমৃদ্ধি, গোষ্ঠীগত ক্রিয়াকলাপ, সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া, নিজ ভূখণ্ডের সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নিজেদেরকে অপর জনগোষ্ঠীগুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখতে হবে। এরকম সংজ্ঞায়নে স্পষ্টত অনেক দুর্বলতা রয়েছে, যেহেতু গোষ্ঠীগত চেতনা বা অনুভূতি ওপরে বর্ণিত সকল বিষয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। একটা জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিকভাবে সমপ্রকৃতির হলেও তার মধ্যে জাতি, ঘর্ণ, গোত্র, ধর্ম ও পৃথক সামাজিক শ্রেণী থেকে উদ্ভূত সঙ্গতি থাকা সম্ভব। একটি ভূখণ্ডের অন্তর্গত অঞ্চলসমূহের মধ্যেও অসঙ্গতি থাকতে পারে, যা গ্রামকে গ্রাম থেকে, জেলাকে জেলা থেকে, কিংবা প্রদেশকে প্রদেশ থেকে বিভক্ত করতে পারে। একটা জাতিসত্তা অপর জনগোষ্ঠীর তুলনায় পণ্যসম্পদ, সরকারি চাকরি, উৎপাদনি সম্পদ, উৎপাদনের উপায়সমূহ নিয়ন্ত্রণ, নীতিনির্ধারণ ও বণ্টনপ্রক্রিয়ায় কতটুকু পরিমাণে হস্তক্ষেপ করতে পারে বা করার ক্ষমতা রাখে তা থেকেই বঞ্চনার ধারণা সৃষ্টি হয়। কাজেই জাতীয় একত্ববোধ হচ্ছে একটি জনগোষ্ঠী অপর জনগোষ্ঠীর তুলনায় কতটা বঞ্চিত হচ্ছে সেটা নিরূপণের অনেক উপায়ের অন্যতম।

পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালিদের অংশগ্রহণের অর্থনৈতিক ভিত্তি

বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা-নিরূপণ

এ-অধ্যায়ের উদ্দেশ্য যেহেতু জাতীয়তাবাদের তত্ত্বীয় বিষয়ে নতুন কিছু সংযোজন নয়, সুতরাং আমরা কেবল আমাদের ধারণাগত সমস্যাটিকে বাংলাদেশের ইতিহাসের মধ্যেই সীমিত রাখতে চাই। বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক আন্তসম্পর্কগুলোর দিকে তাকাতে গেলে বাংলাদেশের বাংলাভাষী জনগণের ইতিহাস এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরার বাংলাভাষী জনগণের ইতিহাসকে এর অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হবে। আসলে কিন্তু এ-অঞ্চলের বাঙালাভাষী মুসলিমরা একটি পৃথক জাতীয় পরিচিতির দাবি তুলেছিল, যা তাদেরকে বিভাগপূর্ব (প্রায়-১৯৪৭) ভারতের মুসলিম জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে স্থান করে দেয়। তবে রাজনৈতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য বাঙালি মুসলিমদের জাতীয় পরিচিতির একটা স্থানগত ভিত্তির দরকার ছিল। গোড়ার দিকে বাংলা ও আসামকে নিয়ে এই ভিত্তি গঠিত বলে মনে করা হত। ভারতবিভাগের প্রাক্কালে এখানে মুসলিমরা ছিল সংখ্যাগুরু।[১] প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতার ভিত্তি হিসেবে তৎকালীন শাসক ব্রিটিশ সরকারের তৈরি ১৯৪৬-এর ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় এরকমই অনুমান করা হয়েছিল।[২] ঐ পরিকল্পনায় উত্তর-পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর-পূর্ব ভারতে তিনটি উপরাষ্ট্রের কাছে ক্ষমতা-হস্তান্তর এবং কেন্দ্রের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, জাতীয় যোগাযোগব্যবস্থা ও কিছু অর্থনৈতিক বিষয়ে যৎসামান্য ক্ষমতাপ্রদানের কথা বলা হয়েছিল।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় এবং মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকাগুলোকে নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতবিভাগের ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-অবস্থায় মুসলিম বাঙালি জাতীয়তাবাদ তার ভূখণ্ডগত সীমানা নতুনভাবে নির্ধারণ করে, যার মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশ ও আসামের মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকা পড়ে।[৩] প্রস্তাবিত ভূখণ্ডে মুসলিম বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হত। মুসলিম বাঙালি জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত আবাসস্থল হিসেবে বাংলা ও আসামের মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকাগুলোর 'কীটদষ্ট ও খণ্ডিত' পাকিস্তানে যোগদানের চিন্তাটা মেনে নেওয়া হয় একমাত্র তখনই, যখন কংগ্রেস হাইকমান্ড ঐক্যবদ্ধ ও সার্বভৌম বাংলার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ গোটা সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও রাজধানী লাহোরসহ পাঞ্জাবের সেরা অংশগুলো নিয়ে গঠিত পশ্চিম পাকিস্তানের কথা চিন্তা করে 'কীটদষ্ট ও খণ্ডিত' পাকিস্তানের কথা বলেননি। তিনি তখন ভাবছিলেন বাংলার কথা, যা তার রাজধানী হারিয়েছে, ভারতের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চলগুলোর অন্যতম প্রধান নৌবন্দরটি হারিয়েছে এবং বাংলার অনগ্রসর কৃষিপ্রধান পশ্চাদভূমি আর

১. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh : Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936-1947 (Dhaka 1987)*
২. H. V. Hodson, *'The Great Divide'* (London 1969).
৩. Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh.*

আসামের চা-উৎপাদনকারী জেলা সিলেটকে পাকিস্তানে নিয়ে এসেছে। পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে-অভিব্যক্তি ঘটেছিল তাকে এভাবে শেষ পর্যন্ত র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ কর্তৃক পুনর্নির্ধারিত সীমানায় পূর্ববাঙলা ও সিলেটের অন্তর্গত ভূখণ্ডে ধর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হিসেবে নিজের জাতীয় পরিচিতি তুলে ধরতে হয়। এই সীমানার মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে স্বীকার করে নিতে হয় বিপুলসংখ্যক অমুসলিমকে, যারা ছিল ভারত ও বাংলাভাগের সময় পূর্ববাংলার জনসংখ্যার ২০ শতাংশ।[৪] ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎস যা-ই থাকুক না কেন, ঐ তারিখের পরে বাঙালি জাতীয়তাবাদ কেবল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ভূভাগের জাতীয়তাবাদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। জাতীয়তাবাদের এই সংজ্ঞার মধ্যে অমুসলিমরাও অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগ—ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত লোকেরা সংজ্ঞায়নের দরুন নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাক্রমে বাদ পড়ে যায়। আমাদের জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আর বর্তমান বাংলাদেশের গারোপাহাড় এলাকার স্বল্পসংখ্যক অবাঙালি উপজাতিগুলোর অবস্থান অস্পষ্ট থেকে যায়।

অর্থনৈতিক বঞ্চনা

এ-অধ্যায়ে জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা-নিরূপণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের কিছু প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে, যেহেতু এতে বাঙালি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বঞ্চনার চেহারা তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সাধারণভাবে পূর্ববাংলার জনগণ এবং বিশেষত বাঙালি মুসলিমরা কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা হিন্দু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের তুলনায় নিজেদেরকে বঞ্চিত বোধ করত। ঐ বঞ্চনার মূলে ছিল এই সত্য যে, পশ্চিমবাঙলা ছিল পূর্ববাংলার চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। পূর্ববাংলাতেও মুসলিমরা অনুভব করত যে, অর্থনৈতিক জীবনে তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য নেই, সেখানে রয়েছে অপর সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য। ভূমির মালিকানা ছিল প্রধানত হিন্দু জমিদারদের হাতে। মুসলিমরা ছিল হিন্দু জমিদারদের রায়ত কিংবা ক্ষুদ্র চাষী। মধ্যবর্তী আর্থিক কায়কারবার, ব্যাবসাবাণিজ্য ও গ্রামীণ শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রধানত বাঙালি হিন্দুদের হাতে এবং কোনো কোনো ব্যাবসাবাণিজ্যের উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ ছিল মাড়োয়ারিদের হাতে। পুঁজিবাদী শিল্প বলতে যা-কিছু ছিল তার মালিকানা ছিল ব্রিটিশদের হাতে। যেমন, সিলেটের চা-শিল্প এবং পূর্ববাংলার নদীপথে সংযোগরক্ষাকারী যান্ত্রিক নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থা। কয়েকটি কাপড়ের কল ও একটি চিনিকল নিয়ে যে সামান্য আধুনিক পণ্য উৎপাদনশিল্প গড়ে ওঠে তার মালিক ছিল বাঙালি হিন্দুরা। শহরাঞ্চলের ব্যাবসাবাণিজ্যও তারাই নিয়ন্ত্রণ করত। আমলাতন্ত্র, শিক্ষকতা ও আইন-ব্যবসাতেও তাদেরই প্রাধান্য ছিল। পূর্ববাংলার সামাজিক স্তরবিন্যাসের এ-প্রক্রিয়াটি তুলে ধরা হচ্ছে তথ্য হিসেবে, বাঙালি মুসলমানদের নিজেদেরকে একটি বঞ্চিত শ্রেণী হিসেবে দেখার যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের জন্য। এ-

৪. Rounaq Jahan, *Pakistan : Failure in National Integration, (USA 1972), Table 11.7.*

গ্রন্থের অন্যান্য অধ্যায় প্রাক-১৯৪৭ পূর্ববাংলার সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে অধিকতর সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রদানে সক্ষম হবে এবং সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থাসংক্রান্ত অধ্যায়সমূহে লক্ষ করা যাবে যে, ১৯৪৭ সাল নাগাদ বাংলায় একটি মধ্যস্বত্বভোগী মুসলিম জোতদারশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে, আর সরকারি চাকুরিতে মুসলিম বাঙালিদের অনুপাত পদমর্যাদার দিক থেকে না হোক অন্তত সংখ্যার দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে।[৫]

বাঙালি মুসলমানরা এমন একটা শাসনব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হতে চাচ্ছিল, যেখানে তারা রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তারা আশা করছিল ভূমিস্বত্বলাভের, রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে শিক্ষা, সরকারি চাকুরি ও বিভিন্ন পেশায় নিজেদের এগিয়ে নেওয়ার, পূর্ববাংলায় শিল্পের অবকাঠামো গড়ে তোলার এবং এ-অঞ্চলে শিল্পায়ন ঘটাবার। ব্যাবসাবাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে বাঙালি মুসলিম-উদ্যোগের অস্তিত্ব কার্যত ছিল না বলে তারা আশা করছিল যে, সম্পদসংগ্রহ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া এবং কাঠামোগত পরিবর্তন-সাধনের দুটো কাজ রাষ্ট্রই শুরু করবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল উদ্যোক্তা হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে যে-দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তার জন্য মুসলিম জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বাধিক জোর দেয়। ভারতের মুসলিমরা ধর্মের ভিত্তিতে তাদের জাতীয় পরিচয় বেছে নিয়েছিল বলে তাদের পক্ষে জাতীয় ক্ষমতার কেবল এমন একটা কাঠামোই কল্পনা করা সম্ভব ছিল, যেখানে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের প্রাধান্য নেই। ব্যাবসাবাণিজ্য, শিল্প ও পেশাসমূহে হিন্দুপ্রাধান্য থাকায় রাষ্ট্রশক্তির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করার উপায় হিসেবে দেখা হত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের শ্রেণী, জাতি, বর্ণ অথবা ভূখণ্ডগত বৈষম্যগুলোর প্রতি খুব সামান্যই নজর দিয়েছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মুসলিমরা রাজনৈতিকভাবে প্রবল ছিল এবং অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত ছিল না। সেখানকার মুসলিম সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীকে ভারতের অপরাপর অংশের সংখ্যালঘু মুসলিমদের বা আপেক্ষিকভাবে বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ বাংলার মুসলিমদের সঙ্গে এক নৌকায় তুলে দেওয়া হয়। অথচ তখনকার পরিস্থিতিতে একজন বাঙালি প্রজা বা রায়তের পরিপ্রেক্ষিত আর পাঞ্জাবের নুন-তিওয়ানা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্তানের উপজাতি-সর্দার ও সিন্ধুর ওয়াদেরা বা অভিজাত ভূস্বামীদের পরিপ্রেক্ষিত ছিল কিছুটা ভিন্ন। বাঙালি প্রজা আইন পরিষদের নির্বাচনে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল তার দৈনন্দিন জীবনের ওপর থেকে হিন্দু জমিদার-মহাজনদের কর্তৃত্ব অপসারণের জন্য। পক্ষান্তরে পাঞ্জাবের নুন-তিওয়ানা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের উপজাতীয় সর্দার এবং সিন্ধুর ওয়াদেরা ভূস্বামীরা চেয়েছিল হিন্দুপ্রাধান্যযুক্ত কেন্দ্রের অনধিকারমূলক হস্তক্ষেপ থেকে তাদের প্রাদেশিক ক্ষমতাকাঠামোর প্রাধান্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক ক্ষমতা।

৫. Ahmad Kamal, *"The Decline of the Muslim League and the Ascendancy of the Bureaucracy in East Pakistan, 1947-54," Ph. D. Thesis (Australian National University, Canberra, 1989).*

উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিম ভূস্বামী ও পূর্ববাংলার কৃষক এমন একটা রাষ্ট্র চেয়েছিল যা তাদেরকে স্ব স্ব অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন-পরিচালনার সুযোগ এনে দেবে। এক্ষেত্রে পাকিস্তান আন্দোলন তাদেরকে জাতীয় ক্ষমতা না হোক, অন্তত স্থানীয় ক্ষমতা দখলের জন্য হাত মেলাবার একটা সুবিধা এনে দেয়। ভারতের মুসলিমদের স্বাধীন জাতীয় ক্ষমতালাভের সংগ্রামের উদ্ভব ঘটেছিল নিজস্ব বিষয়াদি পরিচালনার জন্য যথাযথ রাজনৈতিক স্বাধিকার নিশ্চিতকরণে মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলির ব্যর্থতা থেকে। কিন্তু বাংলার মুসলিমদের জন্য এই স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতার লক্ষ্য ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক প্রাধান্য খর্ব করে নিজেদের অর্থনৈতিক বঞ্চনার অবসান ঘটানো। লাহোর প্রস্তাবে দুটো স্বতন্ত্র মুসলিম সংখ্যাগুরু রাষ্ট্রের কথা বলা হয়। কাজেই প্রস্তাবটি ছিল পরিকল্পিত অথবা আকস্মিকভাবে ভারতের এই দুই অঞ্চলের[৬] মুসলিমদের উদ্বেগের ফসল।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ববাংলার বাঙালিরা যে-রাষ্ট্রটির উত্তরাধিকার লাভ করে তার অংশীদার হয় উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিমরা এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছুসংখ্যক লোকসহ ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলো থেকে আগত উদ্বাস্তুরা। নতুন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে এই উদ্বাস্তু নাগরিকরা ভারতের নানা অঞ্চল ও পটভূমি থেকে এসে পাকিস্তানে প্রবেশ করে। যেসব সামাজিক শক্তি নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয় তার মধ্যে বাঙালিদের উচ্চাভিলাষী প্রত্যাশা ছিল সর্বাধিক। ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোতে এবং দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের ব্যাবসাবাণিজ্য, বিভিন্ন পেশা ও কারিগরি বৃত্তির ক্ষেত্রে মুসলিমদের বেশ ভালো অবস্থান ছিল। হিন্দিভাষী উত্তরাঞ্চলে মুসলিমরা ছিল প্রধান শ্রেণী ভূস্বামী ও পেশাজীবীদের অংশ। তাদের মাতৃভাষা উর্দু ছিল এ অঞ্চলের উচ্চতর শ্রেণী হিন্দু-মুসলমানের মিলিত মাতৃভাষা। এভাবে দেখা গেল যে, যেসব জনগোষ্ঠী পাকিস্তান পেল তাদের মধ্যে পূর্ববাংলার বাঙালিরাই কেবল পর্যায়ক্রমে উত্তর ভারতের মুঘল ও তাদের অনুচরদের, ব্রিটিশ শাসকদের ও হিন্দু জমিদারদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্বের শিকার হয়েছিল। সুতরাং পূর্ববাংলার পশ্চাৎপদতা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সম্পদের উপর এ-অঞ্চলের জনগণের নিয়ন্ত্রণ না থাকার সঙ্গে সম্পর্কিত। পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে স্বায়ত্তশাসনলাভের আন্দোলনের দিকে দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করে। এটা পূর্ববাংলার বাঙালিদের চেতনার মধ্যে স্থায়ীভাবে কাজ করতে থাকে। কাজেই এ-প্রক্রিয়াটিকে কয়েকটি পৃথক পৃথক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে দেখা উচিত হবে না।

বাঙালিদের অর্থনৈতিক বঞ্চনা

কতিপয় ধারণাগত প্রশ্ন

অর্থনৈতিক বঞ্চনাকে চূড়ান্ত ও আপেক্ষিক উভয়ভাবেই দেখা যেতে পারে। দারিদ্র্যপীড়িত কোনো ব্যক্তির বঞ্চনার পরিমাপ সুনিশ্চিতভাবে করা যায় সে কত

৬. Harun-or-Rashid. *The Foreshadowing of Bangladesh.*

ক্যালোরিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পারে বা কত কম জিনিসপত্র, মালামাল ইত্যাদি তার আছে সেটা বিবেচনা করে। অপরাপর ব্যক্তি, সম্পদায় বা ভূখণ্ডের সম্পদ ও সুবিধাদির বিচারে বঞ্চনা আপেক্ষিকও হতে পারে। বাঙালিদের জন্য একটি জাতীয় পরিচিতি-নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে বঞ্চনা প্রসঙ্গে বলতে গেলে আমাদের একটি মিশ্রিত জাতীয় আবাসস্থলে বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও অঞ্চলের কথা বিবেচনায় রেখে বিষয়টার প্রতি নজর দিতে হবে। বিশ্লেষণে আমরা উৎপাদনশীল উপায়-উপকরণ, অস্থাবর সম্পত্তি ও চাকুরির ওপর অধিকার বা কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে বঞ্চনার পরিমাপ করব। এসব বঞ্চনা দেশীয় ও বৈদেশিক সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব এবং শেষ পর্যন্ত নীতিনির্ধারণ-প্রক্রিয়ার ওপর কর্তৃত্বের ব্যাপারে বিদ্যমান বঞ্চনার সঙ্গে সম্পর্কিত হবে।

এ-পরিচ্ছেদে পূর্ববাংলা (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) ও সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করে এর আপেক্ষিকতার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা হবে। এটা করা হবে প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানের অঞ্চলসমূহ ও পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)-এর মধ্যে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্যের আলোকে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে উৎপাদনি সম্পদের বিন্যাসের প্রতিও অবশ্য দৃষ্টিপাত করা হবে। এটা গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু বাঙালিদের ঐতিহাসিকভাবে অনুভূত আপেক্ষিক বঞ্চনাবোধের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান ছিল স্থানীয় অর্থনীতির ওপর বাইরের লোকদের কর্তৃত্ব।

আঞ্চলিক হিসাবে পৃথক্‌করণ

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অদ্ভুত ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারটি পৃথক্‌করণের ধারণাকে অধিকতর পরিমেয় করে তোলে। দুটি আঞ্চলিক অর্থনীতিকে দুটি স্বতন্ত্র অর্থনীতিরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে।[৭] সম্ভব হয় প্রতিটি অঞ্চলের জি.ডি.পি. ও জি.এন.পি., সঞ্চয়-বিনিয়োগ, শ্রম ও পুঁজির আন্তঃআঞ্চলিক গতিবিধির মোটামুটি হিসাব-নির্ধারণ, বাণিজ্য ও প্রদত্ত অর্থের স্বতন্ত্র মূল্যহারের পৃথক বালেন্স প্রস্তুতকরণ, বাজেটের মাধ্যমে ও বৈদেশিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ ও ব্যয়ের আলাদা হিসাব-প্রণয়ন।

সমস্যা দেখা দেয় কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিসমূহের খরচ ও সুবিধাদির হিসাব-নির্ধারণের সময়। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সংগৃহীত রাজস্বের হিসাব রাজস্ব সংগ্রহের আঞ্চলিক উৎসগুলো থেকে সবসময় পাওয়া যেত বটে, তবে পশ্চিম

৭. Rehman Sobhan, "How to build Pakistan into a well-knit Nation, "*Paper* Presented at a Conference convened by the Pakistan Bureau of National Integration in Lahore in September 1961 (mimeo). The concept of two economy was discussed by the conference of Bengali Economists on the First Five Year Plan, held in Dhaka in 1956, and by a number of other Bengali Economists such as the late Dr. A. Sadeque, Director, Bureau of Statistics and the late Dr. Habibur Rahman of the Pakistan Planning Commission.

পাকিস্তানে সমিতিভুক্ত ব্যাবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর নিজ নিজ হেড অফিস থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে কর দেওয়ার ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় না। আদমজি, বাওয়ানি, আমিন, দাউদ প্রভৃতি কতিপয় ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর আয়ের একটি বড় অংশ আসত পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে। অথচ তারা ট্যাক্স দিত পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত তাদের হেড অফিস থেকে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে, টেলিযোগাযোগ ও রেলওয়ের মতো খাতে অঞ্চলবিশেষকে সুনির্দিষ্ট সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়বরাদ্দ করা যথেষ্ট সহজ ছিল। কেন্দ্রীয় প্রশাসন, বৈদেশিক সার্ভিসসমূহ ও প্রতিরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যয় প্রধানত কর্মচারী ও দফতরসমূহের জন্য হলেও এবং এসব বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বৃহত্তর অংশ পশ্চিম পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও এসব বিভাগের বা সার্ভিসের চাকুরিতে পাকিস্তানের উভয় অংশের লোকদের সমঅধিকার রয়েছে বলে গণ্য করা হত, এবং এসব ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য ব্যয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব নয় বলে মনে করা হত। বাঙালি অর্থনীতিবিদরা দৃঢ়ভাবে এ অবস্থার বিরোধিতা করেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, প্রতিরক্ষা ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সুফলসমূহ যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানই পায়, সেহেতু এ-বিষয়টি বিবেচনায় রেখে একটা যথাযথ অংশ বা হার অনুযায়ী ঐসব ব্যয় ভাগ করা উচিত।

কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও অর্থবরাদ্দের সিদ্ধান্তগুলোর মাধ্যমে এটাও দেখা যায় যে, বিভিন্ন সার্ভিসের চাকরির সুফলও পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানই অনেক বেশি ভোগ করে। ঐসব সুফল পক্ষপাতহীনভাবে বণ্টন করা হচ্ছে বলে মেনে নিতে বাঙালিরা সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের এরকম 'অ-বরাদ্দযোগ্য' সম্পদবণ্টনের পরিমাপ করতে গিয়ে বাঙালি অর্থনীতিবিদরা দেখেন যে, চাকরি এবং কেন্দ্রীয় ব্যয় অন্যায়ভাবে অঞ্চলবিশেষে চলে গেছে।[৮]

এসব দাবি ও অভিযোগের তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদ ও অর্থের বেশিরভাগ কোথায় যায় সেটার হিসাব নেওয়াটা সম্ভব করে দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের আপেক্ষিক বঞ্চনার ধারণাকে এটা পরিমাণগতভাবে কিছুটা নিখুঁত করে তোলে। আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে এমন অপরাপর দেশে পূর্ব পাকিস্তানের আপেক্ষিক বঞ্চনার মতো ব্যাপার এতটা চট করে নজরে পড়ে না। কেবল আঞ্চলিক বৈষম্যের পরিমাপই নয়, বছরের পর বছর ধরে এর গতিধারার নকশা তৈরি ও ব্যাখ্যা করার সুযোগ ও ক্ষমতা অর্থনীতিবিদদের নাগালের মধ্যে থাকায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের হিসাব-নিরূপণ

বৈষম্যের অতি সহজ প্রাপ্য পরিমাপটি আঞ্চলিক জি.ডি.পি. ও মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাপের সঙ্গে সম্পর্কিত। আঞ্চলিক মথাপিছু আয় এবং আঞ্চলিক বৈষম্যের যে-

৮. See *Report of the Panel of Economists on the Fourth Five Year Plan.* Government of Pakistan. (Comments of E. P. Members).

কোনো সূচক হাতের কাছেই রয়েছে।[৯] এসব হিসাবের বেশিরভাগ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের জাতীয় আয়সংক্রান্ত হিসাব থেকে নেওয়া উপাত্তসমূহের ভিত্তিতে প্রাপ্ত বলে বছরে বছরে বিভিন্ন উৎসের হিসাবে গরমিল দেখা যায়। এসব পরিসংখ্যানগত বিভিন্নতার কোনটা সঠিক বা কতটা সঠিক সে-বিচারে না গিয়ে আমরা পাকিস্তানের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রণেতা অর্থনীতিবিদদের জন্য পেশকৃত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদদের দুটো পৃথক রিপোর্টে প্রদত্ত মাথাপিছু বৈষম্যের হিসাবকে কাজে লাগাতে পারি। তবে আঞ্চলিক অর্থনীতির বৈষম্যের পূর্ণতর বিবরণদানের জন্য আমরা অন্যান্য উপাত্তের প্রতিও দৃষ্টিপাত করব।

যেসব তথ্য-প্রমাণ রয়েছে তাতে দেখা যায়, ভারতবিভাগের সময় পাকিস্তানের দুই অংশ যে-অর্থনীতির উত্তরাধিকারী হয় তাতে তাদের বিকাশের স্তরে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ বৈষম্য ছিল না।[১০] উভয় অঞ্চলের শিল্পভিত্তি ছিল উপেক্ষণীয়।[১১] তবে পশ্চিম পাকিস্তান রাস্তাঘাট, সেচব্যবস্থার সুবিধা ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি থেকে একটা উন্নততর অবকাঠামো লাভ করে।[১২] উভয় অংশের জি.ডি.পি. প্রায় সমানই ছিল।[১৩] দেশজাত উৎপন্নদ্রব্যের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জি.ডি.পি. পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে সামান্য পরিমাণে বেশি এবং তা ১৯৫৩-৫৪ সাল পর্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকে।[১৪] তবে জি.ডি.পি.-এর অবরাদ্দযোগ্য অংশগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের সাথে যুক্ত করলে দেখা যায় যে, ১৯৪৯-৫০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের হিস্যা পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে সামান্য পরিমাণে বেশি ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের মাত্রা বেশি হবার কারণেই এটি ঘটে। ১৯৪৯-৫০ সালে জি.ডি.পি.-এর পশ্চিম পাকিস্তানি হিস্যা ছিল ৫০.৫%। ১৯৫৯-৬০ সাল নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানের হিস্যা বেড়ে ৫২.৫% শতাংশে দাঁড়ায়। এ-ব্যবধান ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ আরও প্রসারিত হয়ে পাকিস্তানের জি.ডি.পি.-তে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ দাঁড়ায় ৫৭.৪%।[১৫]

কাঠামোগত পরিবর্তনে ভিন্নতা

এসব আঞ্চলিক বৈষম্য দেখিয়ে দেয় যে, ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৬৯-৭০-এর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জি.ডি.পি. পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে দ্রুততার সঙ্গে

৯. T. M. Khan and A. Bergen, "Measurement of Structural Change in the Pakistan Economy : A Review of the National Income Estimates 1949-50 to 1963-64." *PDR*, Summer 1966 ; M. Huq, *The Strategy of Economic Planning. A Case Study of Pakistan* (Karachi 1963).

১০. ঐ।

১১. G. Papanek, *Pakistan's Development—Social Goals and Private Incentives*, (Harvard University Press 1966).

১২. World Bank, *Bangladesh Development in a Rural Economy*, 3 Vol. (Washington D. C. 1974).

১৩. Khan and Bergen. "Measurement of Structural Change."

১৪. দেখুন *Reports of the Economists on the Fourth Five Year Plan*, Government of Pakistan, (Comments of W. P. Member).

১৫. ঐ।

বর্ধিত হয়।[১৬] পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের ১.৯%-এর তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধির হারের গড় ছিল ২৭%। ষাটের দশকে এ-ব্যবধান আরও বেড়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের ৪.৩%-এর তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৬.৪%-এ।

পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির এই দ্রুততর বিকাশের হার পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির সঙ্গে তুলনায় উচ্চতর হারে বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বৈচিত্র্য আনয়নের ফল। ১৯৫১-৫২ এবং ১৯৫৯-৬০ সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক আয়ের ক্ষেত্রে শিল্পের হিস্যা ৭% থেকে ১০%-এ উন্নীত হয়।[১৭] একই সময়ে শিল্পখাতের মধ্যে বৃহৎ শিল্পের হিস্যা দাঁড়ায় ৪১% থেকে ৭২%। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৫% থেকে ৪৩%। পাকিস্তানের উভয় অংশে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ এভাবেই ঘটেছিল। ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোৎপাদন ৩২ কোটি থেকে ৬৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে বৃদ্ধি পায় ৮৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা থেকে ১৮০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকায়।[১৮] এ থেকেই বোঝা যায় যে, শিল্পের বিকাশ পাকিস্তানের উভয় অংশে ঘটলেও পঞ্চাশের দশকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ব্যবধান অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে যায়।

পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনীতির দ্রুততর উন্নতি ও কাঠামোগত বৈচিত্র্যসৃষ্টি ষাটের দশকেও অনুরূপ বৈষম্যকে স্থায়ী রাখার পরিবেশ তৈরি করে।

এই একই সময়ের মধ্যে ১৯৬৯-৭০ নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানের জি. ডি. পি.-তে শিল্পের হিস্যা ১৬%-এ বর্ধিত হয়, পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে তা বৃদ্ধি পায় ৮.৯%।[১৯]

সারণি ১ : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য (টাকার অঙ্কে)

সন	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান (২-১)	বৈষম্য	বৈষম্যের অনুপাত (২-১) $(\frac{২-১}{২}) \times ১০০$
১৯৪৯/৫০	২৮৮	৩৫১	৬৩	২১.৯
১৯৫৪/৫৫	২৯৪	৩৬৫	৭১	২৪.১
১৯৫৯/৬০	২৭৭	৩৬৭	৯০	৩২.৫
১৯৬৪/৬৫	৩০৩	৪৪০	১৩৭	৪৫.২
১৯৬৯/৭০	৩৩১	৫৩৩	২০২	৬১.০

উৎস : *সারণি ১.১ ও ১.২। পাকিস্তানের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ওপর অর্থনীতিবিদদের প্যানেলের রিপোর্ট (পশ্চিম পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদদের রিপোর্ট)*

১৬. প্রাগুক্ত।
১৭. Huq, *Strategy of Economic Planning.*
১৮. Akhlaqur Rahman, *Partition, Economic Growh and Interregional Trade,* (Karachi 1963).
১৯. Khan and Bergen, "Measurement of Structural Change," Table 3.1.

রপ্তানিখাতে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, ১৯৫৫-৬০ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পাকিস্তানের মোট রপ্তানি বাণিজ্যে পশ্চিম পাকিস্তানি রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৮.৬%।[২০] ১৯৬০-৬৫ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানির হিস্যা ৪০.৫%-এ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৫-৭০ সালের তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক রপ্তানির পরিমাণ পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানির পরিমাণকে অতিক্রম করে ৫০.২%-এ দাঁড়ায়।

পূর্ব পাকিস্তান শুধু যে রপ্তানির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানকে স্থান ছেড়ে দিচ্ছিল তা-ই নয়, এর রপ্তানিকাঠামো গোটা পাকিস্তানি শাসনামলে অত্যধিক পরিমাণে পাটনির্ভর থেকে যায়। ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৮-৫৯-এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মোট আন্তর্জাতিক ও আন্তঃআঞ্চলিক রপ্তানি বাণিজ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির হিস্যা ছিল ৭৬.১ শতাংশ।[২১] ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে পাটের ওপর পূর্ব পাকিস্তানের নির্ভরশীলতা সামান্য পরিমাণে হ্রাস পায় এবং মোট আঞ্চলিক রপ্তানির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা দাঁড়ায় ৬৯.৫ শতাংশ। প্রকৃতপক্ষে, গোড়ার দিকে বিদেশে পাকিস্তানের মোট রপ্তানির ক্ষেত্রে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির হিস্যা ছিল ৯০.৫ শতাংশ। আরও সাম্প্রতিককালে এটা ৯১.৪ শতাংশে দাঁড়ায়। পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানিকাঠামোর মধ্যে যে-পরিবর্তন আনা হয় সেটা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানমুখি। পক্ষান্তরে, পশ্চিম পাকিস্তানে কাঁচা তুলা, সুতা ও সুতিবস্ত্রের ওপর তার যে নির্ভরশীলতা ছিল সেটার অবসান ঘটে।[২২]

জীবনযাত্রামানের বৈষম্য

পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনীতির অধিকতর দ্রুত উন্নতি ও বহুমুখিকরণ অনিবার্যভাবে জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ১ নং সারণিতে মাথাপিছু আয়-বৈষম্যের একটি মোটামুটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যাদিতে দেখা যায় যে, মাথাপিছু আয়ের বৈষম্যগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে চূড়ান্ত ও আপেক্ষিকভাবে বেড়ে যায় ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে। ১৯৫০-এর দশকে বৈষম্যের বৃদ্ধি ঘটে ৫০ শতাংশ এবং ১৯৬০-এর দশকে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। ১৯৫৯-৬০ সালে বৈষম্য ছিল ৩২.৫ শতাংশ, ১৯৬৯-৭০ সালে এটা দাঁড়ায় ৬১ শতাংশে।

তর্ক তোলা হয়েছে যে, এসব হিসাবে উচ্চহারের ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যকে কম করে দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, মাথাপিছু আয়ের হিসাব তৈরি করার সময় পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের টাকার আপেক্ষিক কম ক্রয়ক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি।[২৩] পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান

২০. World Bank, *Bangladesh Development.*
২১. ঐ
২২. *Pakistan statistical Year Book* (PSYB). 1968.
২৩. Huq, *Strategy of Economic Planning;* Khan and Bergen, "Measurement of Structural Change"; A. Ghafur, "A Comparison of Interregional Purchasing Power of Real Wages in Pakistan. "PDR Winter 1967.

খাদ্য চাল ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য গমের মূল্যের তারতম্য লক্ষ করলেই এ-বৈষম্য বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের ক্যালোরিযুক্ত চালের দাম পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি পড়ে যায়। এ-সত্যটি অনুভব করেন মাহবুবুল হক। ১৯৫৯-৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যখন এক টন চালের দাম ছিল ৫১৮ টাকা, তখন পশ্চিম পাকিস্তানে তার দাম ছিল ৩৩৪ টাকা। ঐ সময় এক টন গমের দাম ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ৫১৭ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তার দাম ছিল ২৬৭ টাকা।[২৪] এ-সত্যের ভিত্তিতে মাহবুবুল হক আঞ্চলিক মাথাপিছু আয়ের হিসাবটা নতুন করে তৈরি করেন। তাঁর হিসাব অনুযায়ী ১৯৫৯-৬০ সালে আঞ্চলিক মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে ৬০ শতাংশে দাঁড়ায়। জনাব হক দেখিয়েছেন যে, প্রচলিত পদ্ধতির হিসাবে এ-বৈষম্যটা ৬০ শতাংশের স্থলে মাত্র ২৭ শতাংশ হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে এক মণ চালের দাম ছিল ৪২ টাকা ৩৭ পয়সা আর পশ্চিম পাকিস্তানে এক মণ গমের দাম ছিল ২২ টাকা। তখন যদি জনাব হকের পদ্ধতিতে হিসাব করা হত তা হলে বৈষম্য পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে বৃদ্ধি পেয়ে ৬১ শতাংশে পৌঁছত।[২৫]

মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্যের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হয় বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য, সেবা ও সুযোগ-সুবিধাভোগের ব্যাপারে বিরাজমান বৈষম্য। ২ নং সারণিতে আমরা ১৯৬৮-৬৭ সালের মধ্যে মূল ভোগ্যবস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈষম্যের প্রবণতা তুলে ধরেছি। প্রাপ্ত প্রমাণাদিতে দেখা যায় যে কৃষিজাত দ্রব্যাদি ভোগের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে বৈষম্য তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়, যদিও অপরিশোধিত ও পরিশোধিত চিনির চাহিদা পশ্চিম পাকিস্তানে বেশি এবং কালক্রমে এই বৈষম্য বেড়ে চলে। অত্যন্ত স্থূল বৈষম্য সৃষ্টি হয় কারখানাজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে। কাপড়, কাগজ, সিগারেট, দিয়াশলাই ও বিদ্যুৎশক্তির মাথাপিছু ব্যবহারের মাত্রা পশ্চিম পাকিস্তানে লক্ষণীয়ভাবে অনেক বেশি। এতে পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চতর হারে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি তথা শিল্পায়নের দ্রুততর গতি প্রতিফলিত হয়। এই বৈষম্য বছর-বছর বেড়ে চলে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের গৃহস্থালির আয়ব্যয়সংক্রান্ত জরিপ রিপোর্টে প্রাপ্ত মোটামুটি মাথাপিছু ভোগের প্রবণতাগুলোর দিকে তাকালে পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চতর হারে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি ও দ্রুততর গতিতে শিল্পায়নসংক্রান্ত বক্তব্যটি আরও সুদৃঢ় হয়। ২ নং সারণিতে উল্লেখিত কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের জরিপে আমরা দেখি যে, ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি পায় ১৯৬০ ও ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে।

পণ্যদ্রব্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্যের অনুরূপ বৈষম্য দেখা দেয় জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানাদিতে সুযোগলাভের ক্ষেত্রে। ৩ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে যে, জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হাসপাতাল, মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণকেন্দ্র নির্মাণ, হাসপাতালের বেডসংখ্যা ও ডিসপেনসারির সংখ্যা এবং ডাক্তার ও নার্সদের সংখ্যার দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশি এটা

২৪. Huq, *Strategy of Economic Planning*.
২৫. *Pakistan Economic Survey (PES), 1969-70*. Table 38.

মেনে নিলেও দেখা যায় যে, এ-অঞ্চলের জনগণের জন্য চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অত্যন্ত কম এবং এই বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বছরের পর বছরব্যাপী প্রায় কিছুই করা হয়নি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির অনুপাত ঐতিহ্যগতভাবে বেশি ছিল, কিন্তু ৩ নং সারণি ইঙ্গিত করে যে, ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৬ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষার সর্বস্তরে ছাত্রসংখ্যার অনুপাত বেশ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে মাইলের হিসাবে রাস্তা, রেলপথ, মোটরগাড়ি ও ব্যবহারাধীন রেডিওর সংখ্যা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে বেশি। তবে পরবর্তী বছরগুলোতে এসব বৈষম্য আরও ব্যাপক হয়। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে মাইলের হিসাবে রাস্তা ১০ গুণ বৃদ্ধি পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানে রাস্তার দৈর্ঘ্য তখনও ২০ হাজার মাইলের বেশি থেকে যায়। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের রাস্তায় ২ লক্ষের বেশি মোটরগাড়ি চলাচল করতে থাকে। এই বৈষম্য অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের নদীমাতৃক প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে। কিন্তু এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, পশ্চিম পাকিস্তানে মাইলের হিসেবে রাস্তা ও যানবাহন বৃদ্ধির তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের নদীপথের অনুরূপ সম্প্রসারণ ঘটেনি। স্থায়ীভাবে নাব্য নদীপথের মাইলের হিসাবে ১৯৫৯-৬০ সালে তা ছিল ২৬৬৮ এবং ১৯৬৯-৭০ সালে তা দাঁড়ায় ৩৩৫২ মাইল।[২৬]

বাঙালিদের বিশ্বাস জন্মে যে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভালো খায়, ভালো পরে, উন্নততর স্বাস্থ্যপরিচর্যা ও শিক্ষালাভ করে, উন্নততর যানবাহন, টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থা ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাসহ অধিকতর উন্নত পরিবেশে বাস করে। এই বিশ্বাস তাদের আপেক্ষিক বঞ্চনার ধারণাকে তীব্র করে। এমনি করে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানসমূহ অধিকাংশ বাঙালির এ-বিশ্বাসকেই শুধু বদ্ধমূল করে যে, স্বাধীনতার সুযোগগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরাই অনেক বেশি পরিমাণে ভোগ করে।

বৈষম্য এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা

আঞ্চলসমূহের উত্তরাধিকার

পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক বিশ্বাস জন্মে যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের মূলে ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট নীতি ও বরাদ্দমূলক সিদ্ধান্তসমূহ। এ-অভিমত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক কাঠামো, প্রাকৃতিক সম্পদ, ব্যবসায়িক উদ্যোগগ্রহণের ক্ষমতা ও বাজারশক্তিগুলোর অবদানকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের ওপর কিছু বেশি ক্ষমতা আরোপ করে। কাঠামোগত উত্তরাধিকার পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বিশেষভাবে অনুকূল ছিল না, যদিও রাস্তাঘাট, রেলপথ, সেচ ও বিদ্যুৎব্যবস্থাসহ তার ছিল একটা উন্নততর অবকাঠামো। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে বৃষ্টি হত অনেক বেশি পরিমাণে, এখানকার জমি ছিল অধিকতর উর্বর এবং এখানে ছিল নদীপথে মালামাল ও

২৬. প্রাগুক্ত।

যাত্রী পরিবহণের একটি বেশ উন্নত ব্যবস্থা। পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষি-সম্ভাবনা পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে উৎকৃষ্টতর ছিল বলে বিশ্বাস করার কোনো কারণই ছিল না, যদিও জনসংখ্যার দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তান নিঃসন্দেহে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। তবে পূর্ব পাকিস্তানের ভূমির উৎপাদনক্ষমতাও ছিল বেশি। শিল্পক্ষমতার দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের মতোই শোচনীয় ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে আর কিছু না থাকলেও একটি অনেক উন্নত গ্রামীণ শিল্পাঞ্চল ছিল। তাঁতশিল্প এ-অঞ্চলের বাসিন্দাদের একটা বড় অংশের বস্ত্রের যোগান দিতে পারত।

শিক্ষাসম্পদের দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে নিকৃষ্ট ছিল না। শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের স্তর এখানে উৎকৃষ্টতর ছিল, যদিও পশ্চাৎপদতার মাত্রায় তেমন কোনো ইতরবিশেষ ছিল না।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সামরিক বাহিনীসমূহে অফিসার-কর্মচারী, উচ্চপদাধিকারী প্রশাসক, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের সংখ্যা ও অবস্থানের দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান সুস্পষ্টভাবে বেশি লাভবান হয়। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ছিল ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে লোকভরতির গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে পাকিস্তান যে সশস্ত্রবাহিনীগুলো পায় সেগুলো ছিল প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়ে গঠিত। অনেকগুলো ক্যান্টনমেন্ট এবং অর্ডন্যান্স ডিপোর অবস্থানও ছিল সেখানে।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যবসায়ী শ্রেণী

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মানবিক সম্পদের মধ্যে ব্যবসায়ী-কারবারিরা ছিল অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। অবিভক্ত ভারতের ব্যাবসাজগতে মুসলিম ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তাদের স্থান ছিল অতি নগণ্য। এই নগণ্য অবস্থার কারণেই করাচির হারুন, কলকাতার আদমজি-ইস্পাহানিদের মতো ব্যবসায়ী পরিবার পাকিস্তান সংগ্রামে মুসলিম লীগকে সমর্থন করে। স্যার আদমজি, হাজি দাউদ, মির্জা আহমদ ইস্পাহানি ও তাঁর ছোট ভাই হাসান ইস্পাহানি পর্যায়ক্রমে বাংলার মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।[২৭] এসব ব্যবসায়ী ছিলেন পশ্চিম ভারতের ইসমাইলি, বোহ্‌রা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক। চিনিওটিরা এসেছিলেন পাঞ্জাব থেকে। ইরানি বংশোদ্ভূত ইস্পাহানিরা প্রধানত ব্যাবসার কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং বাংলার মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার কাছ থেকে কিছু পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন।[২৮] কিন্তু তাঁরা ছিলেন অধিকতর শক্তিশালী হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রভাববলয়ের অধীন। হিন্দু ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রাধান্য ছিল শহরাঞ্চলের মাড়োয়ারি, গুজরাটি ও পারসি গোত্রের লোকদের।

মুসলিম ব্যবসায়ীরা ভেবেছিলেন, পাকিস্তান হবে এমন একটি দেশ যেখানে হিন্দুদের প্রতিযোগিতার হুমকি থাকবে না এবং যেখানে তাঁরা বিনা প্রতিযোগিতায় পুঁজির প্রসার ঘটাতে পারবেন। পশ্চিম পাকিস্তানে রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে হিন্দু ও শিখরা দলেদলে দেশত্যাগ করলে ঐ অঞ্চলে একটা বড় রকমের

২৭. Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh.*
২৮. প্রাগুক্ত।

ব্যাবসাবাণিজ্যিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়। তখন ব্যাবসাবাণিজ্য ও শিল্প বলতে যা-কিছু ছিল তা হিন্দু ও শিখরা নিয়ন্ত্রণ করত। ওরা চলে যাওয়ায় ভারত থেকে আগত মুসলিম উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়ীরা এ শূন্যতাপূরণের আশা করেছিল। সুতরাং এসব পরিবারের অনেকেই যে দেশান্তরি হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। করাচি ছিল পশ্চিম ভারতে তাদের পিতৃভূমির কাছাকাছি এবং সংস্কৃতিগতভাবেও পাকিস্তানের ঐ অঞ্চলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতর।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পূর্ববাংলায়ও ঘটে। তবে এখানকার স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রভুত্বকারী হিন্দু ও মাড়োয়ারিরা এ-অঞ্চল ত্যাগ করে চলে যাবার কোনো প্রবল তাগিদ অনুভব না করায় এখানে পশ্চিম পাকিস্তানের মতো শূন্যতার সৃষ্টি হয়নি। এর ফলে ভারত থেকে উদ্বাস্তু ব্যবসায়ীরা এখানে আসতে উৎসাহ বোধ করেনি। কিন্তু কলকাতাভিত্তিক ব্যবসায়ী পরিবার ঢাকায় এসে আস্তানা গাড়ার চেষ্টা করে। তবে তাদের মধ্যে একমাত্র ইস্পাহানিরা এবং চামড়ার কারবারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিনিওটি আমিন পরিবার ঢাকায় তাদের সদর দপ্তর স্থাপন করে।

বাজারশক্তিগুলোর ভূমিকা

উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের হাতে যে-অসমঞ্জস কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হয়, তা উন্নয়ন-প্রক্রিয়া শুরু করার ব্যাপারে বাজার শক্তিসমূহের সীমাবদ্ধতাকে আবারও প্রকটিত করে তোলে। একথা বারবার বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের বাজারের আকার বড় হওয়ায় সেখানে অর্থনৈতিক বিকাশে গতিসঞ্চার হয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ করেছি যে, ১৯৪৯-৫০ সালের জিডিপি-এর হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের জিডিপি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কিছুটা বেশি (পূর্ব পাকিস্তানে ১২৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে ১২০৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা)।[২৯] জিডিপি-এর আকারই প্রাথমিকভাবে বাজারের আকার স্থির করে। বাজারের সাথে যদি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের করাচিতে অবস্থান, তার নিরাপত্তা ও বেসামরিক খাতে ব্যয়, চাকরি ইত্যাদিকে যুক্ত করি তা হলে পশ্চিম পাকিস্তানের বাজারসম্ভাবনা কিছু-পরিমাণে বেশি দাঁড়ায় বইকী। তবে পূর্ব পাকিস্তান রপ্তানি-আয়ের প্রধান উৎস থেকে যায়। ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৫৪-৫৫ সালের মধ্যে অর্জিত সকল বৈদেশিক মুদ্রার ৫১.৫% আসে পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি থেকে।[৩০]

এর বিপরীতে দেখা যায় যে, পাকিস্তানে গোড়ার দিকের বছরগুলোতে অনিয়ন্ত্রিত আমদানির সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান সকল আমদানির ৭০% গ্রাস করে। এতে দেখা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানিক্ষমতা বেশি।[৩১] তবে আমদানির চাহিদা গড়ে ওঠে যতটা না সমষ্টিগত চাহিদা থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি আয়ের বণ্টন থেকে। এভাবে মনে হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চতর আমদানি-চাহিদাসম্পন্ন অধিকতর সচ্ছল মানুষের একটা বৃহত্তর শ্রেণী রয়েছে। তদুপরি, পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত

২৯. Khan and Bergen. "Measurement of Structural Change", Table A-2.
৩০. Akhlaqur Rahman, *Partition, Integration, Economic Growth.*
৩১. ঐ।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষাখাতে ক্রয়, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য ব্যয় এবং কেন্দ্রের করাচিতে অবস্থান—এগুলো আমদানিগ্রাসী। জনগণের চাহিদা, দাবি ও উন্নয়নের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে এভাবে ক্ষমতাকেন্দ্রের অবস্থান ও আয়ের ভিত্তিতে আমদানি-চাহিদা নির্ধারিত হতে দেওয়া ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান অর্জনকারী পূর্ব পাকিস্তান হলেও তার প্রধান ব্যবহারকারী হতে দেওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানকে।

তখন থেকে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, উদার আমদানির এ-পর্যায় চলাকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পুঞ্জিভূত পাকিস্তানের স্টার্লিং-উদ্বৃত্তের হিস্যা এবং তার বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় হ্রাস পায়। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার ওপরও কিছুকাল ধরে ভয়ানক চাপ পড়ে এবং টাকার মূল্যমান বৃদ্ধি করতে হয়।

ঐ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে বসতিস্থাপনকারী উদ্বাস্তু বণিকশ্রেণী আমদানি বাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া দখল কায়েম করে এবং এ-বাণিজ্য থেকে বিপুল মুনাফা অর্জন করে। এসব মুনাফাই পরে ১৯৫০-এর দশকে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়নে বীজ-পুঁজি যোগায়। শিল্পায়নের এই প্রক্রিয়াকে কঠোরভাবে আমদানি নিয়োধ ও মুদ্রার বিনিময়হার বৃদ্ধির মাধ্যমে সরক্ষণ দিয়ে জোরদার করে তোলা হয়।[৩২]

এটা সুস্পষ্ট যে, কিছুটা উন্নততর বাহ্যিক অবকাঠামো, কেন্দ্রীয় সরকার ও সশস্ত্রবাহিনীসমূহের সদর দপ্তরের অবস্থিতি, পশ্চিম পাকিস্তানে বসতিস্থাপনের ইচ্ছা নিয়ে আগত উদ্বাস্তু পেশাজীবী ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের বৃহত্তর অংশের আকস্মিক উপস্থিতি ইত্যাদি ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তান উত্তরাধিকারসূত্রে কতিপয় নিশ্চিত সুবিধা লাভ করে। ১৯৪৯-৫২ কালপর্বে আমদানি উদারকরণের পর্যায়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে বিপুল পুঁজি সঞ্চিত হয়। ঐ পর্যায়ে পাকিস্তান যদি অবাধ অর্থনীতি গ্রহণ করত তা হলে পশ্চিম পাকিস্তান হয়তো পূর্ব পাকিস্তান থেকে এগিয়ে যেত। ক্রমবর্ধিষ্ণু কার্যকারণসম্বন্ধের নিয়ম এসব বৈষম্যকে স্পষ্টতর করে তুলল।[৩৩]

কিন্তু পাকিস্তানের ইতিহাসের বাস্তবতা থেকে দেখা যায়, কোরীয় যুদ্ধের দরুন ব্যাপসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে-জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার আকস্মিক অবসানের পরে বাজার নয়, বরং রাষ্ট্রই পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে কোথায় কী পরিমাণে সম্পদ বরাদ্দ ও অর্থনৈতিক তৎপরতা চলবে সেটাকে প্রভাবিত করার প্রধান নিয়ামক হয়ে ওঠে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ সরাসরি রাষ্ট্রীয় নীতির এখতিয়ারে ছিল। বৈদেশিক মুদ্রা কেন্দ্র কর্তৃক বা প্রদেশ কর্তৃক বিতরিত হত, ওটা কোন অঞ্চলে ব্যয় করা হবে, কোন খাত অগ্রাধিকার পাবে এবং প্রায় ঐ গোটা সময়টার বৈদেশিক মুদ্রা পেয়ে কোন কোন ব্যক্তি লাভবান হবেন—এ সবই রাষ্ট্রীয় নীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। এটা শিল্পায়নের স্থান ও গতিপ্রকৃতি, তাকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা কোন অঞ্চলে কতটুকু রয়েছে এবং আমদানি ও পুঁজিসঞ্চয়জনিত চলতি ভোগের পরিমাণ কোন অঞ্চলে কতটা হবে এসবকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। পাকিস্তানের ইতিহাসের পুরো সময়টায় টাকার অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণের দ্বারাই এসব করা সম্ভব হয়। টাকার

৩২. A. R. Khan, *The Economy of Bangladesh, (London 1972).*
৩৩. Gunnar Myrdal, *Economic Theory and Underdeveloped Regions.*

মূল্যবৃদ্ধি পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিখাতকেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত করেনি, বরং আমদানিকারক কিংবা শিল্পপতি হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা হস্তগত করাকে উৎসাহিত করে। এমনি করে বৈদেশিক মুদ্রাপ্রাপ্তিকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইচ্ছামতো সম্পদ ও অনুগ্রহবণ্টনের হাতিয়ারে পরিণত করা হয়।

বৈদেশিক মুদ্রা প্রসঙ্গে

পাকিস্তানের রপ্তানি আয় থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির সাথে বছরের পর বছর ধরে বৈদেশিক সাহায্য যোগ হয়। ১৯৫০-৫১ সালের কোরীয় যুদ্ধকালীন রমরমা অবস্থার সময়টা বাদে ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে পাকিস্তানের ব্যালেন্স অভ পেমেন্টের ক্ষেত্রে স্থায়ী ঘাটতি চলতে থাকে। প্রাথমিকভাবে এই ঘাটতি পূরণ করা হয় জমা স্টার্লিং ব্যালেন্স ক্ষয় করে। ১৯৫৩-৫৪ সালের পরে সরকারি উন্নয়ন সহায়তার খাতে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রবাহিত অর্থ পাকিস্তানের আমদানি ও উন্নয়নের জন্য বর্ধিষ্ণু হারে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৬১ সালের ৩. ডিসেম্বরের মধ্যে পাকিস্তান মঞ্জুরি ও ঋণ বাবদ আনুমানিক ৬ বিলিয়ন ডলার পায়।[৩৪] ১৯৪৭-৪৮ থেকে পাকিস্তানের আমদানির ৪৪% আসে এ-অর্থ থেকে।[৩৫] এতে বোঝা যায় যে, বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তি বৈদেশিক মুদ্রার ওপর দাবিকে জোরদার করে এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের গতিপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অঞ্চলগুলোর মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যবণ্টনের সিদ্ধান্তগুলোও প্রধানত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই থেকে যায়, যেহেতু বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল প্রচুর এবং প্রাপ্ত সাহায্যের চেয়ে অনেক বেশি।

রাষ্ট্রের নিয়ামক ভূমিকা

আঞ্চলিক উন্নয়নের ছাঁচকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে বৈদেশিক মুদ্রাবরাদ্দের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবধান অতি গুরত্বপূর্ণ থেকে যাওয়ায় আঞ্চলিক উন্নয়নের ভারসাম্যকে প্রভাবিতকরণে ভোক্তা ও বিনিয়োগকারী হিসেবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছিল নিয়ামক। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে পাকিস্তান সরকার রাজস্ব ও উন্নয়নখাতে ১১৩ বিলিয়ন টাকা খরচ করে।[৩৬] আঞ্চলিক অর্থনীতিতে কার্যকর চাহিদা স্থির করার ব্যাপারে এটা রাষ্ট্রকে রীতিমতো অসাধারণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা প্রদান করে। এই ব্যয়ের স্থান-নির্বাচনের ব্যাপারটি আঞ্চলিক পণ্যের বাজার ও জনকল্যাণ ব্যবস্থাগুলোর ওপর একটা তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এই ব্যয়ের যে-অংশ উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট হয়, তার পরিমাণ ছিল ৫০ বিলিয়ন টাকা। এটা অবকাঠামো, সরকারি খাতে শিল্পবিকাশ ও মানবিক সম্পদ উন্নয়নকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে অঞ্চলসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নক্ষমতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বেসরকারি খাতের বিকাশও কোনো স্বাধীন

৩৪. *Pakistan Economic Survey. 1969-70.*
৩৫. পাকিস্তানের আমদানি ব্যয়ের হিসাবের তালিকা পাবেন A. M. A. Muhith, *Bangladesh : Emergence of a Nation* (Dhaka 1979) গ্রন্থে।
৩৬. Rounaq Jahan, *Pakistan*, Table 111. 1. 62.

স্বতন্ত্র কিছু ছিল না। বেসরকারি খাতের উন্নয়ন ছিল প্রত্যক্ষভাবে সরকারি ঋণ ও ভর্তুকি এবং অপ্রত্যক্ষভাবে অবকাঠামো ও দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য সরকারি অর্থ-বিনিয়োগ দ্বারা, সরকারি ব্যয়ে সৃষ্ট বাজারব্যবস্থার মাধ্যমে এবং সরকারি নীতির চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত। এগুলো অর্থনৈতিক তৎপরতার উৎসাহপ্রদায়ক কাঠামোকে প্রভাবিত করে। আমরা নিম্নে বর্ণিত সরকারি হস্তক্ষেপের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, যথা সরকারি ও বেসরকারি ব্যয়, বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ, বৈদেশিক সাহায্য বরাদ্দ, সরকারি ব্যয়ের জন্য অর্থপ্রদান এবং সরকারি নীতির গতিপথ বা লক্ষ্য ইত্যাদিতে আঞ্চলিক পক্ষপাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করব।

সরকারি ব্যয়

সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পক্ষপাতও আমরা দেখব ৪ নং সারণিতে। এতে দেখা যাবে যে, ১৯৫৯-৭০ কালপর্বে রাজস্ব থেকে পূর্ব পাকিস্তান সকল ব্যয়ের মাত্র ২৩ শতাংশ পায়। সারণিতে প্রদত্ত পরবর্তী সময়ের মধ্যে এই প্রবণতার কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থিতি কোথায় সেটা বিবেচনা করলে আঞ্চলিক ব্যয়ের এই নমুনা পুরোপুরি বিস্ময়কর ঠেকবে না। কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে অবস্থান করে করাচিতে এবং পরে ইসলামাবাদে। তিনটি সশস্ত্রবাহিনীর সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ার অর্থ ছিল এই যে, প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় প্রধানত সেখানেই হত। সশস্ত্রবাহিনীসমূহের গঠনে দেখা গেছে যে, সেনাবাহিনীতে জওয়ানদের মধ্যে ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৭.৪ জন, বিমানবাহিনীতে ২৮ জন এবং নৌবাহিনীতে ২৮.৮ জন।[৩৭] অফিসারদের অনুপাত ছিল আরও নিম্ন। আমলাতন্ত্রের মধ্যে ১৯৬৬ সাল অবধি প্রথম শ্রেণীর কেন্দ্রীয় অফিসারদের শতকরা মাত্র ৩০ জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানি।[৩৮] কেন্দ্রীয় সরকারের নিম্নতর পদের চাকরিতে পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যা ছিল আরও কম। এসব কর্মচারী ছিল প্রধানত করাচিবাসী।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য ব্যয়, স্টোরগুলোর জন্য কেনাকাটার ব্যয়, আবাসিক ভবনাদি ও দপ্তরসমূহের বেসামরিক বিনির্মাণের ব্যয়, বৈদ্যুতিক শক্তি, টেলিযোগাযোগ ও রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য ব্যয় প্রধানত করা হত পশ্চিম পাকিস্তানে। অনুরূপ কেন্দ্রীয় ব্যয় দ্বারাই গড়ে ওঠে করাচি, রাওয়ালপিন্ডি এবং পরে ইসলামাবাদে একটি সম্পূর্ণ নতুন জাতীয় রাজধানী। এসব ব্যয়ের দরুন সৃষ্ট নিয়োগেরও বেশিরভাগ পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে চলে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপরোক্ত ব্যয়সমূহ পশ্চিম পাকিস্তানে পণ্যদ্রব্যাদির ও জনসেবামূলক ব্যবস্থার চাহিদা বৃদ্ধি করে বেসরকারি অর্থনৈতিক তৎপরতাকে জোরদার করে তোলে।

বাঙালিরা রাজস্বব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান এই গুরুতর অসমতাকে পাকিস্তানের দুই অংশের অসমতা স্থায়ীকরণের নিয়ামক কারণরূপে দেখে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে 'প্যারিটি' বা সমতার দাবি, নৌবাহিনীর সদর দপ্তর চট্টগ্রামে এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানাদির অংশবিশেষ পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরের দাবি কেবল ক্ষমতা, চাকরি ও সিদ্ধান্তগ্রহণ-ক্ষমতার অংশীদার হবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই ওঠেনি, ঐ

৩৭. ঐ।
৩৮. প্রাগুক্ত।

দাবিগুলো উঠেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের সম্ভাব্য ব্যয়ের সুফললাভের প্রত্যাশায়। প্রশাসন ও সশস্ত্রবাহিনীর চাকরির জন্য বাঙালিদের যোগ্যতা কম—এই অভিমত বাঙালিরা কখনো মেনে নেয়নি। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের (সি. এস. পি.) মতো উচ্চতর পদের প্রথম শ্রেণীর চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা প্রবর্তন আদিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান করাচিতে হওয়ার দরুন সৃষ্ট অসমতা ও বিভাগকালে ভারত সরকারের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অসমতাকে কখনো দূর করতে পারেনি। সশস্ত্রবাহিনীতে বাঙালিদের নিযুক্তিবৃদ্ধির ব্যাপারে দৈহিক সামর্থ্যসংক্রান্ত প্রশ্ন তোলা হয়। অবশ্য স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে সশস্ত্রবাহিনীসমূহের বিকাশ প্রমাণ করে যে, সশস্ত্রবাহিনীর চাকরিতে নিয়োগলাভের জন্য উপযুক্ত বাঙালির কোনো অভাব ছিল না এবং নিয়মিত উপযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ এবং শরীরচর্চা যে-কোনো জাতিসত্তার দৈহিক স্বাস্থ্য ও যোগ্যতা বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে পারে। পাকিস্তান সরকার যদি শুরু থেকে সচেতনভাবে বেসামরিক ও সশস্ত্রবাহিনীর চাকরিতে সমতা আনার চেষ্টা করত, তা হলে হয়তো দশ বছরের মধ্যে সে-লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হত। সেক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গীকারের বিশ্বসযোগ্যতা সম্পর্কে বাঙালিদের ধারণা অনেকাংশে পরিবর্তিত হত।

উন্নয়ন ব্যয়

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাতের মূল কারণ থেকে যায় সরকারি উন্নয়ন ব্যয়বণ্টনে পক্ষপাত। পাকিস্তানে শুরু থেকেই জাতীয় সংসদে এই মর্মে প্রশ্ন উঠতে থাকে যে, সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান তার প্রাপ্য হিস্যার চাইতে কম পাচ্ছে। ১৯৫০-৫৫ সালের প্রাক-পরিকল্পনা আমলে সরকারি উন্নয়ন ব্যয়ের মাত্র ৭০ কোটি টাকা জোটে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যে। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান পায় ২০০ কোটি টাক।[৩৯] বণ্টন-বরাদ্দে এ-ধরনের পক্ষপাতিত্বের কী যুক্তি থাকতে পারে তা কখনো স্পষ্ট করে বলা হয়নি। সরকারি ব্যয়বরাদ্দের পশ্চাতে কোনো কৌশলগত চিন্তা ছিল না—একথা বলে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্তানকে সরকারি ব্যয়ের শতকরা মাত্র ৩৬ ভাগ প্রদানকে আর কোনোক্রমেই যুক্তিগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। আদায়কৃত ব্যয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা দাঁড়ায় আরও করুণ। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সরকারি ব্যয়ের মাত্র ৩০ শতাংশ পায় পূর্ব পাকিস্তান।

১৯৫৬ সালে বাঙালি অর্থনীতিবিদরা পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা করার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমালোচনা করেন। তাঁরা শুধু সরকারি সম্পদের অধিকতর পক্ষপাতশূন্য বণ্টনই নয়, পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বতন্ত্র উৎপাদনকারী ও ভোক্তা ইউনিটরূপে গণ্য করারও দাবি তোলেন। তাঁরা পাকিস্তানকে একটি অখণ্ড পরিকল্পনা-সত্তা হিসেবে না দেখে দুটো অর্থনীতি হিসেবে গণ্য করার এবং দুই অর্থনীতির জন্য দুটি পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা বলেন।[৪০]

৩৯. *Report of the Panel of Economists on the Fourth Five Year Plan*, Government of Pakistan. (Comments of E. P. Members).
৪০. S. V. Khan, "A Measure of Economic Growth in East and West Pakistan", *PDR*, Autumn-1961.
উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত (১৮-২১ ডিসেম্বর ১৯৫৬) পাকিস্তান ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশন-এর এক সম্মেলনে একাধিক বাঙালি অর্থনীতিবিদ পাকিস্তানের দুই

পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকরা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অর্থবরাদ্দের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতেন যে, প্রদেশটির পরিশোষণক্ষমতা কম। তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারকে পরিকল্পনার অধীনে বরাদ্দকৃত অর্থ অব্যবহৃত থেকে যাওয়ার বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন। বাঙালি অর্থনীতিবিদ ও প্রশাসকরা যুক্তি দেখাতেন যে, পরিশোষণ ক্ষমতা তহবিল প্রদান ও কেন্দ্র থেকে প্রাদেশিক সরকারের কাছে কর্তৃত্ব হস্তান্তর—এই উভয়ের ওপর নির্ভর করে। পূর্ব পাকিস্তানে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি অবকাঠামোর আপেক্ষিক দুর্বলতা এমনিতেই পরিশোষণে বাধা সৃষ্টি করে। ১৯৫১–৫২ সালে কিলোওয়াটপ্রতি বিদ্যুতের মাথাপিছু ব্যবহার পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৮.৬ এবং পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ০.৫।[৪১] ১৯৫০–৬০–এর দশকে বিদ্যুৎশক্তিখাতে পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল অর্থনিয়োগের ফলে ১৯৫৯–৬০ সাল নাগাদ সেখানে বিদ্যুতের ব্যবহার ২৮.৮ কিলোওয়াটে উন্নীত হয়। সে–তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যুতের মাথাপিছু ব্যবহারের পরিমাণ অতি সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে মাত্র ১.৬ কিলোওয়াটে পৌঁছে। ১৯৪৭–৪৮ ও ১৯৫৭–৫৮ সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে মাইলের হিসেবে রাস্তা বৃদ্ধি পায় ৫৬০৩ মাইল, অথচ পূর্ব পাকিস্তানে রাস্তা বৃদ্ধি পায় মাত্র ৪৬০ মাইল।[৪২]

পূর্ব পাকিস্তানের তহবিল ব্যবহারে বিলম্বের কারণ ছিল ঝামেলাপূর্ণ অনুমোদন প্রক্রিয়া। চার–চারটি পৃথক সংস্থা দ্বারা এখানে যে–কোনো বড় প্রজেক্ট অনুমোদন করিয়ে নিতে হত। সংস্থাগুলো হচ্ছে ঃ প্রাদেশিক উন্নয়ন ওয়ার্কিং পার্টি, প্রাদেশিক প্ল্যানিং কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ওয়ার্কিং পাটিং ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের পরিচালনা কমিটি (একনেক)। এরকম পরিস্থিতিতে কেন্দ্র যত দ্রুততার সাথে স্কিমগুলো অনুমোদন করত ও পরে তহবিল ছাড়ত সেটা সম্পদের ব্যবহারকে ততটা প্রভাবিত করত। তবে এমনকি তহবিল ছাড়ার পরেও বৈদেশিক মুদ্রাপ্রাপ্তিতে বাধাবিঘ্ন, ইস্পাত ও সিমেন্ট ইত্যাদি উপকরণ (পূর্ব পাকিস্তানে যেগুলোর ঘাটতি ছিল) সংগ্রহে বিঘ্ন, বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বল্পতা, যানবাহন ও যোগাযোগের অপর্যাপ্ততা প্রজেক্টগুলোকে বিলম্বিত করে দিতে পারত। পরিকল্পনায় বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন হারের ক্ষেত্রে যে–অঙ্ক নির্ধারিত হয়েছে তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

অঞ্চলের জন্য দুটি আলাদা অর্থনীতি গড়ে তোলার পক্ষে যুক্তি প্রদান করেন। যেমন, এস,এম, মুজিবুর রহমান সম্মেলনে পঠিত তাঁর প্রবন্ধে দুই অর্থনীতির সমর্থনে মন্তব্য প্রকাশ করে বলেন ঃ "But we cannot ignore the hard reality and here got to admit that there are actually two economics in the country. ... The superstructure of political oneness must be built on economic twoness and let us narture this twoness so far it is congenial to the whole gamut of our economic life. দেখুন S. M. Mujibur Rahman, "Inter Zonal Trade in Pakistan," *Pakistan Econimic Journal*, Vol. 7 (March 1957). No 1.

৪১. প্রাগুক্ত।

৪২. ঐ।

বৈষম্য প্রশ্নে বিতর্ক

১৯৬০–৬৫ সালের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে আঞ্চলিক বরাদ্দ ও তার সদ্ব্যবহারসংক্রান্ত প্রশ্নাদি কিছুটা গভীরভাবে আলোচিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ওপর আলোচনার প্রস্তুতি উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পনা বোর্ড তৎকালে করাচিতে অবস্থিত পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অভ ডেভেলপমেন্ট–এ কর্মরত আখলাকুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তৎকালীন রিডার মোশাররফ হোসেইন ও তৎকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে কর্মরত বর্তমান প্রবন্ধকারকে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সম্পদ বরাদ্দসংক্রান্ত প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান স্থিরীকরণে বোর্ডকে সাহায্য করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ওয়ার্কিং গ্রুপের আলোচনায় অর্থনীতিবিদরা পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে একত্রে কাজ করেন। তাঁরা আঞ্চলিক পরিকল্পনায় সম্পদের বণ্টনকে জনসংখ্যার আকারের সাথে সম্পর্কিত করার গুরুত্বের কথা এবং ১৯৫০–এর দশকে সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে–অসমতা ঘটেছে তা সংশোধনের কথা বলেন। এসব আলোচনায় সিদ্ধান্তগ্রহণ–ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তবায়ন–ক্ষমতার উন্নয়ন, পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনের (পিআইডিসি) দ্বিধাবিভক্তি এবং কয়েকটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরের ওপর জোর দেওয়া হয়।

পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশন মোটেই এসব যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। তখন দেশে সামরিক আইন চালু থাকায় বাঙালি অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন সেমিনার ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে যেসব প্রশ্নে সামান্য বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেসব প্রশ্ন রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে উথাপন করার উপায় ছিল না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রকাশিত হবার পর দেখা গেল, পরিকল্পনা–ব্যয়ের শতকরা ৪১ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।[৪৩] প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তুলনায় এটা অনেক বেশি। প্রথম পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানে আদায়কৃত বিনিয়োগ ছিল শতকরা মাত্র ২০ ভাগ।[৪৪] দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে একটা আঞ্চলিক অসমতার ব্যাপার রয়েছে সেটাকে বিশদভবে স্বীকার করেনি। এই পরিকল্পনা পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়, তবে যুক্তি দেখায় যে, ঐতিহাসিকভাবে কোনো দেশেই সকল অঞ্চলে একই সাথে এবং সমহারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেনি।[৪৫]

সুতরাং এটা বিস্ময়কর নয় যে, আঞ্চলিক প্রশ্ন আবারও পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের তীব্র বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ১৯৬০ সালের গ্রীষ্মে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রকাশনা উপলক্ষে রাওয়ালপিন্ডিতে আয়োজিত এক বর্ধিত সেমিনারে পরিকল্পনাটির প্রথম সমালোচনা উচ্চারিত হয়। এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগদানকারী নূরুল ইসলাম ও এই প্রবন্ধকার, পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকের

---

৪৩. Huq Strategy of Economic Planning, Table 55.

৪৪. দেখুন *Reports of the Panel of Economists on the Fourth Five Year Plan*. Govermment of Pakistan. (Comments of E. P. Members).

৪৫. Government of Pakistan, The Second Five year Plan, 1960-65.

তদানীন্তন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম. রশিদসহ কয়েকজন বাঙালি সি. এস. পি. অফিসার আঞ্চলিকতার প্রশ্নে পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান সাইদ হাসান, প্রধান অর্থনীবিদ এম. এল. কোরেশি, কমিশনের যুগ্ম প্রধান অর্থনীতিবিদ আফতাব আহমদ খান, উপপ্রধান অর্থনীতিবিদ মাহবুব উল হক এবং পাকিস্তানের নীতিনির্ধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ বেসামরিক আমলারা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থনীতিবিদদের প্যানেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এন. হুদা ও মাযহারুল হক অংশগ্রহণ করেন। প্যানেল আঞ্চলিক প্রশ্নকে খাটো করে দেখে এবং মেনে নেয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির গতিশীলতার দরুন ঐ অঞ্চলে অধিকতর বিনিয়োগ হওয়া উচিত। তবে তাঁরা যুক্তি দেন যে, দ্রুত বিকাশশীল অঞ্চল থেকে এবং বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করা দরকার যাতে সেখানে উন্নয়ন দ্রুততর হয়।[৪৬] একটা সুপারিশে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে উন্নততর আঞ্চলিক ভারসাম্যের তাগিদে পশ্চিম পাকিস্তানে কিছু লাভজনক বিনিয়োগ বাদ দেওয়া উচিত, তবে যেই সীমার মধ্যে সেই নীতি কাজ করবে তা সুস্পষ্টভাবে বেঁধে দিতে হবে যাতে অর্থনীতির সার্বিক বিকাশের হারে কোনো গুরুতর হ্রাস পেতে দেখা না যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজির উৎপাদনক্ষমতা, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং বিনিয়োগহার পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে বেশি—এমন অযাচাইকৃত ও ভ্রান্ত ধারণা থেকে একথা বলা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের শতকরা ৫ ভাগের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে সঞ্চয়ের হার ছিল শতকরা ৮ ভাগ। এ-সময় পূর্ব পাকিস্তানে মোট বিনিয়োগহার ছিল ৭% আর পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩%।[৪৭]

পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পরিশোষণক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্যানেল প্রস্তাব করে যে, কেন্দ্র ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকৌশলি ও প্রশাসনিক কর্মচারী মোতায়েনের মাধ্যমে কেন্দ্রের উচিত পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব সরাসরি গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার দলিল এবং অর্থনীতিবিদদের প্যানেলের মধ্যে এরকম দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে যে, পাকিস্তানের অর্থনীতি অখণ্ড এবং সেখানে আঞ্চলিক অসমতা দূরীকরণের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে গেলে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ বিঘ্নিত হতে পারে। এই দুশ্চিন্তা তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলাকালেও কেন্দ্রীয় পরিকল্পক ও পশ্চিম পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদদের মন ঘিরে থাকে।

বলাবাহুল্য, পরবর্তী তথ্য-প্রমাণে দেখা গেছে যে, বিনিয়োগদক্ষতার ক্ষেত্রে যেমন পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো শ্রেষ্ঠতা ছিল না, তেমনি পূর্ব পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তরের জন্য উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ও তার ছিল না, বরং প্রাক-পরিকল্পনা-ব্যয় হিসেবে সিন্ধু অববাহিকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বিনিয়োগ এবং জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা হ্রাসকল্পে বিনিয়োগকে হিসাবের মধ্যে ধরলে প্রমাণিত হবে যে, ভেলকিবাজি করে পরিকল্পনার মধ্যে অধিকতর আঞ্চলিক ভারসাম্য নিশ্চিত করার কথা বলে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ব্যয় ও আয়ের বৈষম্যকে স্থায়ী করে রাখা হয়।

৪৬. দেখুন *Reports of the Panel of Economists on the Fourth Five Year Plan*. Government of Pakistan.

৪৭. Huq. *Strategy of Economic Planning. Tables 28, 29.*

দুই অর্থনীতি ধীকল্প

প্ল্যানিং ও সম্পদবণ্টনের ভিত্তি হিসেবে একটি অখণ্ড জাতীয় অর্থনীতির ধীকল্প (Ideal) দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রকাশিত হবার পরপরই কবরস্থ হয়। ১৯৬১ সাল নাগাদ বিতর্কটি সেমিনারকক্ষ ও সরকারি চেম্বারগুলো থেকে রাজপথে ও প্রচারমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আইউবের মার্শাল ল সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে গণতান্ত্রিক সমাবেশ জোরদার হয়ে ওঠার সাথে সাথে আঞ্চলিক বৈষম্য ও সম্পদ-বরাদ্দের বৈষম্য বাঙালিদের দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে দেখা হয় মার্শাল ল পরিকল্পনা হিসেবে, যা পূর্ববর্তী দশকে পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনাকে সংশোধনের পরিবর্তে সেই একই অবিচার স্থায়ী করার জন্য সরকারি নীতি ও সম্পদকে ব্যবহারের চেষ্টা করে। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, উন্নয়নক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের অবসান ও প্রদেশগুলোর হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণের ওপর জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। কিছু-কিছু বাঙালি অর্থনীতিবিদ এ-সময় বাঙালিদের মধ্যে জাতীয় অধিকার ও দাবিদাওয়া-ভিত্তিক যে-আন্দোলন গড়ে উঠছিল তার মুখ্য প্রচারক হয়ে পড়েন। পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত সেমিনারগুলোতে পাকিস্তানের অখণ্ড জাতীয় উন্নয়নসংক্রান্ত প্রচলিত কল্পকাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করা হয়।[৪৮]

এসব অর্থনীতিবিদের কারও কারও দ্বারা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত ছাত্র আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান জঙ্গিপনা আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রশ্নকে রাজনৈতিক শক্তি প্রদান করে। তা না হলে প্রশ্নটি সেমিনারকক্ষগুলোতে পণ্ডিতি বিতর্কের মধ্যে আবদ্ধ থেকে যেত। ১৯৬১ সালে ঢাকা সফরকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বাঙালি অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে এক আলোচনা-বৈঠকে মিলিত হন। ঐ বৈঠকে স্থানীয় অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন অধিকতর মুখর, তাঁদের জোরালো যুক্তি প্রেসিডেন্টকে বিচ্ছিন্ন ও নিরুত্তর করে দেয় এবং প্রবীণতম অর্থনীতিবিদগণ অধিকতর সহনীয় ভাষায় তাঁদের মতামত ব্যাখ্যা করেন। পরে এক জনসভায় প্রেসিডেন্ট প্রথমবারের মতো আঞ্চলিক অসমতার সমস্যাটিকে স্বীকৃতি দেন এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকারি সম্পদ-বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা ও সুপারিশ-প্রদানের জন্য একটি জাতীয় অর্থ কমিশন গঠন করেন।

ফিন্যান্স কমিশন

প্রথম ফিন্যান্স কমিশনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় করাচিতে ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে। এ-ই প্রথম পাকিস্তানে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রশ্নে আলোচনার জন্য একটি সরকারি কমিটির প্রথম বৈঠক বসে।[৪৯] কমিশনের পূর্ব পাকিস্তানি সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব ডি. কে. পাওয়ার, এম. রশীদ, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থসচিব আবুল খায়ের এবং নূরুল ইসলাম। এই প্রবন্ধকার কমিশনকে

৪৮. Rehman Sobhan, "How to build Pakistan"

৪৯. দেখুন *Reports of the Panel of Economists on the Fourth Five Year Plan*, Government of Pakistan, (Comments of E. P. Members).

সহায়তা করেন। তিনি জনাব নূরুল ইসলামের সঙ্গে একত্রে কাজ করে একটা রিপোর্ট তৈরি করেন, যা পরে কমিশনের পৃথক রিপোর্ট হয়ে দাঁড়ায়। তিনটি রিপোর্ট পেশ করা হয়—একটি পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের তরফ থেকে, একটি পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যদের পক্ষ থেকে এবং একটি কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক। পূর্ব পাকিস্তানি সদস্যদের রিপোর্টে মাথাপিছু আয়বৈষম্যের শতকরা হিসেবের দিকে দৃষ্টি রেখে জনসংখ্যার অনুপাতের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সম্পদসমূহ বরাদ্দের জন্য একটি সুসমন্বয়কারী ফর্মুলার কথা বলা হয়। বলা হয় যে, বৈষম্য দূরীকৃত হওয়ামাত্রই জনসংখ্যার অনুপাতসংক্রান্ত ফর্মুলাটি প্রদত্ত হবে। সে-সময় পাকিস্তানে সংবিধান প্রণীত হচ্ছিল। পূর্ব পাকিস্তানি সদস্যরা এই ফর্মুলাটি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেন। তবে কমিশনের পূর্ব পাকিস্তানি সদস্যরা বৈষম্য-বিলোপে সরাসরি ব্যবস্থার করা উচিত এমন সব রাজস্বসম্পদকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর আস্থা স্থাপন করেন। এটা ছিল রাজস্বের স্থানীয় সংগ্রহের ভিত্তিতে রাজস্বখাতে প্রাপ্ত আয় আরও বেশি পরিমাণে প্রদেশগুলোর হাতে রেখে দেওয়ার যে-দাবি কমিশনের পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যরা তুলেছিলেন সেটার প্রতি চ্যালেঞ্জ। চাকুরিসুবিধা, আয়বৃদ্ধি ও এর উপায়সৃষ্টি, বাজারের বিকাশ ও নগরায়ণের ওপর স্থানীয় প্রভাবের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নবহির্ভূত বরাদ্দ আরও বেশি হওয়ার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। তাঁরা পরিশোষণ-ক্ষমতাকে বিঘ্ন হিসেবে না দেখে উন্নয়নের একটা উপায় হিসেবে দেখেন এবং প্রজেক্টগুলোর বাধাবিপত্তি উত্তরণে বৈদেশিক কারিগরি সাহায্য ব্যবহারের কথা বলেন।

আঞ্চলিক প্রশ্নে জনগণের উদ্বেগ যখন চরমে পৌঁছে যাচ্ছে, তখন ফিন্যান্স কমিশনের মধ্যে এই বিতর্ক চলতে থাকায় আইউব সরকার ১৯৬২ সালের সংবিধানে আঞ্চলিক মাথাপিছু আয়বৈষম্য হ্রাসের স্পষ্ট উদ্দেশ্যে সরকারি সম্পদবণ্টনের অঙ্গীকারটি অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হয়। ১৯৬০-এর মধ্যভাগে দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রকাশনা ও ১৯৬২ সালের প্রথম দিকে সংবিধানের প্রকাশনাকালের মধ্যে এটা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে একটি নাটকীয় মত পরিবর্তন। সংবিধান গৃহীত হবার পর বৈষম্যহ্রাসের সাংবিধানিক লক্ষ্যপূরণে অগ্রগতি পর্যালোচনাকল্পে দ্বিতীয় অর্থ কমিশন নিয়োগ করা হয়। কিন্তু বৈষম্য সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য উপাত্তের অভাবে কমিশনের কাজ ব্যাহত হয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনা বৈষম্য দূরীকরণে কতটা সফল হবে তা অনুমান করতে কমিশন অক্ষম হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

১৯৬৫ সালে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয় এমন একটা সময়ে যখন আঞ্চলিক বরাদ্দের প্রশ্নে জনগণের বিতর্ক সাংবিধানিক অঙ্গীকার ও আঞ্চলিক অর্থবরাদ্দের প্রশ্নকে পরিকল্পনাবিষয়ক বিতর্কের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে এসেছে। ফলে তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পিত বিনিয়োগের ৫১ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়ার কথা বলা হয়। সরকারি ব্যয়ের ৫৩ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানে হবে বলে নির্দিষ্ট হয় এবং বেসরকারি বিনিয়োগে সমতা বজায় রাখার কথা বলা হয়। তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সিন্ধু

অববাহিকা উন্নয়নে পরিকল্পনা-বহির্ভূতভাবে ব্যয়িত ৩৮০ কোটি টাকা ছিল বণ্টনের পাল্লাকে পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কার্যত, তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন সরকারি বিনিয়োগের শতকরা ৫৫ ভাগ ব্যয়িত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। এতে পরিকল্পনাকে বৈষম্যহ্রাসকরে কাজে লাগানোর সাংবিধানিক অঙ্গীকার অপূর্ণ থেকে যায়। পরিকল্পনাকালের মধ্যে বৈষম্য ১৯৬৪-৬৫ সালের শতকরা ৪৫.৪ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালে ৬১.৫ শতাংশে বর্ধিত হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনার অর্থনীতিবিদ প্যানেলে মোশাররফ হোসেন এবং এই প্রবন্ধকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্যানেলের আলোচনায় আঞ্চলিক বৈষম্য, সরকারি খাতের ভূমিকা ও ভূমিসংস্কার বিষয়ে বিতর্ক এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে, প্যানেলের চেয়ারম্যান কমিশনের মুখ্য অর্থনীতিবিদ এম. এল. কোরেশি দুই বা তিনটি বৈঠকের পরই প্যানেলের আলোচনা হঠাৎ এবং অসময়ে বন্ধ করে দেন।

আঞ্চলিক বৈষম্য প্রশ্নে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে পার্লামেন্টের এমন কোনো অধিবেশনই চলেনি যেখানে বৈষম্য বিষয়টি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল না। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতারা বাঙালি অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বৈষম্যকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করেন। ১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের গোলটেবিল বৈঠকে (আর. টি. সি.) আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে উত্থাপিত ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি মূলত আঞ্চলিক অসমতাকে ভিত্তি করেই রচিত হয়। এতে পাকিস্তানে দুই অর্থনীতিযুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। ছয় দফার তিনটি দফা অর্থ, রাজস্ব ও বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি নির্ধারণের ক্ষমতা অঞ্চলগুলোর হাতে অর্পণসংক্রান্ত উদ্বেগ প্রকাশ করে। তবে ছয় দফা প্রণয়নের সঙ্গে কোনো অর্থনীতিবিদই জড়িত ছিলেন না, যদিও বাঙালি অর্থনীতিবিদদের রচনাসমূহ উক্ত কর্মসূচিকে সুস্পষ্টভাবে প্রভাবিত করে। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে বসে অর্থনৈতিক সমস্যাদি আলোচনা করেন।

আঞ্চলিক বৈষম্যহ্রাসে তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রশ্নকে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠার কেন্দ্রবিন্দু করে তোলে। আন্দোলনের লক্ষ্য বৈষম্য দূরীকরণের দিক থেকে স্বায়ত্তশাসনের দিকে সরে যায়। ১৯৬৯ সালের গোড়ার দিকে আইউব সরকার যে-রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয় তা নিরসন ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধন সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে আইউব খান ইসলামাবাদে এক গোলটেবিল বৈঠক ডাকেন। কারাগার থেকে সদ্যমুক্ত শেখ মুজিবুর রহমান গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য পেশকালে তাঁকে সহায়তাদানের জন্য তিনজন প্রখ্যাত বাঙালি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক আনিসুর রহমান ও অধ্যাপক ওয়াহিদুল হককে এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানে স্বায়ত্তশাসনের ছয় দফা দাবি অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে সংবিধানের সংশোধনী প্রণয়নের জন্য ডক্টর কামাল হোসেনকে আহ্বান জানান।

আইউব সরকারের পতনের পরে ১৯৬৯ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী লড়াইয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ছয় দফাই ছিল মূল রণধ্বনি। তার মানে, বৈষম্যের ইস্যুটি আবার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। "সোনার বাংলা শ্মশান কেন" শিরোনামে আওয়ামী লীগ কর্তৃক তৈরি পোস্টারটি নির্বাচনী প্রচারের অত্যন্ত ফলপ্রদ হাতিয়ারে পরিণত হয়। এই পোস্টারটিতে আপেক্ষিক অর্থনৈতিক বঞ্চনা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদরা যেসব পরিসংখ্যান একসময় তুলে ধরেছিলেন সেগুলো সন্নিবেশিত হয়। পোস্টারটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে যায়। এভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি পরিবারের রাজনৈতিক সচেতনতার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। তখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে ক্রমবর্ধমানভাবে বাংলাদেশ বলে মনে করা হতে থাকে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ছয় দফার ইস্যুতে যখন নির্বাচনী প্রচারণা অভিযান চলছে সে-অবস্থায় চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন একটি গৌণ দৃশ্যে পরিণত হয়। খসড়া পরিকল্পনায় পশ্চিম পাকিস্তানের ৩৮০০ কোটি টাকার তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হয় ৩৭০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট উন্নয়নব্যয়ের শতকরা ৪৯.৩ ভাগ। তবে তখনকার আবেগপূর্ণ পরিস্থিতিতে জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাসকল্পে পরিকল্পনা কমিশনকে পরিকল্পনাটি নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে বলে। পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়ায় পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হয় ৩৯.৪ বিলিয়ন টাকা (সরকারি খাতে ২৯.৪ বিলিয়ন + বেসরকারি খাতে ১০ বিলিয়ন টাকা) এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে দেওয়া হয় ৩৫.৬ বিলিয়ন টাকা (সরকারি খাতে ১৯.৬ বিলিয়ন + বেসরকারি খাতে ১৬ বিলিয়ন টাকা)।[৫০] এই প্রথমবার পূর্ব পাকিস্তানকে পরিকল্পনার বৃহত্তর হিস্যা প্রদান করা হয়।

চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যালোচনার জন্য গঠিত অর্থনীতিবিদদের প্যানেলে নিম্নোক্ত বাঙালি অর্থনীতিবিদগণ ছিলেন—মাযহারুল হক, নূরুল ইসলাম, আখলাকুর রহমান, আনিসুর রহমান ও বর্তমান লেখক। বাঙালি অর্থনীতিবিদগণ পরিকল্পনা কমিশনের তদানীন্তন মুখ্য অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হকের সভাপতিত্বের অধীনে এ-কারণে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানান যে, যাঁদের তৈরি বণ্টননীতির দরুন আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। প্যানেলগুলোর ইতিহাসে সেই প্রথমবার পরিকল্পনা কমিশনের মুখ্য অর্থনীতিবিদ সভাপতির আসনে বসতে পারেননি। পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক সমিতির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মাযহারুল হককে প্যানেলে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্যানেলের আলোচনার শুরুতেই পূর্ব পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদগণ একটি অন্তর্বর্তীকালীন সামরিক প্রশাসন কর্তৃক চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়নের সং উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের মতে, কাজটি আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের শেষে যে-সরকার গঠিত হবে সেই সরকারের। তবে তাঁরা প্যানেলের কাজে অংশ নেন এই প্রত্যাশায় যে, আঞ্চলিক বৈষম্য সম্পর্কে এবং সেগুলো দ্রুত দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পর্কে তাঁরা বড় রকমের বক্তব্য রাখতে পারবেন।

৫০. *Pakistan Economic Survey.* 1970-71.

আঞ্চলিক প্রশ্নে সৃষ্ট পার্থক্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, এমনকি ১৯৭০ সালে পাকিস্তান যখন আঞ্চলিক প্রশ্নের চাপে দ্রুত ভেঙে পড়ছিল, তখনও প্যানেলের পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যরা ঐতিহাসিক অসমতাসমূহ দূর করার অঙ্গীকার প্রদানে তাঁদের পূর্ব পাকিস্তানি সহকর্মীদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারেননি। উভয় গ্রুপই জানতেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনা ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তাঁদের কাজ রাজনীতি-প্রভাবিত অকার্যকর কসরত মাত্র। তবু তাঁরা দুটি পৃথক রিপোর্ট পেশ করেন।

বাঙালি অর্থনীতিবিদগণ দুটি বিকল্প মডেল উপস্থিত করেন। একটিতে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের পরিকল্পনার কথা বলা হয়, যার ৭৫ বিলিয়ন টাকার ৪০.৫ বিলিয়ন (৫৪%) পাবে পূর্ব পাকিস্তান এবং ৩৪.৫ বিলিয়ন (৪৬%) পাবে পশ্চিম পাকিস্তান। দ্বিতীয় মডেলটি ছিল অপেক্ষাকৃত বড় আকারের পরিকল্পনার। এতে পশ্চিম পাকিস্তানের ঐতিহাসিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখার জন্য পূর্বেকার অনুপাত অক্ষুণ্ন রেখে ৪৩.২ বিলিয়ন টাকা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এবং ৩৬.৮ বিলিয়ন টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়।

প্যানেলের পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যদের রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হয় ৩৬.৩৫ বিলিয়ন (৪৮%) টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানকে দেওয়া হয় ৩৮ বিলিয়ন টাকা। পরিকল্পিত ব্যয়ের পর্যায়গুলো অবশ্য এমনভাবে স্থির করা হয় যাতে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষদিকে (১৯৭০–৭৫) পরিকল্পনাব্যয়ের ৫৪% হিস্যা পূর্ব পাকিস্তান পায়। আঞ্চলিক পুঁজির উৎপাদন অনুপাতে পেমেন্ট অ্যাকাউন্টের আঞ্চলিক ব্যালেন্স, সম্পদের চলন্ত আঞ্চলিক স্থানান্তর ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয় প্যানেলের সদস্যদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে রাখে। দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁদের এসব বিতর্ক কিছুটা অবান্তর শোনায়।

শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, চতুর্থ পরিকল্পনার চূড়ান্ত দলিলে এসব বিতর্কের রাজনৈতিক চরিত্রকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সংশোধিত পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত বরাদ্দের অনুপাত পূর্ব পাকিস্তানি সদস্যদের দেওয়া অনুপাতের কাছাকাছি। প্যানেলের উভয় গ্রুপের সদস্যদের রিপোর্টে আঞ্চলিক মাথাপিছু আয়বৈষম্য, সম্পদের আন্তঃঅঞ্চল স্থানান্তর ইত্যাদির হিসাব-সংক্রান্ত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সন্নিবেশিত থাকায় এগুলো পাকিস্তানের আঞ্চলিক প্রশ্ন বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসে পরিণত হয়েছে।

পাকিস্তানের পরিকল্পিত উন্নয়নের স্থিতিপত্র

পাকিস্তানে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের ২০ বছর শেষ হলে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক বৈষম্য ১৯৪৯–৫০-এর মাথাপিছু আয়ের ২১.৯ শতাংশ থেকে প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৯–৭০ সালে ৬১.৫ শতাংশে পৌঁছেছে। এ থেকেই বোঝা যায় পাকিস্তান রাষ্ট্র বণ্টন ও নীতিনির্ধারণের দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করেছে। আমরা লক্ষ করেছি যে, ১৯৫৯–৭০ কালপর্বে সকল উন্নয়নব্যয়ের শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত হয়েছে। পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহের আমলে এই বৈষম্য কিছুটা হ্রাস পেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এতে বোঝা যায় যে, জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ-অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানে একের পর এক পরিকল্পনার আমলে মাথাপিছু বিনিয়োগে সুনিশ্চিত বৈষম্যসমূহ বেড়েই চলেছে। এভাবে মাথাপিছু উন্নয়নব্যয়ক্ষেত্রে বৈষম্য ১৯৫১–৫২

সালের ৮৬ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৫–৭০ সালে ২৮১ টাকায় পৌঁছে।[৫১] তার মানে, মাথাপিছু বিনিয়োজিত সম্পদের ব্যবধান বছরের পর বছর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনুরূপ বরাদ্দব্যবস্থার অধীনে আন্তঃআঞ্চলিক মাথাপিছু আয়ের বৈষম্যবৃদ্ধি ছিল অবধারিত।

ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ক্যাপিটাল আউটপুট বেশিও (আইকোর) প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ছোটখাটো উদ্যোগের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পুঁজি পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশি উৎপাদনক্ষম ছিল। এর উপর ভিত্তি করে চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া ও পশ্চিম পাকিস্তানি প্যানেলের অর্থনীতিবিদদের রিপোর্টে বরাদ্দের হিস্যা স্থির করা হয়। বিনিয়োগের পাল্লা পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে ঝুঁকে থাকা সত্ত্বেও দুটো পরিকল্পনাকালে সরকার মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য হ্রাস করতে চায়। তাঁরা চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্তানে আইকোর নিচু থাকবে বলে ধরে নেন। এই অনুমানকে প্যানেলের পূর্ব পাকিস্তানি সদস্যরা চ্যালেঞ্জ করেন। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্তানে 'আইকোর' সত্যি কম হলে এবং পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলোর আমলেও তা–ই থাকলে পরিকল্পিত সর্বাধিক বৃদ্ধির কারণে পূর্ব পাকিস্তানে আগের পরিকল্পনাগুলোর সময়ের চাইতে বরাদ্দের পরিমাণ আপেক্ষিকভাবে বেশি হবার কথা। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও পশ্চিম পাকিস্তানে অধিকতর বিনিয়োগকে ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য অধিকতর বিনিয়োগদক্ষতার একই যুক্তি ব্যবহৃত হয়। কার্যত 'আইকোর'–সংক্রান্ত তথ্যগুলোই দুর্বল। কাজেই, সম্পদবরাদ্দকে প্রভাবিতকরণের ভিত্তি হিসেবে পুঁজির উৎপাদনশীলতার যুক্তি বাদ দেওয়া এবং শুধু বরাদ্দের হিস্যা ও মাথাপিছু আয়ের দিকে তাকানোই নিরাপদ। বরাদ্দের হিস্যা ও মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য বছরের পর বছর বৃদ্ধিই পেয়েছে।

বৈষম্য স্পষ্টকরণে বেসরকারি খাতের ভূমিকা[৫২]

মোটমাট ব্যয়ের উপাত্তগুলোর দিকে তাকাতে গিয়ে আমরা বেসরকারি খাতে উন্নয়নব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অনেক প্রবলতর বৈষম্যকে দৃষ্টির আড়ালে রেখে দিই। সরকারি খাতের ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫০–৭০ কালপর্বে ব্যয়ের ৪০% পূর্ব পাকিস্তানে করা হয়। কালক্রমে এই হিস্যা ১৯৫০–৫৫ সালের ২৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৫–৭০ সালে ৪৮ শতাংশে দাঁড়ায়। সরকারি উন্নয়নব্যয় স্বদেশে সংগৃহীত সরকারি সম্পদ ও বৈদেশিক উৎস থেকে সংগৃহীত সম্পদ থেকে সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাহ করা হয়। এদিক থেকে রাষ্ট্র কোন অঞ্চলকে বা কোন কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে সরকারি খাতে উন্নয়নব্যয়ের মাধ্যমে তা সরাসরি প্রতিফলিত হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানি নীতিনির্ধারক ও অর্থনীতিবিদরা যুক্তি দিয়ে এসেছেন যে, মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যের মূলে রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে বেসরকারি খাতের গতিময়তা। ১৯৫০–৭০ কালপর্বে বেসরকারি খাতে উন্নয়নব্যয়ের শতকরা ৭৭ ভাগ

৫১. দেখুন Report of Economists on the Fourth Plan, Government of Pakistan, (Comments of E. P. Members).

৫২. Figures in the Sector are derived from Table IV.

ঘটে পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৫০–৭০ সময়কালে মোট উন্নয়নব্যয়ের শতকরা ৪৮ ভাগ বেসরকারি খাতে নির্বাহ করা হয় বিধায় পশ্চিম পাকিস্তানে ৫১% এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৩২%) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিনিয়োগ–বৈষম্যের মূল উৎস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের বেসরকারি খাত। পূর্ব পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদগণ এটা স্বীকার করে নিয়ে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে বেসরকারি খাত অধিকতর গতিময় হবার কারণেই রাষ্ট্রের উচিত পূর্ব পাকিস্তানে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। তাঁরা আরও যুক্তি দেখান যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় থেকেই পরিকল্পনা কমিশন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি খাতের জন্য অবাস্তব বিনিয়োগ–লক্ষ্য স্থির করে দেয়। কমিশন ভালো করেই জানত যে ওসব লক্ষ্য কখনো বাস্তবায়িত হবে না। এটা প্রমাণিত হয় এ–তথ্য দ্বারা যে, পরবর্তী পরিকল্পনাগুলোর আমলে পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি খাত তার ব্যয়ের লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে পড়ে, অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়িত কিংবা অতিক্রান্ত হয়। পরিকল্পনার শুরুতেই সার্বিক উন্নয়নব্যয়ের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য কমিয়ে আনার কৃত্রিম ধারণাসৃষ্টির অভিসন্ধি নিয়েই কাজটি করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদগণ যুক্তি দেখান যে, সার্বিক উন্নয়নব্যয়ে সমতা আনার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি ব্যয়ের হিস্যা বেশি প্রয়োজন। চতুর্থ পরিকল্পনার প্যানেলের বাঙালি সদস্যরা যুক্তি দেন যে, খসড়া পরিকল্পনার সুপারিশকৃত ৫৫% এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় কার্যত আদায়কৃত ৪৮%–এর স্থলে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ ৬২% নির্ধারিত হোক। খসড়া পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ মোট পরিকল্পনাব্যয়ের ৩৮.৫ শতাংশ নির্ধারিত হয়। বাঙালি অর্থনীতিবিদরা বেসরকারি বিনিয়োগের এ–হিস্যাটি কার্টেল করার সুপারিশ করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি খাতের যে–আপেক্ষিক দুর্বলতা আমরা লক্ষ করেছি, তা দুই অঞ্চলের ভিন্নরকম উত্তরাধিকারের অংশ। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে কোথাও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় ব্যবসায়িক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিল না। সিন্ধুতে ব্যবসাবাণিজ্য সবই হিন্দুরা নিয়ন্ত্রণ করত। পাঞ্জাবের ব্যবসাবাণিজ্যে শিখ ও হিন্দুর প্রাধান্য ছিল। চামড়ার ব্যবসার সাথে যুক্ত পাঞ্জাবি মুসলিম চিনিওটিরা পাঞ্জাবের বাইরে ব্যবসা করতে পছন্দ করত। বাংলার বাঙালি মুসলিমরা সকল পর্যায়ের ব্যবসাবাণিজ্যে অনুপস্থিত ছিল। সুতরাং ভারত থেকে আগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলোই ব্যবসাবাণিজ্যের পাল্লা পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে ভারী করে তোলে। তবে এ–সম্প্রদায়ও পশ্চিম পাকিস্তানে কলকারখানা স্থাপনে রাতারাতি বিনিয়োগের জন্য বস্তা বস্তা সোনা নিয়ে পাকিস্তানে আসেনি। তারা এনেছিল ব্যবসাবুদ্ধি ও দক্ষতা। সেটা দ্বারা পাকিস্তানের সূচনাপর্বে বৈদেশিক মুদ্রা উদ্বৃত্ত থাকার বছরগুলোতে আমদানি–বাণিজ্যের মাধ্যমে তারা বিপুল মুনাফা অর্জন করে। কোরীয় যুদ্ধের রমরমা অবস্থা ধসে পড়ার পর এসব উদ্বৃত্ত সংরক্ষণশীল বাণিজ্যনীতির আওতায় শিল্পায়নের বীজ–পুঁজিরূপে কাজ করে।

এটা পরিষ্কার যে, ১৯৪৮–৪৯ সালে উভয় অঞ্চলের শিল্পক্ষমতাই ছিল নগণ্য এবং বস্ত্র–উৎপাদন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সমপরিমাণ ছিল। সিগারেট ও সিমেন্ট উৎপাদনে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা ছিল সামান্য। পূর্ব পাকিস্তান ছিল বড়রকমের

চা–উৎপাদনকারী। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের কলকারখানায় নিয়োজিত কর্মীসংখ্যা ছিল ১,১৭,৩৫৫ জন, আর পূর্ব পাকিস্তানে এদের সংখ্যা ছিল ৫৫,০৭৪ জন। ১৯৫৪ সাল নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায়। সেখানে চাকরিরত লোকের সংখ্যা প্রায় ৮৮ হাজার ছাড়িয়ে যায়। এ–সময় পূর্ব পাকিস্তানে বৃদ্ধি পায় মাত্র ৩৩ হাজার। পশ্চিম পাকিস্তানে বৃহদায়তন শিল্প–উৎপাদন ১৯৪৯–৫০ সালের ২১ কোটি টাকা থেকে দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় পৌঁছে। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে তা তিন কোটি ৮০ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সাত কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।[৫৩] পশ্চিম পাকিস্তানে সুতার উৎপাদন ১৯৪৮–৪৯ সালের এক কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড থেকে ১৯৫৪–৫৫ সালে ২৫ কোটি ২০ লক্ষ পাউন্ডে উপনীত হয় এবং বস্ত্রের উৎপাদন একই সময়ে চার কোটি ৪০ লক্ষ গজ থেকে ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ গজে বর্ধিত হয়।[৫৪] পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে সুতা ও কাপড়ের উৎপাদন সামান্যই বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৯–৫০ ও ১৯৫৪–৫৫ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প ও যানবাহন খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৭০ কোটি টাকা, আর পশ্চিম পাকিস্তানে ঐ খাতগুলোতে বিনিয়োগ করা হয় ২১৩ কোটি টাকা।[৫৫] বেসরকারি খাতের বিকাশের আরেকটি পরিমাপ পাওয়া যেতে পারে অঞ্চলগুলোর জন্য প্রদত্ত পুঁজির অনুমোদন–সংক্রান্ত পরিসংখ্যান থেকে। ১৯৪৮–৫১ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১০ কোটি ছয় লক্ষ টাকার পুঁজিপ্রদান অনুমোদিত হয়, আর পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য অনুমোদিত হয় ৪২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা।[৫৬] তা থেকে ৩০ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা (৭৩%) অনুমোদিত হয় করাচির জন্য। এমনি করে পাকিস্তানে শিল্পায়নের গোড়ার দিকে করাচিতে বসবাসরত বহিরাগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলোর হাতে পুঞ্জীভূত বাণিজ্যিক পুঁজি একটি নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়।

পাকিস্তানের প্রথম বছরগুলোতে অবাধ অর্থনীতির অধীনে ব্যাবসার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র যে অবিন্যস্তভাবে কাজ করেছে সেটাই হয়তো পাকিস্তানে আদি পুঁজিগঠন বা পুঞ্জীভবন–প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্বের একটা ব্যাখ্যা দিতে পারে। রাষ্ট্র তখনও বেসরকারি খাতে পুঁজিগঠনের জন্য অর্থযোগানের একটা তাৎপর্যপূর্ণ উৎস হয়ে ওঠেনি। পাকিস্তানের প্রথম বছরগুলোতে যে একমাত্র এজেন্সি হাতের কাছে ছিল তা হচ্ছে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (পি.আই.এফ.সি.)। এর দুই কোটি টাকার আদায়কৃত মূলধনের শতকরা মাত্র ৫১ ভাগ ছিল সরকারের।[৫৭] বৈদেশিক মুদ্রার ওপর হাত না থাকায় এর ঋণদান–তৎপরতা দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে এটা কেবল শতকরা ছয় ভাগ সুদে ঋণদান করতে থাকে। ১৯৪৯–৬০ সালের মধ্যে পি.আই.এফ.সি. প্রায় ২৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ঋণদান করে। এর ৫৬ শতাংশ যায় বস্ত্রকারখানা ও পাটশিল্পে এবং অধিকাংশ যায় বৃহৎ

৫৩. Akhlaqur Rahman, *Partition, Integration, Economic.*
৫৪. ঐ।
৫৫. Huq, *Strategy of Economic Planning.*
৫৬. *Pakistan Statistical Year Book, 1968.*
৫৭. S. A. Abbas and Brecher, Foreign Aid and Industrial Development of Pakistan, (U. K. 1972)

কলকারখানার মালিকদের হাতে। ঐ প্রাথমিক যুগে বেসরকারি খাতে এরকম সব বড় কলকারখানা স্থাপিত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। কাজেই এটা অনুমান করা ন্যায়সঙ্গত হবে যে, পি.আই.এফ.সি. থেকে খুব স্বল্পসংখ্যক বাঙালিই উপকার পেয়েছে, যদিও এর ঋণ কয়েকটি অবাঙালি পরিবার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত পাটকলে বিনিয়োগে সহায়তা করে।

এটাও অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হবে যে, পাকিস্তানের প্রথম যুগের শুরুতে বেসরকারি শিল্পখাতে যে–বিনিয়োগ হয় তা এসেছিল ব্যাবসা এবং পরে পণ্য উৎপাদনে অর্জিত মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ থেকে। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এসব উৎসের সৃষ্টি হয়েছিল পুঁজি বা অর্থ জমানোর ক্ষেত্রে 'য যা পার হাতিয়ে নাও' নীতির ফল হিসেবে। ১৯৫২ সালের পরে ব্যাবসাভিত্তিক পুঁজিসঞ্চয় আমদানি লাইসেন্স প্রাপ্তির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল থাকে। অতিরিক্ত মূল্যের বিনিময় হার, আমদানি সীমাবদ্ধকরণ এবং শিল্পখাতে আমদানি লাইসেন্স নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ—এসবের মানে দাঁড়ায় এই যে, বরাদ্দসংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ একচেটিয়া মুনাফা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিতে পরিণত হয়েছিল। আমতানি লাইসেন্স বিতরণ এমনি করে কে কোথায় কী শিল্প স্থাপন করবে তা নির্ধারণের ব্যাপারে সরকারের একটা নীতিগত হাতিয়ারে পরিণত হয়। ১৯৫১ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে দেখা যায় যে, পাকিস্তান সরকার ১১০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বাণিজ্যিক আমদানি লাইসেন্স বরাদ্দ করেছে এবং তার ৬৭% পেয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানি আমদানিকারকরা। এসব লাইসেন্স শিল্পে বিনিয়োগের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর সম্পদ এনে দেয়।

যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে, পাকিস্তান সরকার শিল্পায়নের এই প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপত্তিস্থল, প্রাথমিক বাসস্থান ও নগদ টাকার উৎস যেখানেই হোক না কেন তা বিচার না করে বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগে বাধ্য করতে পারত। অনুরূপভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বৈধ বাণিজ্যিক আমদানির লাইসেন্সসমূহ পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস ও কর্মরত ব্যবসায়ীদেরকে দেওয়া যেত। বাঙালিদেরকে পুঁজিসঞ্চয়ের একটা উৎস–প্রদানের বিষয়টাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া যেত। আঞ্চলিক বৈষম্য স্থায়ীকরণে বিনিয়োগের স্থান ও পুঁজিসঞ্চয়ের ক্ষমতা একটা বাজারসৃষ্ট শক্তি—এ–ধারণাটি ১৯৫০–এর দশকে পাকিস্তানের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকালীন অর্থনীতির ব্যাপারে কোনোক্রমেই খাটে না।

শিল্পায়নের, বিশেষ করে মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের গতিবেগ বৃদ্ধিকল্পে পাকিস্তান সরকার পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন (পি.আই.ডি.সি.) স্থাপন করে। কথা ছিল এই সরকারি সংস্থাটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনার জন্য সরাসরি কিংবা বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় শিল্প স্থাপন করবে এবং শেষোক্তগুলো থেকে অবিলম্বে বা পর্যায়ক্রমে সরকারি হোল্ডিংসমূহ প্রত্যাহার করবে। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পায়নে পি.আই.ডি.সি. অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, তবে পশ্চিম পাকিস্তানেও তা সক্রিয় ছিল। ১৯৫২ সালে জন্মের সময় থেকে ১৯৭০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত পি.আই.ডি.সি. ১১৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে পশ্চিম পাকিস্তানে ৫৮টি

শিল্প প্রজেক্ট স্থাপন করে। এর ২০.৯% বিনিয়োগ আসে বেসরকারি খাত থেকে।[৫৮] পূর্ব পাকিস্তানে পি.আই.ডি.সি. ১৮৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে ৭৪টি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট স্থাপন করে।[৫৯] এতে দেখা যায়, পি.আই.ডি.সি.-এর ৬১ শতাংশ বিনিয়োগ যায় পূর্ব পাকিস্তানে। যুক্তি দেখানো যায় যে, বেসরকারি খাত পশ্চিম পাকিস্তানে বিনিয়োগে অধিকতর আগ্রহী থাকার ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য এসব বেসরকারি শিল্প বিনিয়োগের আরও বৃহত্তর অংশ পূর্ব পাকিস্তানে আসতে পারত।

১৯৫০-এর দশকের শেষদিকে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সহায়তাকল্পে পি.আই.ডি.সি. আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান শিল্প ঋণ কর্পোরেশন (পি.আই.সি.আই.সি.) এবং ১৯৬১ সালে পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক (আই.ডি.বি.পি.) স্থাপন করে। ব্যাংকটি পি.আই.এফ.সি.ও.-এর সম্পদ ও দায় অধিগ্রহণ করে। পাকিস্তান সরকারও ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান বিনিয়োগ কর্পোরেশন এবং ১৯৭০ সালে ইকুইটি পার্টিসিপেশন ফান্ড গঠন করে। এসব এজেন্সি পাকিস্তানে বেসরকারি শিল্পকে উৎসাহপ্রদানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৭-৬০ সালের মধ্যে এসব এজেন্সি কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ৪৮০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা থেকে ১৯২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রকল্পসমূহ।[৬০] কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ১৭২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা (৪২%) পূর্ব পাকিস্তানে আসে।[৬১] পাকিস্তানের সরকারি উন্নয়ন ফিন্যান্স ইনস্টিটিউটসমূহের (পি.ডি.এফ. আই.) ঋণদান নীতি এটাই প্রতিপন্ন করে যে, পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ-প্রদানে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তারা বেসরকারি বিনিয়োগের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে হবার ব্যাপারটি সংশোধন করতে পারেনি, ফলে ১৯৫০ সালের মধ্যে বেসরকারি খাতের উন্নয়নব্যয়ের শতকরা ৭৭ ভাগ চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। পি.ডি.এফ.আই. কার্যত এসব বৈষম্যে উৎসাহপ্রদান করে, যেহেতু বেসরকারি খাতের বিনিয়োগে সরকারি ঋণদান কার্যক্রম সবসময়েই অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এসেছে।

পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি খাতে অবাঙালিদের প্রাধান্য

পাকিস্তান আমলে যেটা কম নজরে পড়েছে তা হল এই যে, পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি বিনিয়োগ বলতে বাঙালিদের দ্বারা বিনিয়োগ বোঝাত না। পাকিস্তানে গণবিতর্কের মূলকথা ছিল বিনিয়োগের স্থান হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানকে নির্বাচন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ যাতে সেভাবেই হয় সেজন্য রাষ্ট্রীয় নীতি ও সম্পদকে কাজে লাগানো। কিন্তু কার্যত বাঙালি মুসলিমদের দুর্বল ব্যবসায়িক যোগ্যতার কারণে পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে অবাঙালিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত

৫৮. *Pakistan Economic Survey, 1970-71.*
৫৯. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *Public Enterprise in an Intermediate Regime : A Study in the Political Economy of Bangladesh,* (Dhaka 1980)
৬০. প্রাগুক্ত।
৬১. Muhith. *Bangladesh.*

হয়ে যায়। আমরা লক্ষ করেছি যে, অবাঙালি মুসলিমরা অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগ প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় বিত্তবান ব্যবসায়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল। বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মধ্যে এ-শ্রেণীটা ছিল যথেষ্ট প্রভাবশালী। ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালের মধ্যে পি.আই.ডি.সি. আনুমানিক ২২ কোটি ১০ লাখ টাকার স্থির পরিসম্পৎসহ পূর্ব পাকিস্তানে ১২টি জুটমিল স্থাপন করে। এতে পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক জীবনে অবাঙালিদের অবস্থান যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জুটমিলগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় অবাঙালি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে।[৬২] ই.পি.আই.ডি.সি. এসব পাটকল স্থাপনে বৈদেশিক মুদ্রা যোগায়। পরবর্তীকালে তা ১৯৫৪ সালে কর্ণফুলী কাগজের মিলটি ৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা মূল্যে দাউদগোষ্ঠীর কাছে হস্তান্তর করে। এই অঙ্কটি ছিল মিলটির প্রকৃত মূল্যের চাইতে অনেক কম।[৬৩] পূর্ব পাকিস্তানে পি.আই.সি.আই.সি. এবং আই.ডি.বি.পি. প্রদত্ত ঋণের এক-তৃতীয়াংশ লাভ করে অবাঙালিরা[৬৪]। ১৯৬৯-৭০ সালে বাঙালি ব্যবসায়ী শিল্পোদ্যোক্তাদের ঋণদান ত্বরান্বিত করা হয়। ১৯৫৭ সালের মধ্যে আই.ডি.বি.পি. এবং পি.আই.সি.আই.সি. কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের ৪২.২ শতাংশ অর্থাৎ ১০২ কোটি ৭ লাখ টাকা কেবল বাঙালিদেরকে দেওয়া হয়। এটা করা হয় ইতিপূর্বে পি.ডি.এফ.আই. বাঙালিদেরকে উপেক্ষা করেছিল বলে।[৬৫] এই সময়টুকু (১৯৬৯-৭১) বাদ দিয়ে আমরা যদি ধরে নিই যে, ১৯৫৭-১৯৬৯ কালপর্বেই পি.ডি.এফ.আই. পূর্ব পাকিস্তানে তার সকল ঋণ অবাঙালিদেরকে দিয়েছিল, তা হলে দেখা যায় যে, ১৯৬৯ পর্যন্ত অবাঙালিরা পি.ডি.এফ.আই.-সমূহের দেয়া ১১৮ কোটি ৭০ লাখ টাকা ঋণের ৬২ শতাংশ লাভ করেছে।[৬৬]

প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় স্পন্সরশিপ এবং অবকাঠামোর উন্নয়ন ও আঞ্চলিক বাজারের প্রসারের সঙ্গে বিনিয়োগের উৎস হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন অবাঙালি ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা এদিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রাকমুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানের শহরাঞ্চলীয় অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে অবাঙালিদের কবজায় ছিল।[৬৭] শিল্পখাতে তারা শতকরা ৪৭ ভাগ শিল্প পরিসম্পৎ নিয়ন্ত্রণ করত। অবাঙালিরা ২৮টি চা-বাগানও নিয়ন্ত্রণ করত। চা-এর মোট উৎপাদনের শতকরা ১৯ ভাগ আসত এই বাগানগুলো থেকে।

বাণিজ্যখাতে বড় আমদানি ক্যাটাগরি হোল্ডারদের শতকরা ৯৩ ভাগই ছিল অবাঙালি এবং তাদের মধ্যে শতকরা ৫৭ জন ছিল মেমন সম্প্রদায়ভুক্ত।[৬৮] পাকিস্তানের দুই অংশের আন্তঃবাণিজ্যেও নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ছিল অবাঙালিদের।

৬২. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *public Enterprise.*
৬৩. *T. Hexner. EPIDC-A Conglomerate in East Pakistan,* (Harvard Institute of International Development 1969).
৬৪. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed. Public Enterprise.
৬৫. ঐ।
৬৬. ঐ।
৬৭. ঐ।
৬৮. H. Papnek, *Entrepreneurs in East Pakistan,* South Asian Series Research Paper NO-16, Publishef by Asian Studies Centre, Michigan State University, 1969.

অবাঙালিদেরকে আমদানি লাইসেন্স দেওয়া হলে বহু ক্ষেত্রে তারা সেগুলো অপেক্ষাকৃত সুপ্রতিষ্ঠিত অবাঙালিদের কাছে বিক্রি করে দিত। শতকরা ৯৫ জন তালিকাভুক্ত বাঙালি আমদানিকারক অত্যন্ত ছোট লাইসেন্সই পেত।[৬৯] রপ্তানি-বাণিজ্য অনুরূপভাবে অবাঙালিকবলিত ছিল। পাটের রপ্তানি-বাণিজ্যে অবাঙালিদের হিস্যা ছিল ২৫%, বাঙালিদের ৩৩% এবং বাকিটা নিয়ন্ত্রণ করত বিদেশী ও সরকারি খাতের ধারকগণ। তবে পশ্চিম পাকিস্তানে চা, কাগজ, কাগজজাত দ্রব্যাদি, দিয়াশলাই, ট্যাগ-করা দ্রব্যাদি রপ্তানিতে অবাঙালিরাই ছিল প্রধান। পূর্ব পাকিস্তানের পাইকারি ব্যাবসা এবং শহরাঞ্চলের খুচরা ব্যাবসার বেশিরভাগও তারাই নিয়ন্ত্রণ করত।

ব্যাংকিং-এর এলাকায় ডিপোজিটের শতকরা ৭০ ভাগই যেত অবাঙালি ব্যাংকগুলোতে। বীমাব্যাবসার বেশিরভাগ চালাত অবাঙালি বীমা কম্পানিগুলো।[৭০] অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণের ক্ষেত্রে অতি বৃহত্তম জাহাজ-মালিকদের দুজনই ছিলেন অবাঙালি।

পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক অবাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক অর্থনৈতিক খাতও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করত। এর ফলেই তারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ব্যাবসাবাণিজ্য থেকে অর্জিত মুনাফা পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগের জন্য সেখানে নিয়ে যেতে পারত। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি বিনিয়োগ দ্রুততর করার প্রয়াসজনিত প্রবৃদ্ধি পশ্চিম থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানির জন্য বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনৈতিক বিকাশকে উৎসাহিত করে। ১৯৭১ সাল নাগাদ পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহদায়তন শিল্পখাতের ১৫ শতাংশ উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারে পরিণত হয়।[৭১]

পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদান করতে হলে সম্পদ যাতে বাঙালিদের হাতে যায় সে-ব্যবস্থা করতে হত। কিন্তু পাকিস্তানের অখণ্ড বহুজাতিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে এরকম জাতিভিত্তিক ব্যবস্থা সম্ভব ছিল না, যদিও মালয়েশিয়াতে চীনাদের মুখোমুখি মালয়িদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎসাহপ্রদানের ক্ষেত্রে এটা বহু বছর ধরে নীতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। তদুপরি, সরকারি সম্পদাদি গ্রহণে ইচ্ছুক বাঙালি ব্যবসায়ী উদ্যোক্তার সংখ্যাল্পতাও ছিল একটি সমস্যা। আমদানি লাইসেন্সসমূহ, শিল্পস্থাপনে অনুমতি এবং পি.ডি.এফ.আই.-এর ঋণ প্রায়ই চলে যেত অবাঙালি ব্যবসায়ীদের হাতে। যাই হোক, ১৯৬০-এর দশকে পি.ডি.এফ.আই.-এর সম্পদসমূহ যাতে বাঙালি ব্যবসায়ীরা পায় সেজন্য একটি সচেতন প্রচেষ্টা নেওয়া হয় এবং প্রথমবারের মতো একজন বাঙালিকে আই.ডি.বি.পি.-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯৬৯ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী গণঅভ্যুত্থানের পরে পি.ডি.এফ.আই.-গুলো পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ঋণদান তৎপরতা বাড়িয়ে দেয় এবং বাঙালি আবেদনকারীদের ঋণদান বৃদ্ধি করে।

৬৯. ঐ।
৭০. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *Public Enterprise*.
৭১. Computed from estimates of value added in manufacture in West Pakistan Reported in *Pakistan Economic Survey*, 1971 and estimates of interwing trade, reported in World Bank, *Bangladesh Development*.

বাঙালি উদ্যোক্তাশ্রেণীর বিকাশ

বাঙালিদের ব্যবসায় ও শিল্পোদ্যোগের যোগ্যতা কম থাকায় ই.পি.আই.ডি.সি.-এর নেতৃত্বে সরকারি খাতকে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পায়ন জোরদারকরণে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। সরকারি খাতকে বেসরকারি ব্যবসায়িক উদ্যোগের স্থান গ্রহণ করতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানি আমলাতন্ত্র অর্থনীতিতে অবাঙালিদের অধিকতর প্রভুত্ব নিরোধের গুপ্ত কৌশলরূপে সরকারি খাতের সম্প্রসারণকে ব্যবহার করে। ১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে ই.পি.আই.ডি.সি. বাঙালিদেরকে পাটশিল্পে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। এটি বাঙালি উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় ১০টি পাটকল স্থাপনের জন্য ৩ কোটি ৫৫ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে।[৭২] পি.ডি.এফ.আই.-সমূহ থেকে অধিকতর সাহায্য পাওয়ার ফলে মিলগুলোর বাঙালি মালিকদেরকে মিলগুলো স্থাপনে প্রয়োজনীয় মোট বিনিয়োগ ১৭ কোটি ৪০ লাখ টাকার শতকরা মাত্র ২০ ভাগ দিতে হয়। ই.পি.আই.ডি.সি. সুবিধাজনক শর্তে ২ কোটি ৪৭ লাখ টাকা নিয়ে একটি কাগজের মিল ও ৩ কোটি ১৯ লাখ টাকায় একটি চিনিকল থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে বাঙালি উদ্যোক্তাদের হাতে ছেড়ে দেয়।[৭৩]

একটি বাঙালি উদ্যোক্তাশ্রেণী গড়ে তোলার উপরোক্ত প্রয়াসসমূহের ফল হিসেবে স্বাধীনতা অর্জনকালে আধুনিক শিল্পখাতে স্থির পরিসম্পৎ-এর ১৮ শতাংশ ছিল বাঙালিদের হাতে। তবে উক্ত বিনিয়োগগুলোর পাঁচ-ষষ্ঠাংশই ছিল পাট ও বস্ত্রখাতে এবং একটি পুঁজি-প্রত্যাহৃত চিনিকলে। বাঙালি উদ্যোগ ও মালিকানার বেশিরভাগই সীমাবদ্ধ থেকে যায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের কলকারখানায়।

ব্যাংকিংখাতে বাঙালিরা ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক ও দি ইস্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশন নামে দুটি ব্যাংক স্থাপন করে। বীমাখাতে স্বাধীনতা অর্জনকালে বাঙালিদের ১২টি কম্পানি ছিল।[৭৪] এগুলোর পরিসম্পৎ-এর হিস্যা ছিল অতি ক্ষুদ্র। এগুলো ব্যাবসা করত প্রধানত পাট রপ্তানির ক্ষেত্রে। বাঙালি পাট রপ্তানিকারকদের বেশিরভাগ স্থল শিপারস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হলেও মিলিতভাবে পাটের মোট শিপমেন্টের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তারাই করত। জহরুল ইসলাম পরিবারের মতো কিছুসংখ্যক বাঙালি বেসামরিক বিনির্মাণের বড় বড় ঠিকাদারি পেতে শুরু করেছিল। সিভিল সার্ভিসের কোনো কোনো অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী আমলাতন্ত্রের মধ্যে তাদের যোগাযোগগুলোকে কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত লাভজনক ইনডেন্টিং ব্যাবসায়ে ঢুকে পড়েন। ইনডেন্টিং ব্যবসায়ে, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সরবরাহের ক্ষেত্রেও অবাঙালি প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। বাঙালি ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাশ্রেণী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অর্জিত এসব সাফল্যের অধিকাংশ ১৯৬০-এর দশকের এবং বিশেষ করে ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগের ফসল, যখন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ক্রমবর্ধমান চাপ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে আমলাতন্ত্রের মধ্যে ওপরে ওঠার ও ব্যাবসার ক্ষেত্রে অধিকতর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সুযোগ এনে দিচ্ছিল। তবে এই উদীয়মান বাঙালি

৭২. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *Public Enterprise*.
৭৩. T. Hexner, *EPIDC*.
৭৪. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *Public Enterprise*.

ব্যবসায়ী শিল্পপতিশ্রেণী অবাঙালিদের কনিষ্ঠ অংশীদার থেকে যায় এবং স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবসাজগতে অবাঙালি প্রাধান্য অব্যাহত থাকে।

সুতরাং এটা যুক্তিসঙ্গত যে, ব্যাবসা-শিল্পগত উদ্যোগের ব্যাপারটি সবসময় পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে কাজ করে। ভারত থেকে আগত উদ্বাস্তু ব্যবসায়ীসম্প্রদায়সমূহের আকস্মিক বসতিস্থাপনের দরুন পাকিস্তানের গোড়ার দিনগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানই এগিয়ে ছিল। এটা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান ব্যবধানকে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তোলে এবং আরও প্রসারিত করে। বাঙালি ও অবাঙালি উদ্যোক্তাদের মধ্যকার ব্যবধানও এর ফলে আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে আমরা পরবর্তী অংশে দেখব যে, অর্থনৈতিক নীতির দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই প্রধান প্রভাববিস্তারকারী হিসেবে থেকে যায়। পশ্চিম পাকিস্তান প্রথম থেকে যে-সুবিধা ভোগ করে তার ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি ব্যাবসায়ীদেরকে উৎসাহদান ও সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, উভয় কাজই করতে পারত।

রাষ্ট্র যে সামন্ত ও পেশাজীবী শ্রেণীগুলোকে শিল্পের ক্ষেত্রে টেনে আনার ব্যাপারে একটি নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে পারত তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬০-এর দশকে পাঞ্জাবি ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের ব্যবসায়ী পরিবারগুলোর দ্রুত উত্থানের মধ্যে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা কোনোরকম ব্যবসায়িক পশ্চাৎভূমিহীন এক ব্যক্তিকে পাকিস্তানের ৪৩টি শীর্ষস্থানীয় পরিবারে অন্যতম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কী করতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে আছে প্রেসিডেন্ট আইউব খানের ছেলের শ্বশুর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশবাসী জেনারেল হাবিবুল্লাহ খান খট্টকের মালিকানাধীন গান্ধারা ইন্ডাস্ট্রিজ-এর উত্থান। আজ করাচির মতোই লাহোর পাকিস্তানের একটি গতিশীর বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পাঞ্জাবি ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের একটি নতুন প্রজন্ম সমৃদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে তেমনটি ঘটেনি।

বাঙালিরা তাদের নিজেদের দেশে বিদেশী উপস্থিতির ছায়ায় বাস করছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাবসার সুযোগগুলোতে হাত দিতে পারছিল না। নতুন উদ্যোগগ্রহণ বা ব্যাবসার সুযোগলাভের জন্য করাচি-ইসলামাবাদে ছোটাছুটি করতে তারা বিরক্তিবোধ করত এবং এসব কাজে অবাঙালি আমলারা বাঙালি ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতা করত বলে তারা অসন্তুষ্ট হত। গোড়ার দিকের বছরগুলোতে অবাঙালি সিভিল সার্ভেন্টরাই পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয় চালাত। পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করার পর বাঙালিরা ইসলামাবাদের তুলনায় তাদের ক্ষমতাহীনতা এবং সম্পদ ও দায়িত্বের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণহীনতার দরুন হতাশায় ভুগত।

আই.ডি.বি.পি.'র মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার দায়িত্বগ্রহণ এবং কেন্দ্রে সচিবপদে বাঙালির নিযুক্তিলাভ শুরু হবার পরেই কেবল বাঙালি ব্যবসায়ীদের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, সুযোগের পাল্লা তাদের দিকে ঝুঁকছে। সুতরাং পাকিস্তান যেমন চিনিওটি ও মেমনদেরকে অবিভক্ত ভারতের মাড়োয়ারি ও গুজরাটি ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য থেকে মুক্তিলাভের সুযোগ এনে দিয়েছিল, তেমনি কেন্দ্রে বাঙালিদের ক্ষমতালাভ এবং প্রদেশে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বর্ধিষ্ণু বাঙালি ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের জন্য অবাঙালি বাণিজ্যিক প্রাধান্য থেকে মুক্তিলাভের সুযোগ এনে দেয়।

অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে পক্ষপাতিত্ব

সম্পদ বরাদ্দ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্বপশ্চিম বিরোধের কারণ হিসেবে থেকে যায়। সরকারি সম্পদ ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ন্ত্রিত হত সরকারি নীতি দ্বারা, যা অর্থনৈতিক তৎপরতার স্থান ও অর্থ যোগানোর উৎস উভয়কেই প্রভাবিত করত। আমরা সরকারি নীতির চারটি এলাকার ওপর দৃষ্টিপাত করব। এগুলো অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্বকে প্রতিফলিত করেছে, বঞ্চনাবোধকে সুদৃঢ় করেছে এবং এ বঞ্চনাবোধ বাঙালি জাতীয়তাবোধের আগুনে ঘি ঢেলেছে। এই এলাকাগুলোর মধ্যে পড়ে বাণিজ্যনীতি, বৈদেশিক মুদ্রাবরাদ্দের হার নির্ধারণ, ফেডারেল ফিন্যান্স ও বহিঃসম্পদ আহরণ নীতি।

বাণিজ্যিক নীতি

বাঙালিদের মনে অত্যন্ত গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল যে-বিষয়টি, তা হল পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারে বঞ্চনা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রধান বাজার ছিল ভারত। পাকিস্তানের ৬৫ শতাংশ পাট যেত ভারতে এবং অবশিষ্ট ৩৫ শতাংশ রপ্তানি হত বিশ্বের অন্যান্য দেশে।[৭৫] এ-পরিস্থিতি শিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা ও পূর্ববাংলার বৈষম্যকে প্রতিফলিত করেছে। ভারতের পাটকলগুলো ছিল পশ্চিমবাংলায়, আর সেরা পাট উৎপন্ন হত পূর্ববাংলায়। ১৯৪৭-এর পরেও ভারতের সঙ্গে পাটের বাণিজ্য পূর্ববাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবীর জীবনরক্ষার একমাত্র অবলম্বন থেকে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে পাট ও পশ্চিম পাকিস্তানে কাঁচা তুলা উৎপাদন যাতে বন্ধ হয়ে না যায় প্রধানত সে-কারণেই ১৯৪৭-এর পরে ভারতের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চলে। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান তার উৎপাদিত কাঁচা তুলার শতকরা ৮০/৯০ ভাগ ভারতে রপ্তানি করেছে। ভারতবিভক্তির পরে কাঁচা পাট ও তুলার নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করার সচেতন প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৪৮ সাল নাগাদ উৎপন্ন কাঁচা পাটের ৪৮ শতাংশ অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়, কিন্তু কাঁচা পাটের ১৮ শতাংশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের তুলা ফসলের ৪৩ শতাংশ তখনও ভারতেই রপ্তানি হত।

১৯৪৯ সালে টাকার অবমূল্যায়নে ভারতের সঙ্গে যোগ দিতে পাকিস্তানের অস্বীকৃতির পরিণাম হিসেবে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক রহিত হবার ফলে পাট উৎপাদনকারীরা বিপদের সম্মুখীন হয়।[৭৬] এই বিরোধের গুণাগুণ যা-ই থাকুক না কেন, এর ফলে সৃষ্ট দুর্ভোগের পুরো বোঝাটাই পড়ে পূর্ববাংলার পাটচাষীদের ঘাড়ে। পাটের বিক্রি ও মূল্য হ্রাস পাওয়ায় পাটচাষীদের আয় মারাত্মকভাবে কমে যায়। পাটের মূল্যের সূচক ১৯৪৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৪৯ সালের মার্চ এবং ১৯৫০-এর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১০০ থেকে ৭১-এ নেমে আসে।[৭৭] আরও অধিকতর পতন

---

৭৫. Akhlaqur Rahman, *Partition, Intergration, Economic*
৭৬. ঐ।
৭৭. ঐ।

থেকে রেহাই পাওয়া যায় আকস্মিকভাবে কোরীয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে। এতে পাটসহ সকল দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্য ও আয় অনেক বেড়ে যায়। পূর্ববাংলার রপ্তানি আয় ১৯৪৯–৫০ সালের ৬২ কোটি টাকা থেকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫০–৫১ সালে ১২১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।[৬৯] এ–ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা হল কয়াচিতে নির্ধারিত বাণিজ্যিক নীতি পূর্ববাংলার উৎপাদকদের জীবনকে কেমনভাবে প্রভাবিত করে তা দেখানোর জন্য।

ভারতে পাট রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষতি পোষানো সম্ভব হয় পাটের বিকল্প বাজার সৃষ্টি হওয়ায় এবং পূর্ববাংলা থেকে পাট আমদানি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়ার পরিণতি হয় আরও দীর্ঘস্থায়ী। পূর্ব ভারতে পাটের উৎপাদন ১৯৪৫–৪৬ সালের ১ কোটি ৫৭ লক্ষ গাঁট থেকে বেড়ে ১৯৫১–৫২ সালে ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ গাঁট এবং ১৯৫৮–৫৯ সালে ৫ কোটি ২০ লক্ষ গাঁটে উন্নীত হয়।[৭৯] পূর্ববাংলা থেকে ভারতে রপ্তানি ১৯৪৫–৪৬ সালে ৪০ লক্ষ গাঁট থেকে ১৯৫১–৫২ সালে ২৬ লক্ষ গাঁটে এবং ১৯৫৮–৫৯ সালে ২ লক্ষ গাঁটে নেমে আসে।

বিনিময়হার নীতি

বাঙালিদের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক নীতির পার্থক্যমূলক চরিত্রের কুফল আমদানি ও বিনিময়হার নীতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব দ্বারা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৫২ সালে কোরীয় যুদ্ধকালীন রমরমা অবস্থার অবসান ঘটার পর পাকিস্তান আমদানিতে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এটা পাকিস্তানের পরবর্তী ইতিহাসে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত টাকার অতিরিক্ত মূল্যায়নকে টিকিয়ে রাখে। এর দরুন বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক রেশনিং এবং উচ্চহারে আমাদনি শুল্ক প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়। ১৯৫০–এর দশকে ১৯৫৫ সালের অবমূল্যায়নের সময় পর্যন্ত টাকার মূল্য ১০০% অতিরিক্ত ছিল।[৮০] ১৯৫৮ সালের পরে এই অতিরিক্ত মূল্যায়ন কিছু কমানো হলেও তা ১৯৬০–এর দশকেও শতকরা ৭৪ থেকে ১০০–এর মধ্যে থেকে যায়।

পূর্ব পাকিস্তান দুভাবে এই বিশেষ নীতিব্যবস্থার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। টাকার এই অতিরিক্ত মূল্যায়নের অর্থ ছিল এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানি আমদানিকারকরা পাচ্ছিল ভর্তুকি, আর পাট উৎপাদনকারীরা পাচ্ছিল তাদের রপ্তানির জন্য কম দাম। একজন প্রখ্যাত বাঙালি অর্থনীতিবিদ হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ১৯৫৯–৬০–এর একটিমাত্র বছরে টাকার এই অতিরিক্ত মূল্যায়নের মাধ্যমে পাটচাষীদের আয় থেকে ৬.৪% গোপন কর আদায় করা হয়।[৮১] প্রথমদিকের ও শেষদিকের বছরগুলোতে টাকার আরও অতিরিক্ত মূল্যায়ন ঘটায় পাটচাষীদের আয়ের ওপর এই কর ১০% পর্যন্ত উঠে থাকতে পারে।

৭৮. ঐ।
৭৯. প্রাগুক্ত।
৮০. A. I. Islam, 'an estimation of the extent of the overvaluation of the domestic currency at the official exchange rate, *PDR*, Spring 1970.
৮১. A. R. Khan, *Economy of Bangladesh.*

পূর্ব পাকিস্তানের আমদানিকারকরা অনুরূপ কোনো সুবিধা পায়নি, যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্রের কঠোর আমদানিনীতির দ্বিতীয় পরিণাম ছিল বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি আমদানিকারকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। ১৯৫২ সাল থেকে পাকিস্তানের আমদানি–বাজারে অবাধ নীতির অতি সামান্যই বাজায় ছিল। টাকার অতিরিক্ত মূল্যায়নভিত্তিক বিনিময়হার বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহের চাইতে চাহিদাবৃদ্ধি নিশ্চিত করে। একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা দ্বারা স্থির হয় কারা আমদানির সুযোগ পাবে এবং সেভাবেই বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করা হয়।[৮২] বৈদেশিক মুদ্রার এই নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা যে পক্ষপাতদুষ্ট ছিল তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এই সত্যের মাধ্যমে যে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১–এর মধ্যে পাকিস্তানের মোট আমদানির ৬৯ শতাংশ যায় পশ্চিম পাকিস্তানে।[৮৩]

আমদানিতে এই আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্বের অংশবিশেষ উদ্ভূত হয়েছে বাজারের গতিময়তা থেকে। একটি বৃহত্তর ও অধিকতর গতিময় অর্থনীতি ভোগ্য, মধ্যবর্তী ও মূলধন দ্রব্যাদির আমদানি–চাহিদা বৃদ্ধি করে। এর ফলে অধিকতর অনুকূলপ্রাপ্ত অঞ্চলের যে–বিকাশ ঘটে সেটা আমদানির চাহিদা আরও বাড়িয়ে দেয়। এমনি করে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে দ্রুততর উন্নয়ন ও শিল্পায়নের ফলে সেখানে আমদানির জন্য বৃহত্তর বাজার সৃষ্টি হয়। অবশ্য যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, অতিরিক্ত মূল্যায়নের কারণে পাকিস্তানের উভয় অংশের আমদানি–চাহিদাই অপূর্ণ ছিল। কঠোর আমদানি নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার অধীনে এক অঞ্চলের তুলনায় অপর অঞ্চলের আমদানি–চাহিদা অধিকতরভাবে মেটানো নীতিনির্ধারকদের বিবেচনার আওতায় থেকে যায়। পশ্চাৎপদ পূর্বাংশের উন্নয়ন দ্রুততর করার জন্য সম্পদপ্রদানের প্রয়োজন থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের আনুকূল্যে অনুরূপ পার্থক্যমূলক আমদানিনীতি অনুসৃত হলে তা এ–অঞ্চলে যে–সম্পদ আকর্ষিত হত সেটা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর আঞ্চলিক সমতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হত এবং উৎপাদন ও আয়ের বৈষম্য কমিয়ে আনত।

কার্যত আমদানি রেশনিং ভিন্নমুখী কাজ করে। ১৯৫০–এর দশকে বাণিজ্যিক আমদানির জন্য প্রদত্ত নগদ আমদানি লাইসেন্সসমূহের সিংহভাগ কীভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানিকারকদের হাতে চলে যায় তা আমরা লক্ষ করেছি। আমদানি রেশনিং–এর পদ্ধতিটা এসেছে আমদানির অধিকার কাদের রয়েছে সেটা স্থির করার ব্যবস্থা থেকে। সেটার ভিত্তি ছিল ১৯৫০–এর দশকের গোড়ার দিকের ও.জি.এল. নীতি, যেজন্য আমদানির বেশিরভাগ চলে গিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এ–ব্যবস্থার অধীনে পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে সৃষ্ট আদি বৈষম্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থায়ী হয়ে পড়ে।[৮৪] ১৯৫০–এর দশকের শুরুতে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পস্থাপনের জন্য যেসব আমদানি লাইসেন্স দেওয়া হয় সেগুলো পরবর্তীকালে শিল্পে কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রপাতি

৮২. P. Thomas, S. N. H. Naqvi, N. Chowdhury, *Basic Statistics Tables : Import Licensing in Pakistan*, 1953-64. Research Report No. 35, PIDE, 1965.
৮৩. Muhith, *Bangladesh.*
৮৪. Thomas, Naqvi and Chowdhury, *Basic Statistics.*

আমদানির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানকে আমদানি অধিকারের বৃহত্তর হিস্যাপ্রদানের ভিত্তিতে পরিণত হয়। পূর্ব পাকিস্তানকে ৯০% বাণিজ্যিক আমদানি লাইসেন্স দেওয়ার সচেতন নীতিগত সিদ্ধান্তগ্রহণ, পূর্ব পাকিস্তান থেকে নতুন আমদানিকারক গ্রহণ (বাঙালি) এবং কিছুকালের জন্য কেবল পূর্বাংশেই শিল্পস্থাপনের অনুমতিদান ব্যতিরেকে এ-ব্যবস্থার অধীনে আমদানির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান যে পশ্চিম পাকিস্তানের সমপর্যায়ে যেতে পারবে তার কোনো উপায়ই ছিল না। অনুরূপ হস্তক্ষেপমূলক ব্যবস্থা স্পষ্টতই রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হত না এবং পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানির সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে ব্যবধান বেড়ে চলার দরুন গুরুতর বাজার-সমস্যাও সৃষ্টি করত।

বিনিময়হার নীতিতে এই বিকৃতি এবং আমদানির অধিকার বরাদ্দে বিভেদাত্মক নীতির ফল আরও অবনতির দিকে যায় এ-কারণে যে, পূর্ব পাকিস্তানে বাণিজ্যিক ও শিল্পখাতে আমদানিকারক হিসেবে যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় মূলত অবাঙালিরাই উপকৃত হয়। সুতরাং এই বাণিজ্যিক ও বিনিময়হার নীতি কেবল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদবরাদ্দের ব্যাপারেই অবিচার করেনি, পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরে বাঙালি পাট উৎপাদনকারী ও অবাঙালি শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের মধ্যে বরাদ্দের ক্ষেত্রেও অবিচার করেছে।

বাণিজ্য-ঘাটতি পূরণে অর্থসংস্থান

বাজারের স্থান ও কার্যকারণ সম্পর্কের বর্ধিষ্ণু গতিময়তার যুক্তি কিছুটা বেশি সহনীয় হত যদি পূর্ব পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস না হত। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৯-৭০-এর মধ্যে পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয়ের ৫৫ শতাংশ অর্জন করে পূর্ব পাকিস্তান।[৮৫] তেইশ বছরের মধ্যে মাত্র ৬ বছর পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানি আয় পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে বেশি ছিল। এর মধ্যে ৩ বছর ছিল ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৫২-৫৩ পর্যন্ত। শেষ তিন বছরে অর্থাৎ ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত পশ্চিমাংশে বহু বছর ধরে উচ্চহারে শিল্প বিনিয়োগের সুফল পাওয়া যেতে থাকে রপ্তানির ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি ও রপ্তানিকাঠামোর অধিকতর বৈচিত্র্যের মাধ্যমে। ১৯৬৩-৬৪ ও ১৯৬৪-৬৫ বাদে ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে আমদানির চাইতে রপ্তানিতে একটানা উদ্বৃত্ত থাকে। শুধু শেষ তিন বছরে ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত আমদানি বৃদ্ধি ও রপ্তানিতে স্থবিরতার দরুন পূর্ব পাকিস্তানে বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাবে ঘাটতি দেখা যায়। তুলনায় পুরো ২৩ বছরের মধ্যে ১৯৫০-৫১ ছাড়া বাকি প্রত্যেকটি বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি বিদ্যমান ছিল। পশ্চিমের ২৩.২ বিলিয়ন টাকার ঘাটতির তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের মেটি উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫.৫ বিলিয়ন টাকা।[৮৬] আঞ্চলিক বাণিজ্যের হিসাবে উপরোক্ত অসমতা থেকেই এ-ধারণার সৃষ্টি হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের দ্রুততর শিল্পায়ন, শিল্পের বিকাশ ও বৈচিত্র্যসাধনের খরচ যোগানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ স্থানান্তরিত হয়েছে, বিশেষ করে ১৯৫০-এর দশকে।

৮৫. প্রাগুক্ত।

৮৬. Thomas, Naqvi and Chowdhury, *Basic Statistics*, Table 7, 8.

পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে আন্তঃঅঞ্চল বাণিজ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত ছিল স্থায়ী ব্যাপার। এই অসমতা পরবর্তী সময়ে এবং ১৯৬০-৭০ সাল নাগাদ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭.৫ বিলিয়ন টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানিরা দাবি করত যে, বৈদেশিক বাণিজ্যখাতে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তরের ক্ষতি আর্থশকভাবে পুষিয়ে দেওয়া হত দুই অংশের আন্তঃঅঞ্চল বাণিজ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত দ্বারা। বাঙালি অর্থনীতিবিদরা এ-যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, পূর্ব-পশ্চিম অংশের বাণিজ্য ও আন্তর্ভৌতিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্তসমূহ টাকার অতিরিক্ত মূল্যায়নের কারণে তুলনীয় নয়। তদুপরি, পাকিস্তানে পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন শিল্পের অনুপস্থিতিতে উন্নয়ন ও কাঠামোগত পরিবর্তন চালিয়ে যাবার প্রয়োজনে একমাত্র বৈদেশিক মুদ্রায় ওসব দ্রব্যাদি কিনতে হত বলে টাকার উদ্বৃত্তের সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার উদ্বৃত্তের তুলনা করা চলে না।

বৈদেশিক সাহায্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য

বৈদেশিক সাহায্য বিদেশ থেকে অর্থপ্রাপ্তির একটা বড় উৎস হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় পরিস্থিতি কিছুটা জটিল আকার ধারণ করে। ১৯৫০-এর দশকের শেষদিক থেকে পাকিস্তান তার উন্নয়ন-তৎপরতা অব্যাহত রাখার জন্য বৈদেশিক সাহায্যের ওপর ক্রমেই বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান ৭০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ঋণ ও মজুরি পায়।[৮৭] এর ৫.৬ বিলিয়ন ডলার আসে ঋণ হিসেবে এবং ১.৪ বিলিয়ন ডলার মজুরি হিসেবে।[৮৮] ঋণ তহবিলের ২ বিলিয়ন ডলার ছিল প্রজেক্ট সাহায্য, ০.৯ বিলিয়ন ডলার প্রজেক্টবহির্ভূত সাহায্য এবং ০.১৫ বিলিয়ন ডলার আসে মার্কিন পি.এল. ৪৮০-এর অধীনে খাদ্য ও পণ্যঋণ হিসেবে।[৮৯] মজুরি তহবিলের বেশিরভাগই খাদ্যসাহায্য। তবে তার মধ্যে কিছু প্রজেক্ট ও পণ্যসাহায্যও ছিল। ৫ নং সারণিতে এ-সাহায্য ও ঋণ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কীভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে তা দেখানো হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণে দেখা যায় যে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত পাকিস্তানকে প্রদত্ত ৭.৬ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্য থেকে পূর্ব পাকিস্তান পায় ২.০২ বিলিয়ন (২৬.৬%)। ১৯৪৭-৭০-এর মধ্যে প্রদত্ত তহবিলের প্রায় ৬.৪ বিলিয়ন ডলার কাজে লাগানো হয়। তা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে কাজে লাগানো হয় ১.৯ বিলিয়ন ডলার (৩০%)।

বিদেশী সাহায্য পাকিস্তানের উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে দেখা দেয়। ১৯৪৯ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে পাকিস্তানে উন্নয়নখাতে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯১.৯৪ বিলিয়ন টাকা। হিসাবে দেখা যায়, এর ৬১.৫৮ বিলিয়ন টাকা অর্থাৎ ৬৭ শতাংশই ছিল প্রদত্ত বৈদেশিক সাহায্য।[৯০] পশ্চিম পাকিস্তানের মোট ৬২ বিলিয়ন টাকা উন্নয়নব্যয়ের শতকরা ৬৮ ভাগই ছিল বৈদেশিক সাহায্য। পূর্ব পাকিস্তানের ৩০ বিলিয়ন টাকা উন্নয়নব্যয়ের ৬৪.৫% ছিল বৈদেশিক সাহায্য।

৮৭. প্রাগুক্ত।

৮৮. ঐ।

৮৯. ঐ।

৯০. সারণি ৪-এ উপস্থাপিত হিসাব থেকে প্রাপ্ত।

কাজেই এটা পরিষ্কার যে, উন্নয়নব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদত্ত বৈদেশিক সাহায্য ও তা ব্যয়ের সঙ্গে অতিমাত্রায় সম্পর্কিত ছিল। আমরা লক্ষ করেছি, পূর্ব পাকিস্তান ব্যয়িত বৈদেশিক সাহায্যের ৩০ শতাংশ এবং মোট উন্নয়নব্যয়েরও ৩০ শতাংশ লাভ করে। এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে বৈষম্যমূলকভাবে বৈদেশিক সাহায্যের অর্থপ্রদান ও ব্যয় দুই অঞ্চলের বিদ্যমান বৈষম্যকে প্রভাবিত করে। সুতরাং এটা মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে, বৈদেশিক সাহায্য হাতে পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য বাঙালিদের বঞ্চনাবোধকে আরও তীব্র করে তোলে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্যের ন্যায্য হিস্যা পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক আত্মসাতের প্রশ্নে উত্ত বিতর্কের জন্ম দেয়।

পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ-স্থানান্তর

পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক সাহায্যের অংশ পশ্চিম পাকিস্তানকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারটি সম্পদ-স্থানান্তরের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৫০-এর দশকে বাঙালিরা বিশ্বাস করত যে, তাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি পূরণ করা হচ্ছে। এই স্থানান্তরের দরুন পূর্ব পাকিস্তানের যে-ক্ষতি হয় সেটা পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য-ঘাটতি দ্বারা পূরণ হয়নি। যাহোক, এর সঙ্গে যদি আমরা পশ্চিম পাকিস্তানকে ছেড়ে-দেওয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য বৈদেশিক সাহায্যের অংশকে যোগ করি, তা হলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ-স্থানান্তরের অধিকতর ব্যাপক পরিমাণ পাওয়া যেতে পারে। এসব বিতর্কের অংশবিশেষের মধ্যে ধারণাগত বিভ্রান্তি ও হিসাবের গুরুতর সমস্যা দেখা যায়। চতুর্থ পরিকল্পনার প্যানেলভুক্ত বাঙালি অর্থনীতিবিদগণ অত্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে এটা স্পষ্ট করে দেন। ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৬৯-৭০-এর মধ্যে সকল বছরে পাকিস্তানি টাকার যে অতিরিক্ত মূল্যায়ন হয়েছে তার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অঙ্কে টাকার মূল্য নির্ধারণ করে তাঁরা আন্তঃঅঞ্চল ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেনের একটা কাছাকাছি হিসাব দাঁড় করাতে সক্ষম হন।

৬নং সারণিতে আমরা অর্থনীতিবিদ প্যানেলের তৈরি আঞ্চলিক ব্যালেন্স অভ পেমেন্টের মোটামুটি হিসাব তুলে ধরব। ১৯৬০-৬১ পর্যন্ত দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত থাকে এবং সেটা অধিক মূল্যের হিসাবে ৫.৪ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি দাঁড়ায় ২১ বিলিয়ন টাকা। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে উভয় অঞ্চলেরই ঘাটতি হয়, যদিও পশ্চিম পাকিস্তানে ঘাটতি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে ৩.৭ গুণ বেশি। উভয় অঞ্চলের ঘাটতি পূরণ হয় বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা। পশ্চিম পাকিস্তান এভাবে বৈদেশিক সাহায্যের বৃহত্তর হিস্যা লাভ করে। ১৯৬০-এর দশকে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য ও পেমেন্টের উদ্বৃত্ত এবং তৎসহ সকল বৈদেশিক সাহায্য আত্মসাৎ করে এবং এর জন্য আন্তঃঅঞ্চল রপ্তানির মাধ্যমে আংশিকভাবে মূল্য দিতে থাকে। ১৯৫০-এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানে উদ্বৃত্ত থাকার কারণে এখান থেকেই সম্পদ রপ্তানি হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান কোনো বৈদেশিক সাহায্য পায়নি। পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্ত হিস্যা পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক আত্মসাৎকরণের মাধ্যমেই পূর্ব থেকে পশ্চিমে সম্পদের স্থানান্তর ঘটে।

বৈদেশিক সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানের 'প্রাপ্য' হিস্যা ও প্রাপ্ত হিস্যার পার্থক্য থেকেই বৈদেশিক সাহায্যের কাজে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ-স্থানান্তরের হিসাব পাওয়া যায়।

৭ নং সারণিতে আমরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ-স্থানান্তরের একটা প্রাক্কলন পেশ করব। অঙ্কগুলো প্যানেলের বাঙালি অর্থনীতিবিদের তৈরি হিসাব থেকে নেওয়া। সারণিতে দেখা যাবে যে, ১৯৫০-এর দশকে দায় পরিশোধের উদ্বৃত্ত থাকার কারণে ও বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্য হিস্যা পশ্চিম পাকিস্তানকে দেওয়ার কারণে পূর্ব পাকিস্তান ৮.৯৬ বিলিয়ন টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তর করে। তবে ১৯৬০-এর দশকে দায় পরিশোধের হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের ঘাটতি ছিল। কিন্তু তবু পূর্ব পাকিস্তান তার বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্য হিস্যা থেকে ১২.২ বিলিয়ন টাকা ছেড়ে দেয়, যার ফলে স্থানান্তরের পরিমাণ ১৯৫০-এর দশকের তুলনায় বেশ কিছুটা কম থাকে। ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত বিশ বছরে পূর্ব পাকিস্তান মোট ১১.৮ বিলিয়ন টাকার সম্পদ স্থানান্তর করে, যা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে নিয়োজিত হয়। ওটা ছিল ঐ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট উন্নয়নব্যয়ের ১৯ শতাংশ। উক্ত ১১.৮ বিলিয়ন টাকা পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হলে এ-অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ৩৯ ভাগ বৃদ্ধি পেত।

সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে উচ্চতর অনুপাতে সম্পদ সমাবেশের ক্ষমতার কারণেই পশ্চিম পাকিস্তানে দ্রুততর গতিতে উন্নয়ন ঘটেছে এমন ধারণা গুরুতর ভ্রান্তিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের সঞ্চয় ও বৈদেশিক সাহায্যের হিস্যাই পশ্চিম পাকিস্তানকে তার সাধ্যের বাইরে উন্নয়নসাধনে সক্ষম করে তোলে। ১৯৬০-৬২ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের ০.৯%-এর তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে সঞ্চয়ের হার ছিল ৪.৩%।[১১]

পাকিস্তানের আপেক্ষিকভাবে অধিক পশ্চাৎপদ ও অধিক জনসংখ্যাঅধ্যুষিত অঞ্চলটি তার সম্পদসমূহ ও গোটা দেশের নামে আনীত তার বৈদেশিক সাহায্যের হিস্যা পাকিস্তানের অধিকতর উন্নত অংশের উন্নয়নের জন্য ছেড়ে দেয়—এটা সত্যি একটি নির্মম পরিহাস। ন্যায়পরায়ণতা ও গণতন্ত্র এর উলটোটাই দাবি করত। কাজেই সম্পদ-স্থানান্তরের বিষয়টি যে তিক্ত বিতর্কের প্রশ্নে পরিণত হয় এবং বাঙালিদের মধ্যে বঞ্চিত হবার চেতনাকে আর যে-কোনোকিছুর চাইতে বেশি বদ্ধমূল করে দেয় তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ফেডারেল ফিন্যান্সের সমস্যা

বাণিজ্যিক ও বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ তো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অসমতা স্থায়ীকরণের একটা প্রধান মাধ্যমরূপে বিদ্যমান ছিলই, তার পাশাপাশি ফেডারেল ফিন্যান্স ব্যবস্থা ছিল আর একটা সমান্তরাল মাধ্যম। ফেডারেল বাজেটে রাজস্ব

১১. Rehman Sobhan, 'Who pays for development', Forum, (Dhaka), February 28, 1970.

সংগৃহীত হয় উভয় অঞ্চলে রাজস্ব আদায় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্বৃত্ত থেকে। পরে এসব রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা প্রাদেশিক সরকারসমূহ দ্বারা দুই অঞ্চলের যে-কোনো অঞ্চলে ব্যয়িত হয়। একটি কারণ ছাড়া রাজস্বসংগ্রহের হিসাব নিরূপণে স্বাভাবিকভাবে কোনো সমস্যা ছিল না। সেই কারণটি হচ্ছে এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানে সদর দপ্তর, কিন্তু ব্যাবসা করে উভয় অঞ্চলে এমন বহু কোম্পানি তাদের রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়ে নিত তাদের সদর দপ্তরের মাধ্যমে। তদুপরি, জাহাজযোগে পশ্চিম পাকিস্তানের যেসব তৈরি ও আধা-তৈরি পণ্য প্রেরিত হত সেগুলোর কাস্টমস ও আবগারি কর অবশেষে পূর্ব পাকিস্তানি ভোক্তাদেরকেই দিতে হত। কেন্দ্র তা সংগ্রহ করত পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত আমদানিকারক ও প্রস্তুতকারীদের কাছ থেকে। হিসাবটা এমনভাবে করা হত যাতে পূর্বাংশে প্রকৃতপক্ষে সংগ্রহকৃত রাজস্ব আঞ্চলিক অ্যাকাউন্টে আসলে তখন জমা দেখানো হয়েছে তার ১০ ভাগ কম।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজস্বসংগ্রহের প্রকৃত প্রাক্কলনে পশ্চিম পাকিস্তানে সংগ্রহের উচ্চহার দেখা যায়। ১৯৬১ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানে রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে ২২%।[১২] ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, ঐ তিন বছরে পূর্ব পাকিস্তানে ২৫.৫% থেকে ২৯.৮% পর্যন্ত কেন্দ্রীয় রাজস্ব সংগৃহীত হয়।[১৩] কেন্দ্রীয় রাজস্ব সংগ্রহ উৎপাদন, বিক্রয় ও আয়ের ওপর কাস্টমস শুল্ক ও করভিত্তিক হওয়ায় এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এটা আমদানি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্থানের ব্যাপারে আঞ্চলিক বৈষম্যকে প্রতিফলিত করে। সুতরাং কেন্দ্রীয় রাজস্বভাণ্ডারে পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চতর অবদান থেকে উন্নয়ন-বৈষম্যের আরেকটি পরিমাপই শুধু পাওয়া যায়।

বৈষম্যের উৎসরূপে রাষ্ট্র

প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যখাতের মতো সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানে ঘাটতি ছিল বিরাট। ৪ নং সারণিতে সরকারি রাজস্বব্যয়ের পর্যালোচনা দ্বারা এটা তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বব্যয়ের পরিমাণ মাত্র ২৩%। তার মানে হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তান রাজস্বখাতে যা দিয়েছিল তার চাইতে সামান্য কম পেয়ে জমা-খরচের সমতার দিকে যাচ্ছিল। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে পাচ্ছিল একটু বেশি। কার্যত রাজস্বের হিসাবে এই উদ্বৃত্ত ও ঘাটতির মানে তেমন বেশি কিছু ছিল না, যেহেতু উন্নয়নের বৃহত্তর অংশের জন্য অর্থ যোগাত বৈদেশিক সাহায্য। যাই হোক, আমরা আগেই লক্ষ করেছি যে, পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চতর মাত্রায় রাজস্বব্যয় সেখানকার অধিবাসীদের জন্য চাকরির অধিকতর সুযোগ ও অর্থনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাবার কার্যকর চাহিদাসৃষ্টির মাধ্যমে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

১২. Rounaq Jahan. *Pakistan.*
১৩. Muhith. *Bangladesh.*

স্বাধীনতার পথ

এ-অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র আঞ্চলিক বৈষম্যসৃষ্টি ও তাকে স্থায়ী করার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। রাজস্ব ও উন্নয়নখাতে এর সরকারি ব্যয়বরাদ্দের নীতি, এর বৈদেশিক সরকারি ব্যয়বরাদ্দের নীতি, এর বৈদেশিক সাহায্যবরাদ্দের নীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা-বরাদ্দের নীতি সর্বদা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছে। বিনিময়হার ও আমদানিসংক্রান্ত নীতি-পদ্ধতি বেসরকারি খাতের জন্য একটা উৎসাহপ্রদায়ক কাঠামো সৃষ্টি করে, যা ছিল কৃষির চাইতে শিল্পের প্রতি এবং বাঙালিদের চাইতে অবাঙালিদের প্রতি বেশি অনুকূল। সুতরাং পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠন, কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেই আলোচনার ইতি টানা ঠিক হবে।

গণতন্ত্র ও বৈষম্য

রাষ্ট্রযন্ত্রের গঠন অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যসমূহ অপেক্ষাকৃত বেশি সহনীয় হত। পাকিস্তান রাষ্ট্র তার গোটা অস্তিত্বকালে দেশ-শাসনে বাঙালিদেরকে কার্যকর ভূমিকা পালন করা থেকে বঞ্চিত রাখে। পাকিস্তানের পুরো আমলব্যাপী প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল বংশবদ। ১৯৪৭ ও ১৯৭১-এর মধ্যে ব্যালটের মাধ্যমে কেন্দ্রে একবারও ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটেনি। কাজেই এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছা সঠিক হবে যে, পাকিস্তানের জন্মের পরবর্তী কয়েক বছর বাদে বাকি সময়ে কোনো কেন্দ্রীয় আইনসভা জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে গঠিত ছিল না।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগুরু। ভোটারসংখ্যার দিক থেকেও তাদের ছিল সংখ্যাধিক্য। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুপস্থিতি তাদের জন্য ছিল সবচেয়ে ক্ষতিকর। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণভার বাঙালিরা কেউ কোনো পর্যায়ে পায়নি। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে অর্ধের সময়ের জন্য বাঙালিরা প্রধানমন্ত্রীরূপে কাজ করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন সাক্ষীগোপাল এবং একজন একটি কোয়ালিশনের সংখ্যালঘু অংশীদাররূপে ক্ষমতাসীন। কিন্তু আইনসভার কোনো তোয়াক্কা না করে মাত্র ১৩ মাসের মধ্যে শেষোক্ত জনকে অপসারিত করা হয়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান দুজন সৈনিক প্রেসিডেন্ট যোগায়। তাঁরা কেন্দ্রে অবিসংবাদী ও সীমাহীন ক্ষমতা ভোগ করেন।

প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বলতার দরুন এবং জাতীয় আইনসভাসমূহের গুরুত্ব না থাকার কারণে পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র, সশস্ত্রবাহিনী এবং শেষদিকে ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীশ্রেণী কর্তৃক কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়। ঐ ব্যবসায়ীরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল। ফেডারেল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকার কেবল অন্তর্ভাগীয় রাজস্বের মূল উৎসগুলো এবং বৈদেশিক সাহায্য ও রপ্তানি আয়বরাদ্দের ক্ষমতাই হাতে রাখেনি, অর্থনীতিসংক্রান্ত সকল প্রধান নীতিনির্ধারক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে থাকে। ফলে প্রাদেশিক সরকারগুলো ছিল কেন্দ্রের সৃষ্ট পুতুল।

কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে আমলাতন্ত্র ও সশস্ত্রবাহিনীগুলোর কর্তৃত্বাধীন ছিল। এমন প্রতিষ্ঠানে, বিশেষত তাদের উচ্চতর স্তরে প্রাধান্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের।[৮]

নং সারণিতে কেন্দ্রের ক্ষমতাকাঠামোর গঠন কীরকম ছিল তার একটি চিত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতার উচ্চতর স্তরগুলো থেকে বাঙালিদের কোটার পরিমাণ বাদ দিয়ে রাখা হয়েছিল। তা ঐ সারণিতে কম করে দেখানো হয়েছে। পাকিস্তান ছিল মূলত অতি-কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাসম্পন্ন একটি অপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার। আইউব খান ও পরে ইয়াহিয়া খানের মতো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্ট থাকার মানে হচ্ছে বাঙালিদেরকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে রাখা। পাকিস্তানের ইতিহাসে কোনো বাঙালি অর্থমন্ত্রী হননি, কিংবা বৈদেশিক সাহায্যসংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা নিয়ন্ত্রণকারীর পদে কোনো বাঙালি কখনো নিযুক্ত হননি। ১৯৭১ সালে পরিকল্পনা কমিশন বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সে-অবধি কোনো বাঙালি পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হননি। কোনো বাঙালি কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি হননি। শুধু ১৯৬৯ সালে একজন বাঙালি প্রথমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৭০ পর্যন্ত কোনো বাঙালি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হননি। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে কোনো বাঙালি যুগ্মসচিবের পদ পর্যন্ত উঠতে পারেননি। আর সশস্ত্রবাহিনীগুলো তো ছিল কমবেশি পশ্চিম পাকিস্তানিদেরই একচেটিয়া।

কাজেই একথা বলা মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, ১৯৬৯ পর্যন্ত বাঙালিদেরকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের উচ্চতর এবং এমনকি মাঝারি পদ থেকে, সিদ্ধান্তগ্রহণের কেন্দ্রগুলো থেকে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক নীতিসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কেন্দ্রগুলো থেকে দূরে রাখা হয়েছিল।

প্রাদেশিক সরকারকে বুঁটো জগন্নাথ করে রাখা

১৯৫০-এর দশকে কেন্দ্রের প্রাথমিক কুকর্ম-অকর্মগুলো পূর্ববাংলার প্রথম মুসলিম লীগ সরকার নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতো প্রত্যক্ষ করে। এজন্যেই আন্তঃআঞ্চলিক বৈষম্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। ঐ প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিত্বমূলক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার দরুন তার কেন্দ্রকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। ১৯৫৪-৫৮ সালে যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ শাসনের কালে কেন্দ্রের কাছ থেকে সম্পদ দাবি ও প্রদেশের ক্ষমতারক্ষার কিছু প্রচেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু ১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকে প্রাদেশিক সরকারগুলোর অধীন প্রাদেশিক আমলাতন্ত্রের উঁচু পদগুলোতে বসে ছিল অবাঙালিরা। সংস্কৃতি ও চাকরিসূত্রে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এই অবাঙালি অফিসাররা কেন্দ্রের মোকাবিলায় তাঁদের বাঙালি মন্ত্রীদেরকে খুব কমই সমর্থন দিতেন। আওয়ামী লীগ সরকার আমলাতন্ত্রের বাইরে গিয়ে প্রবীণ বাঙালি অর্থনীতিবিদদের নিয়ে একটা পরিকল্পনা বোর্ড গঠনের প্রয়াস নেয়। কিন্তু তাঁদের এসব প্রচেষ্টা প্রাদেশিক প্রশাসনকে অবাঙালি আমলাদের কবলমুক্ত করতে অথবা কেন্দ্রের সঙ্গে তাদের আমলাতান্ত্রিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে সফল হয়নি। ফলে প্ল্যানিং বোর্ড প্রাদেশিক প্রশাসনের মধ্যেকার একটি নতুন কর্তৃত্বের উৎসরূপে কাজ করতে না পেরে কেন্দ্রের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বৈঠকে বাঙালিদের দাবিদাওয়া নিয়ে ওকালতির একটি সংস্থায় পরিণত হয়।

১৯৬০-এর দিকে বাঙালিরা প্রাদেশিক সচিবের পদ লাভ করতে শুরু করার পর কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পদবরাদ্দসংক্রান্ত বিতর্কে বাঙালিদের দাবি-উত্থাপনের অধিকতর সচেতন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, সামরিক আইন প্রবর্তন এবং জাতীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি প্রধান নির্বাহীর কুক্ষিগত হবার পর কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয় স্তরে বাঙালি মন্ত্রী ও প্রাদেশিক গভর্নরদের চাকরি প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা বা খেয়ালখুশির অধীন হয়ে পড়েছিল। তাঁদের প্রতিনিধিত্বমূলক মর্যাদা কিংবা রাজনৈতিক সমর্থন না থাকায় অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকশ্রেণীর প্রাধান্যের বলয়ে আমলাদেরকে এমন একটা অবস্থার মধ্যে কাজ চালাতে হয়, যেখানে বাঙালি মন্ত্রীরা কেন্দ্রের সঙ্গে যে-কোনো মোকাবিলার সময় আসলেই তাঁদেরকে রক্ষা করতে পারতেন না। প্রাদেশিক প্রশাসনের ক্ষমতাহীন ও সম্পদহীন প্রকৃতির দরুন অনুরূপ ওকালতির সুযোগ এমনিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রদেশে ও কেন্দ্রে কর্মরত বাঙালি আমলারা এভাবে প্রায় ক্ষেত্রেই গোপন তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করতে পেরেছেন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষ সমর্থনকারী অর্থনীতিবিদদের পরামর্শদাতায় পরিণত হয়েছেন।

ব্যবসাখাতে বাঙালিদের কোণঠাসা অবস্থা

পাকিস্তানের ইতিহাসের গোটা সময়টায় বাঙালিরা অনুভব করে যে, তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রধান উৎস, যথা প্রেসিডেন্ট পদ, আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর প্রধান প্রধান পদ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। সতিই তাদেরকে এসব পদের বাইরে রাখা হয়েছিল। জাতীয় ক্ষমতা-কাঠামোর মধ্যে জাঁদরেল অবাঙালি ব্যবসায়ীদের উত্থানও বাঙালিদেরকে জোর দিয়ে কথা বলার কোনো সুযোগ দেয়নি। যে-৪৩টি পরিবার পাকিস্তানি অর্থনীতির ওপর প্রভুত্ব করত তাদের মধ্যে একজন মাত্র বাঙালি ছিলেন এ. কে. খান।[১৪] ১৯৫৯-এর এক জরিপে দেখা গেছে যে, পাকিস্তানের সকল শিল্প-পরিসম্পদের মাত্র ২.৫ ভাগ ছিল বাঙালি মুসলমানদের হাতে।[১৫] সে-পর্যায়ে সেসব বাঙালি হিন্দু পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাবসা করত তাদের হাতে ছিল পরিসম্পদের শতকরা ৮.৫ ভাগ। এতে বাঙালি মালিকানাধীন পরিসম্পৎ দাঁড়ায় ১১%। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে হিন্দু মালিকানাধীন এসব পরিসম্পৎ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল এবং তাদের কাজকারবারগুলো অবাঙালি মুসলিমরা দখল করে নিচ্ছিল। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর সকল 'হিন্দু' পরিসম্পৎ (মাড়োয়ারিদের ২.৫%-এর যা-কিছু অবশিষ্ট ছিল সেসবসহ) ১৯৬৭ সালের শত্রু-সম্পত্তি অর্ডিন্যান্সের বলে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়। এতে কার্যত বাঙালিদের হাতে থাকে শিল্প-পরিসম্পদের শতকরা ৫ ভাগেরও কম। এভাবে বাঙালিদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সকল ধাপের বাইরে রাখার কাজটি পুরোপুরি সম্পন্ন হয়। ক্লীব ও প্রতিনিধিত্বহীন রাষ্ট্রীয় আইনসভায় বাঙালিদের ৫০ শতাংশ আসন ছিল বটে, কিন্তু তাদের মন্ত্রীরা একজন পশ্চিম পাকিস্তানি প্রেসিডেন্টের খেয়ালখুশির অধীন থাকায় বাঙালিরা বরাবর পাকিস্তানের ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে অবস্থান করে।

১৪. L. J. White, *Industrial Concentration and Economic Power in Pakistan* (Princeton, USA 1974).

১৫. G. Papanek, Pakistan's Development.

বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জীবনে বাঙালি জনগণকে সুস্পষ্টভাবে বঞ্চিত করার ফলে বাঙালিরা জাতীয় ক্ষমতা থেকে তাদেরকে বাইরে রাখার ব্যাপারটিকে আঞ্চলিক বৈষম্যের সঙ্গে এবং একটি শক্তিশালী কেন্দ্র কর্তৃক একচেটিয়া ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করে। একটি অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছিল জাতীয় ক্ষমতার হিস্যা লাভকল্পে বাঙালিদের দ্বারা পরিচালিত সংগ্রামেরই অংশ। কিন্তু ১৯৫৮ সালে মার্শাল ল প্রবর্তনের ফলে ১৯৫৯ সালের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বানচাল হওয়া, ১৯৬২ সালে প্রদেশগুলোকে কোনো ক্ষমতা না দিয়ে প্রধান নির্বাহী ও কেন্দ্রের হাতে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন এবং প্রত্যক্ষ ভোটের অধিকারহরণ বাঙালিদের মনে দৃঢ় বিশ্বাসের জন্ম দেয় যে, তারা জাতীয় ক্ষমতার হিস্যা কখনো পাবে না। ১৯৬৩ সালে আওয়ামী লীগ নেতা এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দির মৃত্যু সেই একমাত্র ব্যক্তিটিকে দৃশ্যপট থেকে অপসারিত করে, যাঁর একটি জাতীয় নির্বাচকমণ্ডলী ছিল এবং যিনি জাতীয় ক্ষমতা পেতে চেয়েছিলেন। আওয়ামী লীগে তাঁর, বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমানের মতো উত্তরাধিকারীদের বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে, বাঙালিরা কোনোদিন জাতীয় ক্ষমতা পাবে না এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে কখনো ন্যায়বিচার পাবে না। এরকম ধারণার যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে এটা ১৯৬০-এর দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদীয়মান নেতাদেরকে প্রভাবিত করে। এরকম একটা ধারণা বা বোধ থেকেই লক্ষ করা যায় যে, ১৯৬৫ সালের সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে বিরোধীপক্ষ আইউব খানকে আসনচ্যুত করতে ব্যর্থ হবার পরে আওয়ামী লীগ এবং বেশিরভাগ অন্যদল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়োগ করে।

আইউব সরকারের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় আন্দোলন শুরু করার উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী নেতৃবৃন্দের এক গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ একটি ছয় দফা-সংবলিত স্বায়ত্তশাসন কর্মসূচি পেশ করে। পাকিস্তানের জনগণের উদ্দেশে ঘোষিত ছয় দফা দেখিয়ে দেয় যে, বাঙালি নেতৃত্ব আইউবের অপসারণের মাধ্যমে জাতীয় ক্ষমতা দখলের চাইতে পাকিস্তানি শাসন থেকে বাঙালিদের মুক্তি ও তাদের জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ব্যাপারেই অধিকতর আগ্রহী।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার দাবির মধ্যে বাঙালি মুসলিমদের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি নিহিত ছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার যে দাবি তুলেছিলেন এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দি ও আবুল হাশিম,[১৬] তাও বাঙালি মুসলিমদের সেই দাবিরই পুনরুক্তি। লাহোর প্রস্তাবের পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ এবং সোহরাওয়ার্দি-আবুল হাশিমের 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা' এই উভয় উদ্যোগের পিছনে এ-ধারণাই কাজ করেছিল যে, বাঙালিরা কখনো কেন্দ্রীয় ক্ষমতার হিস্যা পাবে না, কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারে একমাত্র স্বায়ত্তশাসন-লাভের মাধ্যমে।

১৬. Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*.

ছয় দফার উৎপত্তি হয় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ১৯তম দফা থেকে। এতে বলা হয়েছিল ঃ

> ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা এবং কেবল প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়সমূহ ও মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে রেখে আর সকল বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের বৈধ কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসা হবে। এমনকি প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও এমন ব্যবস্থা করা হবে যাতে সামরিকবাহিনীর সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে এবং নৌবাহিনীর সদর দপ্তর থাকে পূর্ব পাকিস্তানে। প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং বর্তমান আনসারবাহিনীকে পুরাদস্তুর মিলিশিয়াতে পরিবর্তিত করা হবে।

পরবর্তী ১২ বছরে ১৯৫৪ সালে উত্থাপিত স্বায়ত্তশাসনের এ-দাবিটি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এবং বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে সমগ্র পাকিস্তানের জনগণকে গণতন্ত্র থেকে বঞ্চিত রাখার দরুন ১৯৬৬ সালে এ-দাবিটি আরও তীব্র ও চূড়ান্ত আকারে পুনরুজ্জীবিত হয়।

ছয় দফার ২য় দফায় ২১ দফার মতোই প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়টি কেন্দ্রের এখতিয়ারে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মুদ্রাব্যবস্থার ওপর কেন্দ্রের এখতিয়ারকে সীমাবদ্ধ করা হয়। তৃতীয় দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুটো বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয় ঃ

> পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটো পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে। এ-ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে না, থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। অথবা, দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এ-ব্যবস্থায় মুদ্রা থাকবে কেন্দ্রের হাতে। কিন্তু শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এ-বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং দুই অঞ্চলে দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকেব।

বিগত এক যুগে কেন্দ্রনির্ধারিত মুদ্রানীতির অভিজ্ঞতা থেকেই এ-দাবিটি তোলা হয়েছিল। ছয় দফা কর্মসূচিতে মুদ্রানীতিকে আঞ্চলিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে চাওয়া হয়েছিল অঞ্চলের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক তৎপরতাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে। তৃতীয় দফায় ধরে নেওয়া হয় যে, মুদ্রানীতির ওপর আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম হলে এ-অঞ্চলে ব্যাবসারত অবাঙালি ব্যবসায়ীরা তাদের পুঞ্জীভূত উদ্বৃত্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্থানান্তরিত করতে পারবে না, অর্থাৎ এ-অঞ্চল থেকে পুঁজি-পাচার নিয়ন্ত্রিত হবে। মুদ্রার অবাধ বা সহজ বিনিময়যোগ্যতা গ্রহণ ও পুঁজির আন্তঃঅঞ্চল চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের কথাসহ এ-দফাটি কিছুটা পরস্পরবিরোধী। বাণিজ্যিক নীতির পরিবর্তে মুদ্রানীতির মাধ্যমে সম্পদ-স্থানান্তর নিরোধের এ-ধারণাটি ছিল কিছুটা ভ্রান্তিপূর্ণ, যেহেতু এতে ধরে নেওয়া হয় যে সম্পদ-স্থানান্তরের উপায় বাণিজ্যিক চ্যানেল নয়, মুদ্রাব্যবস্থা।

ছয় দফার চতুর্থ দফা দাবি করে ঃ

> সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে ফেডারেশনভুক্ত আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে-ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আপনা হতেই আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হয়ে যাবে। রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের ওপর এ-মর্মে বাধ্যতামূলক

> বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকবে। এ-ব্যবস্থা দ্বারা খাজনা-ট্যাক্স-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতাকে বাংলাদেশে সম্পদসৃষ্টির উপায়রূপে এবং উন্নয়নকে উৎসাহিত করার নীতিগত হাতিয়াররূপে কাজে লাগাতে চাওয়া হয়েছিল। এতে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করা হয়েছিল রাজস্বের একটা তোলা বা লেভিব্যবস্থার মাধ্যমে। শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকবে যে আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত খাজনা-ট্যাক্স থেকে ফেডারেল সরকারের লেভি বা টাকা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হারে রিজার্ভ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হয়ে যায়।

ছয় দফার এ-দফাটিই কয়েকটি কারণে অত্যধিক উদ্বেগ সৃষ্টি করে এবং বলা হয় যে, এটাই নাকি ছয় দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ভণ্ডুল করার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে কৃতসংকল্প করে তোলে। কার্যত এ-দফাটি প্রথমদিকে স্বায়ত্তশাসিত পূর্ব পাকিস্তানের জন্যই বেশি অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারত। দেশজ রাজস্ব থেকে স্বীয় উন্নয়নের তহবিল যোগানোর দায় নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে এ-অঞ্চলের মধ্যে কার্যত আদায়কৃত জাতীয় রাজস্বের ৩০ শতাংশের ওপর নির্ভর করতে হত। উন্নয়নের নিজ স্তর এবং দুর্বল করভিত্তিক কারণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দায় গ্রহণ করার জন্য মোটা অঙ্কের রাজস্ব-উদ্বৃত্ত গড়ে তুলতে বাংলাদেশের অনেক সময় লেগে যেত। এমনকি প্রদেশগুলো থেকে কেন্দ্রের জন্য দেয় লেভিকে আঞ্চলিক জি. ডি.পি.-এর আকারের ভিত্তিতে আনুপাতিক করা হলেও পশ্চিম পাকিস্তান তার প্রতিরক্ষা স্থাপনাগুলোকে চালিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় সব রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারত। অদ্ভুত শোনালেও সত্য এই যে, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা হাতে রেখেই একটি শক্তিশালী কেন্দ্র প্রতিরক্ষা বাজেটকে খর্ব করে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় রাজস্ব পুনর্বণ্টন করতে পারত। সেক্ষেত্রে বার্ষিক বাজেট হয়ে দাঁড়াত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি, কেন্দ্রীয় মঞ্জুরির জন্য প্রদেশসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দাবি এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধু-করাচির মতো অপেক্ষাকৃত ধনী প্রদেশগুলোর নিজেদের অঞ্চলে সংগৃহীত রাজস্বের বৃহত্তর অংশ নিজেদের অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য রেখে দেওয়ার দাবির মধ্যে অবিরত দড়ি-টানাটানির খেলা। আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় বাজেটের একটি লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে সম্পদ-হস্তান্তর করা। এই হস্তান্তর প্রশ্নে ছয় দফা দাবির চার সংখ্যক দাবিটি ছিল পাঞ্জাব ও সিন্ধুর জন্য এবং সেনাবাহিনীর জন্য সবচেয়ে বাস্তবমুখি প্রস্তাব। সেনাবাহিনীর জন্য চতুর্থ দফা স্বার্থহানিকর ছিল না এজন্য যে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সংগৃহীত সেনাবাহিনীর রাজস্ব বাজেট ছিল সমাজতান্ত্রিকভাবে গ্যারান্টিযুক্ত।

পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের বিষয়ে ৫ নম্বর দফাটিই ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এতে বলা হয় ঃ

> ফেডারেশনভুক্ত ইউনিটসমূহে স্ব স্ব সরকারের অধীনে প্রত্যেক ইউনিটের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকতে হবে।
>
> ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা ফেডারেশনভুক্ত ইউনিটদ্বয় থেকে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হার অনুযায়ী আদায় হবে।

৫ম দফার এ-অংশটি আপত্তিকর ছিল না। ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানে রপ্তানি আয় যখন পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে অনেক বেশি ছিল তখন এটা বৈপ্লবিক হতে পারত। কিন্তু ১৯৬৭-৬৮ সাল নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানের আয় কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল

এবং তাদের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যের দরুন এ-ব্যবধান তাদের অনুকূলে প্রসারিত হত। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রপ্তানিদ্রব্য ও পাটজাত দ্রব্যাদি, যা থেকে তার বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রায় ৯০% আসত, তা একটি বিশ্বব্যাপী ক্ষয়িষ্ণু শিল্পে পরিণত হচ্ছিল। ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ এই শেষ তিন বছরে বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাবে প্রথমবারের মতো পূর্ব পাকিস্তানের ঘাটতি হতে শুরু করে। কাজেই পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত আয় গ্রাস করার কোনো সুযোগ ছিল না।

পঞ্চম দফার যে-প্রস্তাবটি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে হজম করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাতে বলা হয় ঃ

> শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী দেশের বৈদেশিক নীতির সাহায্যকাঠামোর মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য সাহায্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের ও আমদানি-রপ্তানি করার ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে।

এ-প্রস্তাব পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতিদেরকে গুরুতর ঝুঁকির সম্মুখীন করে। ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের আমদানির ৪৫ শতাংশ তারা সরবরাহ করে এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাদের রপ্তানির পরিমাণ ছিল তাদের মোট রপ্তানির ৪৮ শতাংশ।

পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার ও নিজের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের অধিকার থাকার মানে হল সর্বাধিক প্রতিযোগিতামূলক উৎসগুলো থেকে তার আমদানির অধিকার থাকা। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বেশি ভয় করছিল এ-কারণে যে, সেরকম হলে পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে সেরকম বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হলে পশ্চিম পাকিস্তানি রপ্তানিকারকরা অধিকতর প্রতিযোগী হত কি না সেটা একটা তর্কের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে তা পূর্ব পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য-ঘাটতি ও বৈদেশিক মুদ্রার অভাব টাকার অতিরিক্ত মূল্যায়ন বাতিল করে নির্ধারিত বিনিময়হার নীতির সহায়তায় দেশীয় টাকায় কাঁচা তুলা, তৈলবীজ, চাউল ইত্যাদি পশ্চিম পাকিস্তানি দ্রব্যের কিছু চাহিদা বজায় রাখত।

সুতরাং, পূর্ব পাকিস্তানকে বৈদেশিক সাহায্যের জন্য বিদেশের সঙ্গে আলোচনার অধিকারদানসংক্রান্ত প্রশ্নটিই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে অনুমান ছিল এই যে, (ক) বাঙালি আলোচকরা কেন্দ্রের কাছ থেকে পূর্ব পাকিস্তান বৈদেশিক সাহায্যের যেটুকু পায় তার চাইতে অনেক বেশি আনতে পারবেন, এবং (খ) বিদেশ থেকে আলোচনার মাধ্যমে আনীত সেই সাহায্য কাজে লাগানোর অধিকার থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্যের হিস্যা পশ্চিম পাকিস্তান হস্তগত করতে পারবে না। পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্যের হিস্যা হারানোর ব্যাপারটা যদি পশ্চিম পাকিস্তানি সাহায্যসংক্রান্ত আলোচকরা তাঁদের উচ্চতর আলোচনার দক্ষতা দ্বারা সামলাতে না পারতেন, তা হলে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য উন্নয়নব্যয় অনেক বেশি পড়ে যেত। চতুর্থ পরিকল্পনার প্যানেলভুক্ত পশ্চিম পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদরা এবং ১৯৬৯-৭০-এর কান্ট্রি মেমোরেন্ডামে বিশ্বব্যাংক উপরোক্ত বক্তব্যই তুলে ধরে। উভয়ে যুক্তি দেখায় যে, স্বীয় পুঁজি ও মধ্যবর্তী পণ্যাদি আমদানির অর্থ যোগানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্যের কিছু-কিছু অংশ আরও কয়েকবছর আত্মসাৎ করা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য প্রয়োজন। ১৯৭০ সাল অবধি আন্তঃআঞ্চলিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক এরকম ঔপনিবেশিক

ও অদূরদর্শী মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত ছিল যে, স্বায়ত্তশাসন পেলে পূর্ব পাকিস্তান তার বৈদেশিক সাহায্যের অংশ ছাড়বে না এবং অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক উৎসগুলো থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনবে। এ-সম্ভাবনাই পশ্চিম পাকিস্তানিদেরকে ছয় দফা দাবির বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতিবাদে মুখর করে তোলে। উক্ত সম্ভাবনা এবং প্রতিরক্ষা বাজেট সম্পর্কে সশস্ত্রবাহিনীগুলোর ভয়কে ঘিরেই হয়তো বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি পাকিস্তানি শাসকশ্রেণীর কাছে অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা

১৯৬৯ ও ১৯৭১ সালের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে ছয় দফা কর্মসূচির তাৎপর্য বোঝাতে এবং দাবির উপর তাদের অবস্থানের দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা করতে বাঙালি অর্থনীতিবিদরা তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। এই পারস্পরিক ক্রিয়াটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ফলে নেতৃবৃন্দ বুঝতে সক্ষম হন যে, ছয় দফা কার্যোপযোগী এবং এ-কর্মসূচির ওপর ভিত্তি করে একটা সংবিধান রচনা করা যেতে পারে। কিছু অজ্ঞাত কারণে ছয় দফা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনায় বসা এবং তাদের সুনির্দিষ্ট আপত্তিগুলো তুলে ধরার বিন্দুমাত্র আগ্রহ পশ্চিম পাকিস্তানি কোনো নেতাই দেখাননি। না ইয়াহিয়া খান ও তাঁর উপদেষ্টারা, না ভুট্টো ও তাঁর সহযোগীরা। ১৯৭১-এর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে ইয়াহিয়া ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) সঙ্গে আওয়ামী লীগের বৈঠক সাধারণ বিষয়ে মতামত-বিনিময় ও বাগ্মিতা প্রদর্শনে সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাতে অর্থবহ কিছুই হয়নি। পিপিপি কিংবা ইয়াহিয়া ছয় দফার সমালোচনায় কোনো বাস্তব যুক্তি তুলে ধরেননি।

ছয় দফার ওপর বাস্তব আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় একমাত্র ১৯৭১ সালের সেই সঙ্কটময় দিনগুলোতে, যখন ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ ও কামাল হোসেনের সঙ্গে ক্ষমতা-হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনার জন্য জাস্টিস কর্নেলিয়াস ও কেন্দ্রীয় সরকারের লিগ্যাল ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান কর্নেল হাসানসহ এম. এম. আহমদকে নিয়ে আসেন। আওয়ামী লীগের আলোচকদের সহায়তা করে বাঙালি অর্থনীতিবিদদের একটি দল। অর্থনীতিবিদরা বৈঠকে উত্থাপিত সকল অর্থনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে আওয়ামী লীগের আলোচকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। পাকিস্তানের অর্থনীতির এককালের ক্ষমতাবান 'মুগল' এম. এম. আহমদ ছয় দফার মূল অর্থনৈতিক দফাগুলো মেনে নেন। প্রকৃতপক্ষে উভয় আলোচক দল ১৯৭১ সালের ২২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা-হস্তান্তরের সাংবিধানিক পদ্ধতি সম্পর্কে একটা ঐকমত্যে উপনীত হন।

তবে ঐ সময়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করা হবে রক্ত আর গুলিগোলা দিয়ে, রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নয়। কিন্তু ২৩ মার্চ নাগাদ শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের ভূখণ্ডে স্বায়ত্তশাসন কায়েম করে ফেলেন। ১৯৭১ সালের মার্চে নির্বাচিত বাঙালি নেতারা সমসাময়িক ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ শাসন করছিলেন। তাঁদের আদেশ-নির্দেশ আমলাতন্ত্রের সকল অংশ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও

ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মেনে নিয়েছিল, কিন্তু অবাঙালি ব্যবসায়ীরা ছিল আনুগত্য প্রদর্শনে অত্যন্ত নারাজ।

১৯৭১ সালের ১ মার্চের মধ্যেই প্রজন্মের পর প্রজন্মের রাজনৈতিক সংগ্রাম যা অর্জন করতে পারেনি সেটা অর্জিত হয়ে গিয়েছিল ১৯৭০-এর শেষে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনের জন্য পরিচালিত প্রচার অভিযানে, দুই বছরের রাজনৈতিক আন্দোলন-সমাবেশের মধ্য দিয়ে। নির্বাচনী অভিযান হয়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধাতুকে পিটিয়ে গঠন করার কামারশালা। ১৯৭১ সালের মার্চের স্ব-শাসন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইস্পাতকে কাঠিন্যপ্রদানের নেহাই।

সারণি ২ : মূল ভোগ্যবস্তু ও ভোগ্যব্যয়ের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রবণতা

	পণ্য	মাথাপিছু পরিমাপের ইউনিট	১৯৫১/৫২		১৯৫৯/৬০		১৯৬৩/৬৪	
			পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম
১.	খাদ্যশস্য	প্রতি আউন্স, পি.ডি.	১৪.৯	১৫.৭	১৬.৫	১৫.২	১৬.৮	১৭.৪
২.	চিনি	প্রতি আউন্স, পি. এম.	২৪.৫	৪৩.৭	২১.২	৭৫.৭	১০.২	৩৮.৪
৩.	চা	প্রতি আউন্স, পি.এম.	০.১৩	০.৬	০.১৩	১.৩	০.১৬	১.১২
৪.	দিয়াশলাই	না.পি.ওয়াই	৭.০	১০.০	১৩.০	১৬.০		
৫.	কাপড়	গজ পি. এ.	১.৭	১.৪	৩.০	৯.০		
৬.	সিগারেট	না. প্রতি পি.এ.	৫.০	৭৬.০৯	৩৩.০	১৮০.০		
৭.	কেরোসিন	গ্যালন পি.এ.	০.৫	০.৫	০.৬	০.৯		
৮.	কাগজ	পাউন্ড পি.এ.	০.২	০.৫	০.৩	১.৪		
						১৯৬১		
					০.৭	১.৭	২.১	৮.৬
৯.	দুধ-মাখন	পাউন্ড পি.এম.			০.১	০.৭	০.৪	১.৭
১০.	গরু-খাসির মাংস ও মাছ	পাউন্ড পি.এম.		১৯৬০		১৯৬৩/৬৪		১৯৬৬/৬৭
			১২১.৯	১৪৩.৮	১২৩.২	১৭০.২	১৫১.৫	২১১.৪
১১.	গৃহস্থালি, টাকার মাসিক ভোগ্য ব্যয়		১২১.৯	১৪৩.৮	১২৩.২	১৭০.২	১৫১.৫	২১১.৪
১২.	বৈষম্য% সূচক পশ্চিম-পূর্ব (*১০০) পূর্ব		২৬.৬		৩৩.৮		৪০.০০	

সূত্র : (১-৭) ১৯৫১-৫২ এবং ১৯৫৯-৬০-এর জন্য এম. ইউ. খান, বাকিগুলো : পাকিস্তান *স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ারবুক, ১৯৬৮।*

১৯৬৭ সালের মার্চ থেকে১৯৭১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর রাজনৈতিক সমর্থকরা এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র দলসমূহ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বাণীকে বাংলাদেশের প্রতিটি গৃহে পৌঁছে দেন। এ-বাণীর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রশ্ন এবং সমাপ্তিতে নিজেদের সমস্যা সমাধানে বাঙালিদেরকে ক্ষমতাদানের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন-সমাবেশের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ১৯৭১ সালের মার্চে স্ব-শাসনের প্রশ্নটি জোরদার হয়ে উঠেছিল। নির্বাচন স্ব-শাসনের জন্য রাজনৈতিক ম্যান্ডেট প্রদান করে এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগকে সাড়ে ৭ কোটি বাঙালির স্ব-শাসনলাভের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য অবিসংবাদী ক্ষমতা দান করে।

১৯৭১-এর মার্চে মুজিব আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করে কার্যত বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক নীতির দিকনির্দেশনা ও সম্পদসমূহের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ ও আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের মধ্যকার আলোচনায় দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত প্রধান পাকিস্তানি আলোচক এম. এম. আহমদ বাংলাদেশের অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা প্রশ্নে যে নতুন বাস্তবতার উদ্ভব ঘটেছে তা মেনে নিয়েছেন। ছয় দফার অর্থনৈতিক দফাগুলোকে আইনগত স্বীকৃতিদানের জন্য প্রস্তাবিত সাংবিধানিক সংশোধনীগুলো তিনি গ্রহণ করে নেন।

সারণি ৩ : সামাজিক ও বাহ্য অবকাঠামোর ক্ষেত্রে বৈষম্য

	বিষয়	পরিমাপের ইউনিট	১৯৫১/৫২		১৯৫৯/৬০		১৯৬৭/৬৮	
			পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম
১.	বিদ্যুৎ	কিলোওয়াট পি.এ.	০.৫	৮.৬	১.৬	২৮.৮	৩৭৮ মেগাওয়াট (১৯৬৯-এর ডিসেম্বরে মোট জেনারেটিং ক্যাপাসিটি)	১৫৫৯ মেগাওয়াট
২.	রেলওয়ের রুট মাইলেজ	মাইল	১৬৮২	৫০৩৬	১৭১৪	৫০২৭	১৭১২	৫০০৪
৩.	রোড মাইলেজ	মাইল	৪০৫	১৭১৫২	১০৪০	১১৬৮৪	২৪৮৮	২২৫০৮
৪.	মোটরগাড়ির সংখ্যা		৮৮৪৮	৭০৫১০	১৪৪১০	১০৯২২৮	৫৬২৮৫	২৫৯০১৫
৫.	প্রদত্ত রেডিও লাইসেন্স		-	-	৩৭৭১০	২৯০৬০৭	৩৫৮২৪১	৭০৮২১৫
৬.	হাসপাতাল বেড				৪৯৭০	২২১০০	৬৯৬৪ (১৯৬৬)	২৬২০০ (১৯৬৬)
৭.	ডাক্তার		-	-	৫৫১২	৬১০২	৮৮১০০ (১৯৬৯)	১০১০০০ (১৯৬৯)
৮.	প্রাইমারি স্কুল				১৯৪৭/৪৮	১৯৫৯/৬০	১৯৬৬/৬৭	
৯.	প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রভর্তি (মিলিয়ন হিসাবে)		২৯৬০০ ২.০২	৮৪১০ ০.৪৪	২৬৫১০ ৩.১৮	১৭৯০১ ১.৫৫	২৮২২৫ ৪.০১	৩৩২৭১ ২.৭৪
১০.	প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক							
১১.	মাধ্যমিক স্কুল		৭৫৬২৪	১৭৮২০	৭৮৪৬২	৪৪৮৪৮	৯১২৫৬	৭৫৬৯৭
১২.	মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রসংখ্যা (মিলিয়ন হিসাবে)		৩৪৮১ ০.৫২৬	২৫৯৮ ০.৫০৮	৩০৫৩ ০.৪০০	৩০৪০ ০.৯১২	৪০৯০ ১.০৫৭	৪৫৬০ ১.৫২৯
১৩.	মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা		১৪৩৬২	১৮৮৪৮	২০৫৭১	৩১০৫৫	৩৮২৮০	৪৬২২৮
১৪.	বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি		১৬২০	৬৫৪	৩৯৭০	৫০৬৪	৯৯৬৪	১৪৪২৫

উৎস : (বিদ্যুৎ ১৯৫১-৫২ ও ১৯৫৯-৬০ : এস. ইউ. খান, *পাকিস্তান ইকনমিক সার্ভে*, ১৯৬৯-৭০ (৬ ও ৭)। হাসপাতাল বেড, ডক্টর জাহান, সারণি ১৬, বাকি সব কলাম : পাকিস্তান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ারবুক, ১৯৬৮।

সারণি ৪ : পাকিস্তানে আঞ্চলিক ব্যয়, ১৯৫০/৫১—১৯৬০/৭০
(১০ লাখ টাকার হিসাবে)

	পূর্ব পাকিস্তান					পশ্চিম পাকিস্তান				
	রাজস্ব	মোট	উন্নয়ন সরকারি	বেস-রকারি	মোট সরকারি (১+৩)	রাজস্ব	রাজস্ব মোট	সরকারি	উন্নয়ন বেসরকারি	মোট সরকারি (৬+৮)
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯৫০/৫১ ১৯৫৪/৫৫	১৭১০	১০০০	৭০০	৩০০	২৪১০	৭২০০	৪০০০	২০০০	২০০০	৯২০০
১৯৫৫/৫৬ ১৯৫৯/৬০	২৫৪০	২৭০০	১৯৭০	৭০০	৪৫১০	৮৯৮০	৭৫৭০	৪৬৪০	২৯০০	১৩৬২০
১৯৬০/৬১ ১৯৬৪/৬৫	৪০৪০	৯৭০০	৬৯০০	৩০০০	১১০৪০	১২৮৪০	২০৭১০	১০০১০	১০৭০০	২২৮৫০
১৯৬৫/৬৬ ১৯৬৯/৭০	৬৬৮০	১৬৫৬০	১১০৬০	৫৫০০	১৭৭৪০	২২২০০	৩৫৬০০	১৯৬০০	১৬০০০	৪১৮০০
সর্বমোট	১৪৯৭০	২১৯৬০	২০৪৩০	৯৫০০	৩৫৫০০	৫১২৫০	৬১১৮০	৩০৬০০	৩১৬০০	৮১৬০০
সর্বমোট ব্যয়ে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা (%)	২৩	৩৩	৪০	২৩	৩৩					

উৎস : চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থনীতিবিদ প্যানেলের রিপোর্ট : সারণি ২ (পৃ: ৬)

বাঙালিদের এই স্ব-শাসনলাভের দাবিকে পাকিস্তান রাষ্ট্র স্বীকার করে নিতে পারল না কেন? অধিকতর সুনির্দিষ্ট গবেষণা ছাড়া এর জবাব দিতে গেলে তা বড়জোর কল্পনানির্ভর এবং সেকারণেই বিতর্কমূলক হবে। লেখক অন্যত্র বিষদভাবে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন[১৭] যে, সবচেয়ে বড় কারণ ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরিত্র পরিবর্তন। ১৯৬৯ ও ১৯৭১ সালে যা ছিল মূলত ঐতিহ্যগতভাবে শহরাঞ্চলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্বেগপ্রভাবিত আন্দোলন, সেটাই এই বিরাট গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এই প্রবণতা প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৬৮-৬৯-এর শীতকালের আইউববিরোধী বিদ্রোহের মাধ্যমে। সে-সময় শহরাঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণী রাজপথে ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আইউবশাহিবিরোধী গণআন্দোলনে একটি নয়া শ্রেণীসচেতন জঙ্গিপনার সৃষ্টি করে। কিন্তু স্ব-শাসনের দাবিকে গ্রাম-গ্রামান্তরে নিয়ে যান এবং বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারকে বঞ্চনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ ১৯৬৯-৭১-এর নির্বাচনী অভিযানের মধ্য দিয়ে। এই বঞ্চনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাঙালিদের স্ব-শাসনপ্রদানে অস্বীকৃতি, যার ফলে বাঙালি জনসাধারণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের চালিকাশক্তিতে এবং ছয় দফা দাবির চূড়ান্ত জিম্মাদারে পরিণত হয়। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিপুলভাবে ভোট দিয়ে তারা জাতীয়তাবাদের পক্ষে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ব্যক্ত করে এবং পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এখন তাদের ম্যান্ডেট দ্বারা আবদ্ধ।

১৭. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *Public Enterprise*.

সারণি ৫ : প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের আঞ্চলিক বণ্টন ১৯৪৮/৪৯—১৯৬৮/৬৯

	বিষয়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	মোট
(ক)	সর্বোচ্চ মূল্যে টাকায় রূপান্তরিত ডলার সাহায্যের ব্যয় (বিলিয়ন টাকার হিসাবে)			
১.	১৯৪৮/৪৯—১৯৬০/৬১	৪.৮৪	১০.৭৭	১৫.৬১
	%	৩১.০	৬৯.০	১০০
২.	১৯৬১/৬২—১৯৬৮/৬৯	১৪.৪৯	৩১.৪৮	৪৫.৯৭
	%	৩১.৫	৬৮.৫	১০০
৩.	মোট	১৯.৩৩	৪২.২৫	৬১.৫৮
	%	৩১.৪	৬৮.৬	১০০
(খ)	ডলারের সাহায্যব্যয় (মিলিয়ন ডলারের হিসাবে)	১৯৪১	কেন্দ্র ৩৯২ ৪১০৬	৬৪৩৯
	%	৩০.১	৬৯.৯	১০০
(গ)	মার্কিন ডলারে (১০ লক্ষ ডলার) প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্য			
১.	১৯৪৭—৬০	৫৪২	১৫১৬	২০৫৮
	%	২৬.৩	৭৩.৭	১০০
২.	১৯৬০—৭০	১৪৮২	৪১০০	৫৫৮২
	%	২৬.৪	৭৩.৫	১০০
৩.	মোট	২০২৪	৫৬১৬	৭৬৪০
	%	২৬.৪	৭৩.৪	১০০
(ঘ)	ডলারে ব্যয়িত সাহায্যের গঠন (১০ লক্ষ ডলারের হিসাবে)			
১.	কারিগরি সহায়তাসহ প্রজেক্ট সাহায্য	৮২৫ (২৫.২)	২১২৭	৩২৭১
	%	৪২.৩	৫১.৮	৫০.৮
২.	প্রজেক্ট-বহির্ভূত ও পণ্য সাহায্য	৬৭১ (৩৪.৮)	১২৪৮	১৯২৭
	%	৩৪.৬	৩০.৪	২৯.৯
৩.	খাদ্যসাহায্য	৪৪৫ ((৩৫.৯)	৭১১	১২৪১
	%	২২.৯	১৯.৩	১৯.৩
৪.	মোট	১৯৪১	৪১০৬	৬৪৩৯

উৎস : (ক) অর্থনীতিবিদদের প্যানেল (পূর্ব পাকিস্তান)
(খ), (গ), (ঘ) (মুহিত ১৯৭৮)।

সারণি ৬ : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যালেন্স অভ পেমেন্ট (১৯৪৮/৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯)

(১০ লক্ষ টাকা)

সময়	মূল্য	পূর্ব	পশ্চিম
১৯৪৮/৪৯ থেকে ১৯৬০/৬১	সাধারণ মূল্য	+ ৫৯২	-৮১১৬
	উচ্চমূল্য	+৫৩৬৮	-২০৯৮৯
১৯৬১/৬২ থেকে ১৯৬৮/৬৯	সাধারণ মূল্য	-৬৫২৬	-১৮১৮০
	উচ্চমূল্য	-৯৩৮৬	-৩৪০৭৫
মোট ১৯৪৮/৪৯ থেকে ১৯৬৮/৬৯	সাধারণ মূল্য	৫৯৩৪	-২৬৩৯৬
	উচ্চমূল্য	-৪০১৮	-৫৫০৬৪

উৎস : নতুন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্তনীতিবিদদের প্যানেলের *রিপোর্ট*। সারণি ১-ক, খ, গ, পৃ. ৭৬-৭৮।

সারণি ৭ : পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তর (১৯৪৮/৪৯—১৯৬৮/৬৯)

(১০ লক্ষ টাকার হিসাবে)

	বিষয়	১৯৪৮/৪৯ থেকে ১৯৬০/৬১	১৯৬১/৬২ থেকে ১৯৬৮-৬৯	১৯৪৮/৪৯ থেকে ১০৬৮-৬৯
১.	পূর্ব পাকিস্তানে কার্যত ব্যয়িত বৈদেশিক সাহায্য	৪৮৪০	১৪৪৯০	১৯৩৩০
২.	জনসংখ্যার অনুপাতে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য হিস্যা	৪৪৩০	২৬৭১০	৩৫১৪০
৩.	পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে বৈদেশিক সাহায্য স্থানান্তর (২-১)	+৩৫৯০	+১২২২০	+১৫৮১০
৪.	পূর্ব পাকিস্তানের ব্যালেন্স অভ পেমেন্ট	+৫৩৭০	-৯৩৯০	-৪০২০
৫.	পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদ স্থানান্তর (৩+৪)	+৪৯৬০	+২৮৩০	+১১৭৯০

উৎস : চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থনৈতিক প্যানেলের *রিপোর্ট*, সারণি ১, পৃ. [illegible]।

সারণি ৮ : পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্রের আঞ্চলিক উৎপত্তিস্থল—শতকরা কতজন বাঙালি

বিষয়		সেনাবাহিনী	বিমানবাহিনী	নৌবাহিনী
১.	সামরিক সংস্থাপনা (১৯৬৩)			
	(ক) কমিশন্ড অফিসার	৫	১৭	১
	(খ) জুনিয়ার কমিশন্ড অফিসার	৭.৪		
	(গ) ওয়ারেন্ট অফিসার		১৩.২	
	(ঘ) অন্যান্য র‍্যাঙ্ক	৭.৪	২৮.০	৫
	(ঙ) শাখা অফিসার			১০.৪
	(চ) চীফ পেটি অফিসার			১৭.৩
	(ছ) পেটি অফিসার			২৮.৮
	(জ) লীডিং সীম্যান ও তার নিচে		পূর্ব	পশ্চিম
২.	আমলাতান্ত্রিক সংস্থাপনা (১৯৬৬)		১৭০	৬৩১
	কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটে প্রথম শ্রেণীর অফিসার			২৭১
	পশ্চিম-পূর্ব বৈষম্য $\left(\frac{WP-EP}{EP} \times ১০০\right)$			
৩.	ব্যবসায়ী শিল্পপতি (১৯৫৯)			১১% স্থির পরিসম্পৎ-এর শতকরা হিসাবে। বাঙালি মুসলিম ও বাঙালি হিন্দু মিলিয়ে

উৎস : (১ ও ২) জাহান ১৯৭১
(৩) পাপানেক, ১৯৬৭।

ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে লাখ লাখ মানুষের সামনে শেখ মুজিব কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথগ্রহণের অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল ছয় দফা ম্যান্ডেটের প্রতি প্রকাশ্য অঙ্গীকার ঘোষণা করা। সেই একই জনতা ১৯৭১ সালের মার্চে শহর ও গ্রামাঞ্চলে স্ব-শাসনকে টিকিয়ে রেখেছিল এবং ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পরবর্তীকালে নিজেদের জীবন দিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সশস্ত্র আগ্রাসনের মোকবিলা করেছিল। এই একই জনতা বাংলাদেশকে বিদেশী দখলমুক্ত করার দাবিতে মুক্তিযুদ্ধে লড়েছিল ও প্রাণ দিয়েছিল।

জনগণকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনা না হলে পাকিস্তান রাষ্ট্র বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণীগুলোর ক্ষুধা মিটিয়ে তাদেরকে সম্ভবত মানিয়ে রাখতে সক্ষম হত। ১৯৬০-এর দশকে এবং বেশি করে ১৯৬৯-এর মার্চের পরে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির, একটি বাঙালি বুর্জোয়াশ্রেণী গড়ে তোলার, পাবলিক ওয়ার্কস প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রামের ধনী কৃষকদের দিকে সম্পদ প্রবাহিত করার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পদগুলোতে বাঙালি সিভিল সার্ভেন্টদেরকে উন্নীত করার একটি প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়া হয়তো পূর্ণ অংশীদারিত্ব পর্যন্ত পৌঁছাত না, কিংবা ছয় দফার স্বায়ত্তশাসন দাবি মেনে নেওয়া পর্যন্ত এগুত না, তবে এটা বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণীগুলোর জন্য সুযোগের নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারত। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রণী বাহিনী মধ্যবিত্তকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে স্ব-শাসনের সংগ্রামকে বানচাল করার এই সম্ভাবনাটি শেখ মুজিবুর রহমানের নজরে পড়েছিল। তিনি যে আন্দোলনকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া ও জনগণকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের রক্ষক ও অভিভাবকে পরিণত করার সচেতন সিদ্ধান্ত নেন তার উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনের মধ্যবিত্ত নেতৃত্বকে বিভক্ত করে আন্দোলন থেকে সরিয়ে নেওয়ার ঐ সম্ভাবনাটিকে আগে থেকেই নস্যাৎ করে দেওয়া।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হবার পর পাকিস্তান রাষ্ট্র বুঝতে পারে যে, এই নেতৃত্বকে কিনে ফেলা যাবে না। হয় স্ব-শাসনের বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে, যেমন তারা নিয়েছিল ১৯৭১-এর মার্চে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনাকালে, নতুবা বাঙালি জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বকে ধ্বংস করে দিতে হবে। তারা আন্দোলনের গণভিত্তি বুঝতে পারেনি এবং ১৯৬৯-৭১ সালের একটানা বিক্ষোভ-সমাবেশের ফলে জনগণের সচেতনতা কী পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল তাও উপলব্ধি করতে পারেনি। এটাই মনে হয় তাদের ভ্রান্ত হিসাবের খতিয়ান। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্তগ্রহণের মাধ্যমে তারা পাকিস্তান রাষ্ট্রকেই ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র যে তার রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের দাবিগুলোকে জায়গা করে দিতে পারেনি তার চূড়ান্ত স্বীকৃতি হল বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা অভিযান।

মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ : এ. টি. এম. শামসুদ্দিন

অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্ব-শাসনে

দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য : এ-রচনা দুটি আমি একাত্তরের মার্চ মাসে লিখেছিলাম। সে-বছরেরই ১ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সে-অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি রাখার প্রস্তাব করলে যে-নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, রচনা দুটিতে তা-ই তুলে ধরা হয়েছে।

ইয়াহিয়ার ঢাকা সফর ও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার পর লারকানায় ভুট্টো-ইয়াহিয়া আলোচনাশেষে মধ্য-ফেব্রুয়ারিতেই জুলফিকার আলি ভুট্টো জাতীয় পরিষদ বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তখন এরকম একটা ধারণা ও আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে, ভুট্টোর এসব কার্যকলাপের উদ্দেশ্যটা ছিল একটা রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করা এবং তার মাধ্যমে সামরিক আইনের শাসনকে আরও প্রলম্বিত করে ছয় দফা দাবিতে ছাড় দিতে বঙ্গবন্ধুর ওপর চাপ সৃষ্টি করা। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য যেসব সংসদ সদস্য জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, ভুট্টো তাঁদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ব্যবস্থা নেবারও হুমকি দিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই, বিশেষত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্তানের সংসদ সদস্যগণ, ছয় দফার ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষে ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছিল। বঙ্গবন্ধুর প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্য ছিল ইয়াহিয়া ও ভুট্টোকে এটাই প্রমাণ করে দেখানো যে বাংলাদেশের জনগণ এসব চাপপ্রয়োগের কৌশলকে ভয় করে না—ছয় দফার সমর্থনে তারা বঙ্গবন্ধুর পেছনে সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করার যে-কোনো প্রচেষ্টাই তাই সারাদেশে এক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। সেই অনন্যসাধারণ কালপর্বে বাংলাদেশে সংঘটিত নাটকীয় ঘটনাবলি ও জনসাধারণের ক্রমপরিবর্তনশীল মেজাজ-মানসিকতাই এ-রচনা দুটিতে স্থান পেয়েছে।

স্বাধীনতার প্রস্তুতিপর্বে

জনাব ভুট্টোর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর থেকেই একটা গোলযোগের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। বিমানবন্দরের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলোতে সপ্তাহখানেক আগেই বিমানবিধ্বংসী কামানসমূহের আনাগোনা দেখে জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ভাবছিল, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। এরকম একটা খবর শোনা গিয়েছিল যে প্রাক্তন গভর্নর আহসান সাহেব শেষ মুহূর্তে তাঁর পিন্ডি সফর বাতিল করেছেন। কিন্তু জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটল যখন পরদিনই তিনি গভর্নরদের সম্মেলনে যোগ দিতে পিন্ডি চলে গেলেন। এর পেছনের কারণটা ছিল পিন্ডিতে জনাব ভুট্টো ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এক জরুরি আলোচনা-বৈঠক। পরিণতিতে তড়িঘড়ি করে মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হয়।

সামরিক আইন প্রশাসক ও গভর্নরদের সম্মেলনের পর লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়াকুব, গভর্নর আহসান ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল পীরজাদা প্রথমে ভুট্টোর সঙ্গে এবং তার পরে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে বিমানযোগে করাচি চলে গেলেন। এঁদের তিনজনের করাচি অবস্থানকালেই টেলিগ্রাম মারফত খবর পাওয়া গেল এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিব ভুট্টোর রাজনৈতিক চাল-ভঙ্গির ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আবারও স্থগিত করে ৩ মার্চের পরে নিয়ে গেলে যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে তার গুরুত্ব সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন। ভুট্টোর নাটুকেপনা সম্পর্কে শেখ মুজিব দীর্ঘদিন ধরে যে একটা সংযমের নীতি পালন করে আসছিলেন, তাঁর বিবৃতি থেকে মনে হল সংযমের সে-বাঁধটি ভেঙে গেছে। ভুট্টোর আপসহীন মনোভাবই জাতীয় পরিষদ স্থগিত করার ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, এই চিন্তাই সম্ভবত এই বিবৃতিদানে তাঁকে উৎসাহ যুগিয়ে থাকতে পারে।

শেখ মুজিবের এই বিবৃতির পরই মনে হয় প্রেসিডেন্টের ঐ তিন দূত পিন্ডি ফিরে গেলেন ইয়াহিয়ার সঙ্গে আরও শলাপরামর্শ করার জন্য। পরে আহসান ও ইয়াকুব ঢাকায় ফিরে এলেন। পীরজাদারও আসবার কথা ছিল। এমনকি কজন সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য বিমানবন্দরেও গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আসেননি।

মনে হয় ঢাকায় গভর্নর আহসান শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ ও চরম সাক্ষাৎকারকালে তাঁকে জাতীয় পরিষদ মুলতবি হবার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। মুজিব তাঁকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ-ধরনের কোনো চালের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। এদিকে, আওয়ামী লীগের এম. এন. এ.-গণ ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে পার্টির সংবিধানের খসড়া নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করছিলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও বিমানে ঢাকায় আসার পথে করাচিতে গেলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং এমনকি উপজাতীয় এলাকাসমূহের এম. এল. এ.-গণও সবাই জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের লক্ষ্যে ঢাকার পথে ছিলেন—সর্বদিক বিবেচনার পর অধিবেশনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল ৩ মার্চ। ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি জরুরি বৈদ্যুতিক জেনারেটর এনে বসানো হল প্রেসিডেন্ট ভবনের লাগোয়া জমিতে—যার অর্থ হল, প্রেসিডেন্ট এসে পড়লেন বলে।

করাচি থেকে আগত যাত্রীরা জানালেন, বিকেলের প্লেনেই ঢাকায় আসার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার টিকেট বুক করা ছিল। করাচি বিমানবন্দরে সর্বপ্রকার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। এরকম একজন মহামান্য সফরসঙ্গী থাকলে যেমনটা নিয়ম—অন্য যাত্রীরা সেইমতোই দুঘণ্টা আগে বিমানবন্দরে রিপোর্ট করেছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট তাঁর এই ফ্লাইটটি ধরলেন না। আর তাঁকে বাদ দিয়েই বিমানটি উড়ে এসে নামল এক অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে—গোটা বাংলাদেশ জুড়ে যা ছড়িয়ে পড়ছিল দাবানলের মতো।

পহেলা মার্চ বেলা ১টা ৫ মিনিটে রেডিও মারফত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার একটি বিবৃতি প্রচার করা হল, এবং অতীতের সকল নজির উলটে দিয়ে সেটি পাঠ করে শোনালেন রেডিও পাকিস্তানের একজন ঘোষক। অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদ মুলতবির ঘোষণা শোনার আধা ঘণ্টা পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং ঢাকা শহরের সকল এলাকা থেকে তারা হোটেল পূর্বাণী-অভিমুখে জড়ো হতে থাকল। হোটেলটিতে তখন আওয়ামী লীগের এম. এন. এ.-দের একটা অধিবেশন চলছিল। জনতার অনেকেরই হাতে বাঁশের লাঠি, লোহার রড, আর হকিস্টিক। ঢাকা স্টেডিয়ামে তখন একটা একঘেয়ে ক্রিকেট ম্যাচের শেষ পর্যায়ের খেলা চলছিল। খেলা ছেড়ে দর্শকরাও যোগ দিল বিক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে। রেডিওতে খবরটি প্রচারের পরপরই খেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় এবং লোকজন যার যার শ্রেণীচরিত্র অনুযায়ী ঘরমুখো ছুটে পালাল, আবার অনেকেই লাঠিসোঁটা জোগাড় করে পূর্বাণী-অভিমুখে ছুটে চলল।

ক্রুদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠের চেহারার উচ্চপদস্থ সহকর্মীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত শেখ মুজিব বেলা আড়াইটায় তাড়াহুড়ো করে এক সংবাদ সম্মেলন ডেকে ঘোষণা করলেন, মুলতবির ঘোষণাকে বিনা চ্যালেঞ্জে পার পেতে দেওয়া হবে না। তিনি দুইদিনের হরতাল ডাকলেন—২ তারিখে ঢাকায় এবং ৩ তারিখে সমগ্র বাংলাদেশে।

পূর্বাণী থেকে জনতা এসে জমায়েত হল পল্টন ময়দানে। সেখানে জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন তোফায়েল আহমদ ও জাতীয় শ্রমিক লীগের আবদুল মান্নান। গোটা ময়দানেই পরিলক্ষিত হল একটা জঙ্গি মনোভাব। জনতার দাবি উঠল, আমরা 'অ্যাকশন' চাই। কিছু একটা করতে চাই।

মার্চের ২ তারিখে তারা তা পেয়েও গেল।

হরতাল হয়েছিল সর্বাত্মক। ঢাকার কোথাও একটা সাইকেল পর্যন্ত চলতে পারেনি। নিরাপত্তা বাহিনীর চলাচল বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে সবকটি প্রধান সড়কে ব্যারিকেড দেওয়া হয়। আর প্রথম সংঘর্ষটি বাধে তার ফলেই। তেজগাঁয়ে সেকেন্ড ক্যাপিটালের প্রবেশপথে মঙ্গলবার সকালের মধ্যেই বসানো হয় তমংকর সব ব্যারিকেড। এগুলোর পাহারায় নিয়োজিত থাকে মারমুখো মানুষের দল। তেজগাঁ থানার পুলিশদের ঐসব ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলার হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু জনতার জঙ্গি ভাব দেখে তারা দৌড়ে গিয়ে থানায় আশ্রয় নেয় এবং তাদের ওপরওয়ালাদের কাকুতিমিনতি সত্ত্বেও রাস্তায় বেরোতে অস্বীকৃতি জানায়।

কিছুক্ষণ পর বিমানবন্দরের দিক থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর একটি ছোট দল এসে হাজির হয়। তারা যখন ব্যারিকেড সরাবার চেষ্টা করতে থাকে তখন জনতা তাদের

উদ্দেশে নানারকম স্লোগান দিতে থাকে। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন 'অ্যাকশনে' অবস্থা গ্রহণ করে। ঐ সময় সেকেন্ড ক্যাপিটাল থেকে একটা জীপে করে নিরাপত্তা বাহিনীর আরও একটা দল এসে হাজির হয়।

জনতার মুখোমুখি পড়ে যাওয়াতে এই বাহিনীটি হঠাৎ গোলাগুলি শুরু করে দেয়। হিসেবে দুজন নিহত ও পাঁচজনের আহত হবার কথা বলা হয়, কিন্তু এই সংখ্যা কতটা সঠিক তা প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই।

তখন থেকেই এই এলাকাটি এক 'ট্রাবল স্পট'-এ পরিণত হয়, এবং রাত ৮টায় কারফিউ জারি করা হলে সেরাতেই আবারও সেখানে গোলাগুলি হয়।

শহরের অন্যান্য এলাকা থেকেও সংঘর্ষের খবর পাওয়া যেতে থাকে। জিন্নাহ অ্যাভিনিউতে গুণ্ডা-বদমাশরা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অবাঙালি মালিকানাধীন বলে পরিচিত দোকানপাট থেকে লুটতরাজের চেষ্টা চালায়। এরকম একটি ঘটনায় রাজ্জাক নামক স্থানীয় একটি শার্টের দোকান লুট হলে আওয়ামী লীগের নগরপ্রধান স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে সেখানে ছুটে যান এবং মালামালসহ কয়েকজন লুটেরাকে ধরে ফেলেন এবং তাদেরকে লুট-করা দ্রব্যাদি ফেরত দিতে বাধ্য করেন ; এরপর তাদেরকে আচ্ছা করে পিটুনি দেওয়া হয়। নওয়াবপুরেও স্থানীয় গুণ্ডারা এ-ধরনের লুটপাট চালায়। ওখানে কয়েকটা সাম্প্রদায়িক (বাঙালি-বিহারি) সংঘর্ষও হয়—অবশ্য তা সীমাবদ্ধ ছিল স্থানীয় গুণ্ডাদের মধ্যেই।

সারা দিনভর উত্তেজনা ও বিবাদ-সংঘর্ষ বাড়তে থাকে। রাস্তায়-রাস্তায় ব্যারিকেড, মুহুর্মুহু স্লোগান আর থেকে-থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শহরটাকে একটা যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য অংশেও ছোটবড় শহরগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অচল হয়ে পড়েছিল। পিআইএ কর্মচারীদের এক ধর্মঘটের ফলে পূর্ব পাকিস্তান পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকেও কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ফলে রাত ৮টা থেকে বলবৎ-হওয়া কারফিউ আরও বেশি সংঘর্ষের সুযোগ করে দেয়। রাত ৯টার মধ্যেই ঢাকার বহু এলাকার লোক রাস্তায় নেমে পড়েছে বলে খবর পাওয়া যায়। শহরের বহু এলাকাতেই রাতভর গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যায়। পরের দিনের হিসেবে জানা যায় যে কেবল মেডিক্যাল কলেজেই মৃতের সংখ্যা ৩৫ আর আহতের সংখ্যা ১১৩, অন্যান্য হতাহতদের মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, নয়তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে রেখে দেওয়া হয়।

৩ মার্চ বুধবার আবহাওয়া আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জনতার ঢল নামে রাস্তায়, ঢাকার রাজপথে আরও ব্যারিকেড দেওয়া হয়, গোটা পূর্ব পাকিস্তান অচল হয়ে পড়ে। ঢাকায় খবর ছড়িয়ে পড়ে যে পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ-আহূত এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান সেদিনই ভাষণ দেবেন। বেলা ৩টার মধ্যেই জনতার জোয়ারে পল্টন উপচে পড়ে। অধিকাংশই ছিল লাঠিসোঁটা প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত—তারা নবকেও ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত, কেবল একটি আহ্বানের অপেক্ষা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রসমাজ, শিল্প এলাকার শ্রমিকশ্রেণী আর রাস্তা ও বস্তি এলাকার সর্বহারাদের এ ছিল এক অভূতপূর্ব সম্মিলন। এর মেজাজটা ছিল বিপ্লবের। সচরাচর এ-ধরনের সভার যে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীসুলভ আরামপ্রদ পরিবেষ্টনী থাকে, এখানে তা নিশ্চিহ্ন। এই জনতা ছিল একেবারে স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত—যাদের দাবি, 'কিছু একটা করতে হবে'।

প্রথমদিকে বক্তৃতা দিলেন ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক লীগের মান্নান, ওঁরা। তাঁরা সর্বক্ষণ তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে এমন সোচ্চার ছিলেন যাতে করে ৬ দফার দাবিটা স্পষ্টতই একটা প্রতিক্রিয়াধর্মী স্লোগানে পরিণত হল। এই সমস্ত ভঙ্গি মনোভাবাপন্ন জনতার সামনে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব অনুভব করলেন, এ এক মাহেন্দ্রক্ষণ, তাঁর জন্য এক কঠিন দায়িত্ব ও পরীক্ষার সময়।

কিন্তু উগরণ করে ফুটতে থাকা, উত্তেজনায় অধীর জনতাকে শান্ত করার মন্ত্র জানতেন তিনি এবং পরীক্ষিত সেই মন্ত্রগুণে এবারও প্রায়-অসাধ্য সে-কাজটি তিনি করলেন। জনতার মানসিক উত্তাপটাকে তিনি প্রশমিত করলেন। পূর্ববর্তী বক্তারা যেসব দাবিদাওয়ার কথা বলেছেন, সেসবের ধারেকাছে গেলেন না তিনি। শেখ মুজিব দাবি জানালেন, সামরিক আইন প্রত্যাহার করে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। কারফিউ তুলে নিলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে বলে তিনি নিশ্চয়তা দিলেন। লুটেরাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি নিজে সকল মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। এই অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য ছিল আতঙ্কগ্রস্ত অবাঙালি লোকজনের মনে আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনা, কেননা ওরা ধরেই নিয়েছিল, আন্দোলনটা ক্রমশ সম্প্রদায়গত অর্থাৎ বাঙালি-বিহারি বিদ্বেষের রূপ নিচ্ছে।

একটা সমঝোতায় আসার জন্য শেখ মুজিব শাসকগোষ্ঠীকে ৭ মার্চ পর্যন্ত সময় দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, ততদিন পর্যন্ত হরতাল চলতেই থাকবে, তাঁর জনগণ কোনোরকম ট্যাক্স না দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

জনতার উত্তেজনা প্রশমিত হল, তারা সভাস্থল ত্যাগ করে ঘরমুখো রওনা হল। এর প্রতিক্রিয়াটা পরদিনই বোঝা গেল। সামরিক বাহিনী অনেকটা সংযত আচরণ করল, তেমন উল্লেখযোগ্য গোলাগুলিও হল না।

ব্যাপারটা এ-কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে, সেদিন সকালেই টাঙ্গাইলের এম. এন. এ. আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির চীফ হুইপ ও পার্টির প্রচার সম্পাদক আবদুল মান্নানকে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন প্রচণ্ড মারধোর করে তাঁর কাঁধের হাড় ভেঙে দিয়েছিল। তাঁর সঙ্গী আওয়ামী লীগেরই আশরাফউদ্দিন চৌধুরীকে বন্দুকের মুখে বাধ্য করা হয়েছিল আউটার সার্কুলার রোড থেকে একটা ব্যারিকেড সরিয়ে নিতে। এ-ধরনের আরও ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা থাকলেও ঐ জনসভার পর স্পষ্টতই সেটা কমে গেল। অবশ্য তা সত্ত্বেও সেরাতে যে গোলাগুলি একেবারেই হয়নি তা নয়, তবে আগের রাতের তুলনায় অনেক কম।

আবহাওয়া-পরিবেশ-পরিস্থিতি যখন এইরকম, তখন ১০ মার্চে একটা গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণাটিকে প্রায় বাস্তববিমুখ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য বলেই মনে হয়। এই ঘোষণার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপেই অগ্রাহ্য করা হল এই প্রদেশটির মতামতকে, উপেক্ষা করা হল গোটা প্রদেশের বিদ্যমান অবস্থাটাকেই, যে-অবস্থাটা ক'জন উপজাতীয় মালিকের সঙ্গে বা জমাতের মতো একটা প্রাগৈতিহাসিক ধ্যানধারণাসম্পন্ন দলের, এমনকি কনভেনশন মুসলিম লীগেরও একমাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে—আর যোদ ভুট্টো সাহেবের কথা তো না বললেও চলে—বিচ্ছিন্ন আলাপ-আলোনার জন্য মোটেই অনুকূল ছিল না।

গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানে শেখ মুজিবের অস্বীকৃতির ব্যাপারে খুব বেশি আলাপ-আলোচনার তেমন প্রয়োজন পড়েনি। ইতিমধ্যে পরিস্থিতি ক্রমেই শাসকদলের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিল, কেননা প্রশাসনের কর্তৃত্ব তখন অচল এবং তার প্রভাব শুধুমাত্র তার বন্দুকের আওতার মধ্যেই প্রসারিত। লাগাতার হরতাল যে কেবল গোটা দেশটাকেই (পূর্ব পাকিস্তান) অচল করে দিয়েছিল তা-ই নয়, গোটা প্রশাসনই জনগণের সঙ্গে যোগ দিতে লাগল। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, বিচারকগণসহ অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও স্বেচ্ছায় স্ব স্ব কাজ থেকে বিরত রইলেন এবং তাঁদের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা-সংগঠনগুলো সক্রিয়ভাবেই জনপ্রতিনিধিদের প্রতি তাদের আনুগত্যের প্রমাণ দিতে লাগল। ব্যাপারটা এমনই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় যে নতুন গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য একজন বিচারপতিকেও পাওয়া যায়নি। শেখ মুজিবের পেছনে জনগণ যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং শাসকদের সঙ্গে যে-পরিমাণে অসহযোগিতা করেছিল, তার তুলনা উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসেও পাওয়া যায় না। শাসকদলের সংযমী হওয়ার জন্য এটি ছিল দৃষ্টান্তমূলক।

সংযমের ফল পেতে অবশ্য সময় লাগে। ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে। টঙ্গিতে নিরস্ত্র শ্রমিকদের ওপর, যশোর, খুলনা ও অন্যান্য প্রত্যন্ত এলাকাসমূহে মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণের ফলে শহীদের তালিকা কেবল বাড়তেই লাগল।

যখন কোথাও কোনো লুটপাটের বা সাম্প্রদায়িক (বাঙালি-অবাঙালি) দাঙ্গার ঘটনা ঘটত, তখন নিরাপত্তা বাহিনী সেখানে খুব কমই যেত। এ-ব্যাপারগুলোর দায়িত্ব আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল—তারাই অকুস্থলে গিয়ে লুটেরাদের পাকড়াও করত, লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করে তুলে দিত এদের মালিকদের হাতে। তৃতীয় দিনের রাতের মধ্যেই স্বেচ্ছাসেবকরা অন্তত ঢাকা শহরে এতটাই আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল যা বন্দুকধারী ভ্রাম্যমাণ সামরিক বহরেরও সাধ্যের অতীত ছিল—এতদিন তো তারাই শহরে পুলিশ চৌকি দিয়ে এসেছে। শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে নিরাপত্তা বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে বিমানবন্দর ও ক্যান্টনমেন্টের আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে মোতায়েন করার ব্যাপারটা যেমন ছিল বাস্তবতারই প্রতিফলন, তেমনই ছিল জনসাধারণের শৃঙ্খলাবোধের প্রতি সপ্রশংস সমর্থন।

শাসকদলের কর্তৃত্ব ক্রমান্বয়ে যেভাবে হ্রাস পাচ্ছিল, আর জনসাধারণ যেভাবে তাদের নেতাদের সমর্থনে ও অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে একযোগে নিরবচ্ছিন্নভাবে সাড়া দিচ্ছিল, তাতে আশা করা গিয়েছিল শাসকমহলের শুভবুদ্ধির উদয় হবে, তাদের কাছ থেকে একটা ইতিবাচক ও যুক্তিসঙ্গত সাড়া পাওয়া যাবে। কিন্তু হল উলটোটা। ৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট এক বেতার-ভাষণ দিলেন যা প্রথমে গোটা বাংলাদেশের মানুষকে বিস্মিত ও পরে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ করে তুলল। ভাষণে জননেতাদেরকে দোষারোপ করা হল এবং জনগণের এই অভ্যুত্থানকে মুষ্টিমেয় কিছু গুণ্ডা-বদমাশ, অগ্নিসংযোগকারী ও খুনির কারসাজি বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করা হল। এই সঙ্কটের মূল হোতা জুলফিকার আলি ভুট্টোকে যে এহেন উলঙ্গ অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়া হল, তাতে

এটাই বোঝা গেল যে শাসকদলের সঙ্গে তাঁর দহরমমহরম নীতির সফলতা তিনি পেয়ে গেছেন। বাংলাদেশের দাবির জবাব যে প্রয়োজন হলে অস্ত্রের ভাষায় দেওয়া হবে,তা বোঝা গেল যখন অ্যাডমিরাল আহসানের জায়গায় গভর্নর করে নিয়ে আসা হল এক কুখ্যাত যুদ্ধবাজ ব্যক্তিকে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, জাতীয় সংসদ স্থগিতকরণের পরিণামের দায়দায়িত্ব বহন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন অ্যাডমিরাল আহসান।

সামরিক বাহিনীকে আরও জোরদার করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। যে-সমস্ত প্রশাসক সরকারের বদলে জনগণের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছেন, তাঁদের ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগের চেষ্টা করা হতে পারে। শেখ মুজিব তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে ইয়াহিয়ার চ্যালেঞ্জের যে জবাব দিয়েছেন, তাতে আরেকটি চরম পরীক্ষার ক্ষেত্রও তৈরি হয়ে গেছে।

শেখ মুজিব অবশ্য তাঁর নেতা-কর্মীবাহিনীর অব্যাহত চাপ সত্ত্বেও সঙ্কটের একটা আপসমূলক সমাধানের লক্ষ্যে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছেন। জনগণের মনোভাব থেকে বোঝা যায়, তারা নিছক আলোচনার চেয়ে আরও বেশি কিছু চায়, লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (এলএফও) যে এ-আলোচনা বানচাল করেও দিতে পারে তারও আলামত পাওয়া গেছে যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবারও তার কথা উল্লেখ করেছেন। নববলে বলীয়ান যুদ্ধবাজ শাসকচক্রের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষের পর যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড প্রায় অনিবার্য, সেটা ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন কি না, বা কতটা পারবেন, এ-ব্যাপারে শেখ মুজিব তাঁর নিজের নেতৃত্বকেই এক অগ্নিপরীক্ষার মুখে ঠেলে দিয়েছেন। এ-ব্যাপারেও তাঁকে অনেক কিছু হিসাবনিকাশ করে দেখতে হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কেউ-কেউ তখন হরতালের ধাক্কাটা টের পাচ্ছে, ওদিকে ছাত্র-সর্বহারা-শ্রমিকদের যে-ভিত্তিভূমি এখন পথে-ঘাটে সর্বত্র চিন্তাচেতনা নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের বিরুদ্ধে গেলে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, তাকেও তারা ভয় পাচ্ছে। এরা তাগিদ দিচ্ছে একটা আপসরফা করে ফেলার জন্য। এই সবকিছুই বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হয়েছে তাঁকে।

ফলে শেখ মুজিবের ভাষণটা ঠিক সেরকমটা হয়নি জঙ্গি-জনতা যেরকমটা দাবি করেছিল। তবে তা কাপুরুষোচিত আত্মসমর্পণও ছিল না। তিনি যথাযথভাবেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার চ্যালেঞ্জ ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং যাঁরা ক্ষমতার কলকাঠি নাড়ছেন তাঁদের ঘাড়েই গণহত্যা ও জাতীয় অখণ্ডতা নষ্ট করার পুরো দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

সামরিক আইন প্রত্যাহার, সৈন্যদের অপসারণ, জনগণের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর যে-দাবি, সেটা আজকের বাংলাদেশের প্রকৃত পরিস্থিতির সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসার অনুরোধের চেয়ে অধিক কিছু নয়। হত্যা, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ বন্ধ হয়েছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটি প্রমাণ করেছে যে তারা পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম। প্রশাসনের যেটুকুই অবশিষ্ট রয়েছে তারাই ইতিমধ্যেই তা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীই স্বেচ্ছায় তাদের আদেশ-নির্দেশ গ্রহণ করছে যাতে প্রদেশটি বিশৃঙ্খলার আবর্তে তলিয়ে না যায়। সামরিক আইনের অধীনে প্রশাসন পুনর্দখলের চেষ্টা করে পরিস্থিতিকে উলটে দেবার যে-কোনো প্রচেষ্টা প্রদেশটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখেই ঠেলে দেবে। শাসকচক্রের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অবশ্য কেবল ঐ পর্যন্তই বিস্তৃত যেখানে তারা নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের ওপর গুলি চালাতে আর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে পারে। কিন্তু জনগণের সম্মতি না নিয়ে

তারা কোনোদিনই এই প্রদেশের অর্থনীতি ও প্রশাসনকে পুনরায় চালু করার আশা করতে পারে না। কাজেই তারা যদি দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের একটা স্থায়ী, টেকসই সমাধান খোঁজার ব্যাপারে সত্যিই আন্তরিক হয়ে থাকে, তা হলে নিদেনপক্ষে যা তাদের করতেই হবে তা হচ্ছে শেখ মুজিবের শর্তগুলো মেনে নেওয়া। তা হলেই দেশটাকে যে অটুট রাখা যাবে—এটা জনগণকে বিশ্বাস করানোর জন্য ওইটুকুই যথেষ্ট হবে কি না, তা নির্ভর করবে জাতীয় পরিষদ জনগণের ন্যূনতম দাবি স্বীকার করে নেবে, নাকি তারা একটা চরম পরীক্ষার ক্ষণকে কেবল বিলম্বিত করতে চাচ্ছে—তার ওপর।

অবস্থা যেরকম দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয় বাংলাদেশেও ছয় দফার আর কোনো মূল্য আছে কি না এটা আর নিশ্চিত নয়। ভুট্টো নাকি এরকম বলেছেন যে তিনি ছয় দফা আর বিচ্ছিন্নতার (বা দেশ-বিভাজনের) মধ্যে কোনো তফাত দেখেন না। তাঁকে এখন হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখানো হচ্ছে যে, ছয় দফার বাইরেও পড়ে আছে এক সম্পূর্ণ নতুন জগৎ। আর, পরিহাস হলেও সত্যি যে, ছয় দফার প্রণেতারাই ছিলেন সম্ভবত পাকিস্তানে সর্বশেষ সত্যিকারের অখণ্ডতাবাদী। আজ যদি বাংলাদেশের জনসাধারণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে সম্মতি দেয় কেবল তা হলেই সমগ্র জাতি একত্রে বাঁধা থাকতে পারবে। দেশের অখণ্ডতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে অস্ত্রের শক্তি ততটাই ক্ষমতা ধরে যতটা ক্ষমতা ছিল ভারতবর্ষকে ব্রিটিশদের অধীনে কিংবা একত্রে যুক্ত রাখতে। শেখ মুজিব ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তাঁর গোটা রাজনৈতিক জীবনটাকেই বাজি রেখেছেন একটা চূড়ান্ত জবাবের আশায় কালক্ষেপণে। এই সহজ কর্মটিতে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে দেশটা যদি ভেঙেই পড়ে তা হলে পড়বে তাদেরই মাথার ওপর, যারা বন্দুক চালায়।

সাপ্তাহিক ফোরাম, ৬ মার্চ, ১৯৭১

স্ব-শাসনের প্রতিষ্ঠাপর্ব

বাংলাদেশে এখন যা হচ্ছে তার নজির খুব বেশি দেখা যায় না। বলা চলে, মাত্র সাতদিনের মধ্যেই ইসলামাবাদ সরকারের কাছ থেকে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা-হস্তান্তরের কার্যটি প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পন্ন হয়ে গেছে। না, যুদ্ধক্ষেত্রে জাঁকালো বিজয় অর্জনের মাধ্যমে কিংবা কোনো বিদেশী হস্তক্ষেপ বা কূটকৌশলের সাহায্যে এ-কাজটি সাধিত হয়নি। শাসকদলের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতাত্যাগের মাধ্যমেও এটি অর্জিত হয়নি—বরং এটি সম্ভব হয়েছে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়েই। গত সপ্তাহের মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা সত্ত্বেও এই কথাটা বলা চলে, কেননা এইসব মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যেমন বাংলাদেশের জনসাধারণ, তেমনি নিপীড়ক শক্তিগুলোও।

এই অবস্থার অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি যে-বাস্তবতার মধ্যে নিহিত, তা হচ্ছে, শান্তিপূর্ণ অসহযোগিতাকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে যা জনগণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। অধিকাংশ মুক্তিসংগ্রামেই অসহযোগিতা বা অসহযোগ আন্দোলন ছিল সে-সংগ্রামের একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। এ-আন্দোলনের লক্ষ্য হত অর্থনীতি ও প্রশাসনকে পঙ্গু করে দিয়ে শাসকদের জীবনকে অসহনীয়, অতিষ্ঠ করে তোলা। এ-ধরনের কোনো আন্দোলন

অনির্দিষ্টকালের জন্য জিইয়ে রাখা যেত না, কেননা শাসকগোষ্ঠী সবসময়ই প্রশাসন, ব্যবসায়ী ও ভূমাধিকারী শ্রেণীর অন্তর্গত একটা সহযোগী গোষ্ঠীর (নিঃস্বার্থে দালালগোষ্ঠী) ওপর নির্ভর করতে পারত। এইসব ব্যক্তিগোষ্ঠীর সক্রিয় সহযোগিতার পক্ষে ইন্দোচীনে প্রবল প্রতিরোধের মুখেও তাদের রিট বলবৎ করা সম্ভবপর হয়েছিল, এদেরই বদৌলতে এমনকি জার্মান ও জাপানিরাও ইটরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের দখল-আমলে সমাজের জীবনযাত্রা চালু রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতবর্ষে মুক্তিসংগ্রামকালেও সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে এটা দেখাবার জন্য সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের, জজসাহেবদের ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে সবসময় হাজের কাছে পাওয়া যেত, আর পুলিশবাহিনী তো সর্বক্ষণই থাকত আইন-শৃঙ্খলা জোরদার করার জন্য। তবে কুটিৎ-কদাচিৎ সৈন্যদেরও ডাকতে হত—তাও স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করতে, তাদের বিকল্প হিসেবে নয়।

কাজেই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা নজিরবিহীন সেটা হচ্ছে এই যে, ইসলামাবাদের শাসকদলের সঙ্গে অসহযোগিতাটা হয়েছে সামগ্রিক অর্থে। কেননা, গত সপ্তাহে প্রশাসনের কোনো ব্যক্তিকেই সরকারের পক্ষে কাজ করতে পাওয়া যায়নি—পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি কিংবা মুখ্য সচিব বা চীফ সেক্রেটারি, কাউকেই না। আমার জানামতে, সমকালীন ইতিহাসে অন্য কোনো দেশেই এরকমটি কখনো ঘটেনি। এমনও হয়েছে যে, কোনো ঊর্ধতন কর্মকর্তা হয়তো রুটিনমাফিক তাঁর নিম্নস্তর দফতরে কোনো সংবাদ পাঠাতে চেষ্টা করেছেন, সেক্ষেত্রে তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরাই সেই কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।

রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে ঘটেছিল এক অসাধারণ ঘটনা। শেখ মুজিবের রেসকোর্সের ভাষণটি রেডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছিল সামরিক কর্মকর্তাগণ। কিন্তু তারাই যখন তাদের খেয়ালখুশিমাফিক ভাষণটির সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়, তখন রেডিওর কর্মচারীবৃন্দ রেডিও অফিস বন্ধ করে দিয়ে সোজা বাড়ি চলে যান। এর ফলে জেলাগুলোতে এক বড় সঙ্কট সৃষ্টি হয়। পূর্বঘোষিত ভাষণ সম্প্রচার হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে জনসাধারণ ধরে নিল শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এতে করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটার আশঙ্কা দেখা দেয়। এই বিষয়টি যখন সামরিক কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হয় এবং সেইসঙ্গে এটাও জানানো হয় যে, অতঃপর বাংলাদেশের কোনো রেডিও স্টেশন থেকেই আর কোনো সংবাদ প্রচার করা হবে না, তখন তারা খবরটি ৮ মার্চের সকালে প্রচার করতে দিতে রাজি হয়। এরকম শর্তে এখানকার রেডিও স্টেশনগুলো আবার কাজ শুরু করে এবং 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র' থেকে করাচি থেকে পাঠানো লাওস, মধ্যপ্রাচ্য বা অন্যান্য যে-কোনো স্থানের সংবাদ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বাংলাদেশ সম্পর্কে নিজস্ব সংবাদ বুলেটিন প্রচার করতে থাকে।

অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনটা ছিল কেবল প্রথম ধাপ মাত্র। তার চেয়েও বেশি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, ইসলামাবাদের সঙ্গে অসহযোগিতা থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সহযোগিতায় ক্রমবিকশিত হওয়াটা। ইডেন বিল্ডিং যেখানে পরিণত হয়েছে এক হৃত আশার সমাধিতে, সেখানে শেখ মুজিবের বাসস্থান ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে প্রশাসন জেগে উঠেছে প্রাণচাঞ্চল্যে।

দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মার্চের ৪ তারিখ থেকেই নীতিমালা-সংবলিত বিবৃতি প্রচারিত হতে থাকল—এবং এগুলোর উৎসস্থল ৩২ নম্বর

সড়কের ঐ বাড়িই। প্রথম ফরমানগুলোতে ৫ মার্চ থেকে ব্যাংকগুলোকে বেলা আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত খোলা রাখবার এবং ১৫০০ টাকার অনধিক চেক ক্যাশ করবার অনুমতি দেওয়া হল। পরদিন এটাকে বাড়িয়ে বেতনাদি পরিশোধ করার লক্ষ্যে চেক ভাঙাবার অনুমতি দেওয়া হয়—তবে তার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়ন নেতার সত্যায়নের প্রয়োজন হবে, এই শর্তে।

সাধারণ মানুষের দুর্দশার কথা ভেবেই এই পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়। বহু কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মাইনের দিন থেকেই সঙ্কটের শুরু হয়, হাতে নগদ টাকাপয়সা নেই বলে বহু শ্রমিককেই অনাহারে থাকতে হবে—এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু করার ফলে যে কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি, তা নয়। প্রথমত ব্যাংকগুলো অচিরেই দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে এ-আশঙ্কার চাইতে এগুলো আবারও বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় প্রতিটি ব্যাংকেই টাকা ওঠানোর ব্যাপারে গ্রাহকদের হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। প্রত্যন্ত অঞ্চলের শাখাগুলো খোলা সম্ভব হয়নি। কেননা সেগুলোতে নগদ টাকার সঞ্চয় ফুরিয়ে গিয়েছিল। এদিকে যোগাযোগব্যবস্থা ভেঙে পড়াতে তারা তাদের ঢাকাস্থ হেড অফিস থেকে যে টাকা নিয়ে আসবে সে-উপায়ও ছিল না। যোগাযোগব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হবার পর এ-ব্যাপারে কিছুটা স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। আশা করা যাচ্ছে, নগদ টাকার ব্যাপারে লোকজনের অধিক আগ্রহটা ক্রমশ হ্রাস পাবে এবং ফলে ব্যাংক থেকে টাকা ওঠানোর হিড়িকটাও আর থাকবে না।

ব্যাংকের কাজকর্ম মাত্র দুঘণ্টার জন্য হবার ফলে তাদের কর্মতৎপরতা সীমিত হয়ে পড়ল। ৮ মার্চে জারি করা আরেকটি নির্দেশবলে ব্যাংকগুলোকে আরও অধিকক্ষণ কাজ চালাবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই নির্দেশটিতে ব্যাংকগুলোকে কলকারখানা চালু রাখার উদ্দেশ্যে কাঁচামাল কেনার জন্য অর্থপ্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়। কেননা ৫ মার্চ থেকে কলকারখানা পুনরায় চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকলেও ব্যাংকের কড়াকড়ির দরুন এগুলো অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিল।

অর্থনীতিকে আবার চাঙ্গা করে তোলার প্রয়োজনীয়তা এবং শ্রমিকদের যে-কোনো প্রকার দুর্দশা লাঘবের কথা ভেবেই এই ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হয়। তবে আসল সমস্যাটি ছিল ব্যাংক থেকে পুঁজিপাচার রোধ করা।

একইভাবে ৯ মার্চ তারিখে জারি করা নির্দেশবলে বেছে-বেছে কিছু সরকারি কাজকর্ম পুনরারম্ভ করার অনুমতি দেওয়া হয়। ব্যাংকসমূহের কাজ চালানোর সুবিধার জন্য স্টেট ব্যাংকের কিছু-কিছু অংশ বা বিভাগ খুলে দেওয়া হয়। কৃষকদের খুব অসুবিধা হচ্ছিল, তাই তাদের যাতে সার সরবরাহ করা যায় এবং শীতকালীন ফসলের ক্ষেতে সেচ দেওয়ার জন্য পাওয়ার পাম্প চালু করা যায় সে-উদ্দেশ্যে কৃষি উন্নয়ন সংস্থাও খুলে দেওয়া হল। পাট ও ধানের বীজ বিতরণের অনুমতি দেওয়া হল। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খাদ্যশস্য আনা-নেওয়া, খাদ্যগুদামগুলো চালু করাসহ পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাস সরবরাহ এবং নৌ ও রেল-পরিবহণ চালু করারও অনুমতি দেওয়া হয়। এগুলো ছাড়া ইডেন বিল্ডিং (সচিবালয়), কোর্টকাছারি সবই বন্ধ রইল। মার্চের ১২ তারিখে অত্যন্ত বিশদ আরও একটি নির্দেশ জারি করা হয় যার বলে বাছাই-করা ক্ষেত্রবিশেষে অসহযোগিতা-নীতি আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়।

তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে সিভিল সার্ভেন্ট বা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের সবাই নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে ছিলেন। সঙ্গ্রামকে তাঁরা অসহযোগ আন্দোলনের পর্যায় থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার স্তরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের এক-একটি গ্রুপ বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য পার্টির কাছে পেশ করার দায়িত্বটা মেনে নিয়েছিলেন। এভাবে একটা কাজ-চালানো-গোছের সেক্রেটারিয়েট বা সচিবালয় চালু হয়ে গেল এবং সমস্যার সমাধান খোঁজার লক্ষ্যে আলাপ-পরামর্শ ও আশ্বাসের জন্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়ীবৃন্দ সেখানেই দলেদলে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। কর্ম-পরিবেশ বা কাজকর্মের ধরন হয়তো খুব আরামপ্রদ ছিল না, কিন্তু তাতে সিদ্ধান্তগ্রহণের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত তো হয়ইনি বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা ইডেন বিল্ডিঙের তুলনায় ত্বরিতগতিতে সম্পন্ন হয়েছে। সরঞ্জামাদি, কাজের পরিবেশ, কর্মপ্রণালী ইত্যাদি খুব একটা সন্তোষজনক ছিল না। যাঁরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতার অভাবটাও একটা বাধা বটে, কিন্তু তবুও কাজকর্ম এগিয়ে যেতে থাকল।

ফলত এখন জনপ্রতিনিধিদের রিট বা আদেশপত্র বাংলাদেশের প্রতিটি কোনায়ই ক্রিয়াশীল। সেক্রেটারি, ডেপুটি কমিশনার, সার্কেল অফিসার, পুলিশ কর্মকর্তা—সবাই তাঁদের হুকুম তামিল করছেন। আইন-শৃঙ্খলা জোরদার করার লক্ষ্যে পুলিশ আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে মিলে কাজ করছে—গোলযোগপূর্ণ সময়ের কথা বিবেচনা করলে যা প্রায় অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। মফস্বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সঙ্গ্রাম পরিষদের সঙ্গে সহযোগিতা করা শুরু করেছে এবং তাদের নির্দেশ পালন করছে। বস্তুত এখন প্রশাসনের আওতাধীন সিদ্ধান্তগ্রহণের কার্যকর ক্ষমতার উৎস একটাই—তা হচ্ছে আওয়ামী লীগ।

প্রশাসনের সহযোগিতা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে একটা অনুপম মাত্রা যোগ করলেও, কার্যকারিতার দিক থেকে তা কিন্তু জনগণের সাড়ার তুলনায় ততটা তাৎপর্যবহ নয়। যেমন, কোনো কোনো ঊর্ধ্বতন প্রশাসন-কর্মকর্তার ওপর আরোপিত শাস্তির বিধান এখন কার্যত তাঁদেরই অধীনস্থ তৃতীয় ও চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীরাই প্রয়োগ করছে। পার্টির সিদ্ধান্ত বানচালের যে-কোনো প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার ব্যাপারে তাদের অতিউৎসাহ প্রায়শই প্রশাসনের পুনরায় শুরু হওয়া অনেক ক্ষেত্রকেই অকেজো করে দিয়েছে, যার ফলে কর্মকর্তাদেরকে তাঁদের কর্তৃত্ব পুনর্বহাল করার আরজি নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যেতে হয়েছে ৩২ নম্বরে। প্রকৃত ক্ষমতা এখন সেক্রেটারির হাত থেকে চলে গেছে তাঁরই অধস্তনের হাতে এবং মনে হচ্ছে, কর্তৃত্বের স্বাভাবিক নিয়ম-শৃঙ্খলা যদি আবার ফিরিয়ে আনাও হয়, ঊর্ধ্বতন-অধস্তনের মধ্যেকার সম্পর্কটা আর আগের মতো হবে না।

ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংক ও অফিসসহ কলকারখানাগুলোতেও একই ব্যাপারে। শ্রমিক-কর্মচারীরাই বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষাকল্পে নজর রাখছে যাতে উচ্চপদে আসীনরা কোনোরকম ফাঁকিঝুঁকি দিতে বা কোনো অন্তর্ঘাতমূলক কিছু একটা করতে না পারেন। এইসব উচ্চপদের নির্বাহীদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এদেশের প্রতি সত্যিকার অঙ্গীকার বোধ থেকে সহযোগিতা করেছেন। কেউ-কেউ হয়তো তাঁদের অধস্তনদের ভয়েও তা করে থাকতে পারেন—তবে এমনও কেউ-কেউ ছিলেন যাঁরা টাকাকড়ি ওঠানোসংক্রান্ত কড়াকড়িহ্রাসের সুযোগটা অন্যভাবে নিতেও চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কিন্তু অবস্থা যে আরও খারাপ হতে পারেনি তার পুরো কৃতিত্বটা তাঁদেরই কর্মচারীদের প্রাপ্য, যাদের দেশপ্রেম ও সতর্কতা প্রশংসাযোগ্য।

আন্দোলনটি কার্যত জনসাধারণের মধ্য থেকে এমন সব সম্ভাবনা, এমন অমূল্য সম্পদ বের করে এনেছে যার হিসাব আগে জানা ছিল না। এখন বাংলাদেশে আইনত কোনো সরকার নেই, নেই কোনো সরকারি বিধিনিষেধ, নিষেধাজ্ঞা বা অনুমোদনের ব্যাপারও। আওয়ামী লীগ যে সীমিত পরিমাণ সিদ্ধান্ত ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করছে সেগুলো কোনো আদালতে প্রযোজ্য নয়, তাদের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত করার মতো কোনো কার্যকর ব্যবস্থাও নেই। তারা যদি বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না বা অননুমোদিত উদ্দেশ্যে টাকা ওঠানো যাবে না—এই মর্মে ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর উদ্দেশে কোনো নির্দেশ জারি করে, সে-নির্দেশ তাদের হয়ে বলবৎ করারও কেউ নেই।

এই যে একটা অস্বাভাবিক, অসাধারণ গঠন-কাঠামো, সেটা যে-অনড় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা হচ্ছে জনপ্রতিনিধিদের প্রতি সাধারণ মানুষের অবিচল আনুগত্য ও সহযোগিতা। আমরা দেখেছি অফিসগুলোতে নিম্নপর্যায়ের কেরানি ও কর্মীরাই কীভাবে জনসাধারণের স্বার্থ দেখাশুনা করছে। প্রথমদিককার কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা, লুটপাট, জাতিগত দাঙ্গা ইত্যাদি সত্ত্বেও, বাইরেও এখন স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। এমনকি জেল-পালানো দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরাও দেশপ্রেম ও সংযমের পরিচয় দিচ্ছে। পুলিশের রিপোর্টে দেখা যায়, স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অপরাধের মাত্রা বেশ হ্রাস পেয়েছে। এখন তারা সবুজ টুপি-পরা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে শহরময় চৌকি দেওয়ার কাজে সহায়তা করছে—এবং তা কেবল সহিংসতাদমনের লক্ষ্যেই নয়, বরং সার্বিকভাবে আইন-শৃঙ্খলা জোরদার করার লক্ষ্যে। গুলশান ও ধানমণ্ডি এলাকায়, যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশেষভাবে এমনিতেই ভয়ে তটস্থ থাকে—স্বেচ্ছাসেবকরা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তাদের উপস্থিতির কথা জানান দিয়ে অভয় দিচ্ছে।

একথাও বলা হচ্ছে না যে, বাংলাদেশের ওপর একটা শান্তিপূর্ণ স্বর্গসুখ নেমে এসেছে। খবর পাওয়া গেছে, একদল সশস্ত্র যুবক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি ও সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে বিস্ফোরক তৈরির কিছু রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে গেছে। ভিআইপিদের পাহারায় রত সেন্ট্রিদের কাবু করে তাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সংগ্রামের অন্য পর্বটি শুরু হয়ে গেছে এবং এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া চলে যে, আগামী যে-কোনো অভ্যুত্থানেই সহিংসতাটা একতরফা হবে না।

নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ডে একটা জঙ্গি মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ওদের নিজস্ব প্রেসনোটে খবর দেওয়া হয়েছে যে, সিলেট ও যশোর এলাকাস্থ তাদের ঘাঁটিতে রসদ সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কৃষকরা রাস্তা কেটে রেখেছে বলে খুলনা থেকে একটি সরবরাহ বহরের যশোর পৌঁছুতে ১৮ ঘণ্টা লেগেছে। এমভি সোয়াত জাহাজযোগে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে প্রথম অতিরিক্ত সাহায্যের চালান এসে পৌঁছেছে চট্টগ্রাম বন্দরে, তার আংশিকমাত্র খালাস করে ওয়াগনে তোলা হয়েছে। বন্দর-শ্রমিকরা নিজেদের উদ্যোগেই খালাস করার কাজ বন্ধ করে দেয় এবং থেমে-থাকা ওয়াগনগুলোকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য যাতে কোনো এঞ্জিন না পাওয়া যায় তারও ব্যবস্থা করে। শ্রমিক কৃষক ও সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকার সংগ্রাম বলতে যা বোঝে, উপরোক্ত কাজগুলো থেকে সে-সংগ্রামের প্রতি তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়ারই প্রমাণ মেলে।

সাপ্তাহিক ফোরাম, ১৩ মার্চ, ১৯৭১

মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ : এ. টি. এম. হাই

মুক্তিযুদ্ধ দেশে-বিদেশে

১৯৭০-এর ডিসেম্বরে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরপরই মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ঘটে। মোট কথা, আজ থেকে প্রায় দুযুগ আগে বাংলাদেশের অন্যান্য অর্থনীতিবিদের সঙ্গে আমি বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিস্তার চিহ্নিত করবার ক্ষেত্রে বাঙালি অর্থনীতিবিদরাই ছিলেন পুরোভাগে। এই বঞ্চনার মূলে ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের পশ্চিম পাকস্তানি শাসকবৃন্দ। ১৯৬০ সালের প্রায় পুরো বছর ধরেই আমি অর্থনীতির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক অসমতা বিষয়ে আমার দর্শন বিভিন্ন সমাবেশে এবং বিভিন্ন জার্নাল ও জনপ্রিয় প্রচারমাধ্যমে প্রকাশ করতে থাকি। আমি সোচ্চার ছিলাম এটি দেখাতে যে, এক পাকিস্তান রাষ্ট্রে ছিল দুটো পৃথক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আমার এসব দর্শন ব্যাপক প্রচার লাভ করে এবং আমি আমার অন্যান্য সহকর্মীর মতোই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কুনজরে পড়ি।

বাঙালি অর্থনীতিবিদদের এসব দর্শন পাকিস্তানের রাষ্ট্রনিয়ন্তাদের দারুণভাবে আঘাত করে। এর মূল কারণ ছিল বিভিন্ন কমিটিতে এবং সেমিনারে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক দর্শন প্রচার করতাম। ১৯৬০ সালে রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্যে আয়োজিত সেমিনারে আমি অধ্যাপক নূরুল ইসলামসহ যোগ দিই। একই বছর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদদের প্যানেলে অধ্যাপক আখলাকুর রহমান, মোশাররফ হোসেন এবং আমি জড়িত ছিলাম। ১৯৬১ সালের অর্থ কমিশনে অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ছিলেন সদস্য এবং আমি ছিলাম পূর্ব পাকিস্তানি সদস্যদের উপদেষ্টা। ১৯৬৫ সালের তৃতীয় পরিকল্পনায় অর্থনীতিবিদদের প্যানেলে মোশাররফ হোসেন এবং আমি ছিলাম সদস্য। ১৯৭০ সালের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অধ্যাপক মাযহারুল হক, নূরুল ইসলাম, আখলাকুর রহমান, আনিসুর রহমান এবং আমি ছিলাম সদস্য। ফলে এসব অনুষ্ঠানে অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশল নিয়ে পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে পাকিস্তানের পরিকল্পনাবিদ ও

শাসকগোষ্ঠীর স্পষ্ট মতবিরোধ এবং তিক্ততার সৃষ্টি হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে যেহেতু আমি ছিলাম সাপ্তাহিক *ফোরাম*-এর নির্বাহী সম্পাদক, ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিষয়টি নিয়ে আমার দর্শন জনসমক্ষে প্রকাশ করতে শুরু করি। শুধু তা-ই নয়, প্রকাশিত এসব রচনায় আমি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া এবং তাঁর প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এম. এম. আহমেদকেও জড়িত করি।

বাংলাদেশের অধিকার আদায়ে জনগণের অবস্থান তৈরিতে বাঙালি অর্থনীতিবিদদের কর্মকাণ্ড বা গবেষণা অবিলম্বে তাঁদের বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে আরও সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে ফেলে। আমাদের কেউ-কেউ অর্থনৈতিক ইস্যু নিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও চালিয়ে যেতে শুরু করেন। বলা দরকার, আওয়ামী লীগের ছয় দফা আমাদের বিভিন্ন রচনার দ্বারা ছিল দারুণভাবে প্রভাবিত। যদিও, আমি যতটুকু জানি, ছয় দফা রচনায় কোনো অর্থনীতিবিদ অংশ নেননি। ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে পিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠকের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরান্ডাম প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে তাঁকে পরামর্শ দেবার জন্যে অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক আনিসুর রহমান এবং অধ্যাপক ওয়াহিদুল হককে দায়িত্ব দেন। এই বৈঠকেই তিনি মেমোরান্ডামটি উপস্থাপন করেন। ১৯৭০ সালের গ্রীষ্মকালে অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক আনিসুর রহমান, ডঃ এ.আর.খান, ডঃ স্বদেশ বসু, ডঃ হাসান ইমাম এবং আমি আওয়ামী লীগের নির্বাজনী মেনিফেস্টো রচনার উদ্দেশ্যে ডঃ কামাল হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এই মেনিফেস্টোটির মৌলিকত্ব এবং বিশ্লেষণযোগ্য বিষয়সমূহের জন্যে কিছুটা হলেও এই গোষ্ঠীর অবদান রয়েছে।

যা-ই হোক, ১৯৭০-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের অংশগ্রহণ ছিল চরম আবেগপূর্ণ। '৭০ সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের বিশাল বিজয়ের পরপরই বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং উপযোগী একটি সংবিধানের খসড়া তৈরির কাজকে এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ এই ছয় দফা দাবি নিয়েই আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রচারে নেমেছিল। তিনি সংবিধান এবং শাসনকার্যে এর ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করতে চাইছিলেন, যাতে নির্বাচনী বাগাড়ম্বরের বাইরে ছয় দফা কর্মসূচিকে রাখা যায় এবং একে সমঝোতার আলোচনায় ও জাতীয় সংসদ অধিবেশনে উত্থাপন করা যায়। বঙ্গবন্ধু প্রকৃতপক্ষে দেশের জন্যে একটি সুচিন্তিত এবং কার্যকর সাংবিধানিক কর্মসূচিই প্রদান করতে চাইছিলেন।

নির্বাচনের পরবর্তী মাসগুলোতে সংবিধান নিয়ে আলোচনার জন্যে অনেকগুলো বৈঠকে বসেছিলেন বঙ্গবন্ধু। এই বৈঠকগুলোতে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের উচ্চপর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। এঁদের মধ্যে তাজউদ্দিন আহমেদ, নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং ডঃ কামাল হোসেন ছাড়াও ছিলেন অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী, অধ্যাপক সারওয়ার মুরশেদ, অধ্যাপক আনিসুর রহমান এবং আমি। এই বৈঠকগুলো সাধারণত অনুষ্ঠিত হত বুড়িগঙ্গা নদীর কাছাকাছি একটি বাড়িতে। প্রায় সারাদিনব্যাপী এইসব গভীর আলোচনায় অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক আলোচক ছাড়াও ডঃ কামাল হোসেন

খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। যা-ই হোক, এঁদের মধ্যে তাজউদ্দিন আহমেদ ছিলেন শান্ত কিন্তু সহযোগিতার ক্ষেত্রে সৃজনশীল। জটিল টেকনিক্যাল বিষয়গুলো ধারণ করার ক্ষেত্রে তাঁর ছিল অসাধারণ ক্ষমতা, দ্বান্দ্বিক দক্ষতা এবং গভীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। বঙ্গবন্ধু নিজেও ছিলেন খুবই সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। তাঁর আলোচনার আমাদের যে-লাভটি হত তা হচ্ছে, তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং প্রখর কমনসেন্স। একসময় এই দলটি তার আলোচনা এবং চর্চায় সমাপ্তি টানল। আওয়ামী লীগ সংবিধানের একটি খসড়া দাঁড় করিয়ে ফেলল এবং তার সমঝোতার অবস্থানও পুরোপুরি তৈরি করে ফেলল যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে রাজনৈতিক আলোচনায় ব্যবহার করা যায়।

১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দিন আহমেদের অনুরোধে এক আকস্মিক ভ্রমণে আমি পশ্চিম পাকিস্তানে যাই। সেখানে যাওয়ার মূল কারণ ছিল এটা নিশ্চিত হওয়া যে, পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক দল সংবিধান বিষয়ে সত্যি সত্যি কিছু ভাবছে কি না বা ছয় দফা কর্মসূচিকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি না। লাহোরে এই ভ্রমণে আমি আলাদা-আলাদাভাবে পিপিপি-র ডঃ মুবাশের হাসান এবং মিয়া মাহমুদ আলি কাসুরির সঙ্গে দেখা করি। এঁরাই বলতে গেলে ছিলেন দলের মাথা। কিন্তু তাঁরা এমন কোনো ইঙ্গিত দিলেন না যে, তাঁরা সংবিধান-রচনার ক্ষেত্রে গভীরভাবে কিছু ভাবছেন। বরং তাঁরা জাতীয় ট্রেকার বিষয়েই কিছু বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথাবার্তা আমাকে শুনিয়ে দিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পর আমি বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে পারি যে, তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময়ে উচ্চারিত আমার কিছু মন্তব্য কাসুরির মাধ্যমে পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দাদের কাছে পৌঁছায় এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ডঃ কামাল হোসেন যখন তাদের কাস্টডিতে ছিলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় সামরিক গোয়েন্দারা এগুলো কাজে লাগায়। যা-ই হোক, এরপর আমি লাহোর থেকে করাচি যাই। সেখানে আমি ব্যারিস্টার রফি রাজার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করি। তিনি তখন ভুট্টোর সংবিধানবিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছিলেন। রাজার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম যে, আগামী সংসদ অধিবেশনের জন্যে সংবিধানের খসড়াতৈরির কাজে ভুট্টো তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এই বিশাল কাজটির খুব সামান্যই তখন সম্পাদন করেছেন। কারণ ভুট্টো নিজে সংবিধান-রচনার সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী নন। ভুট্টোর একজন প্রিন্সিপাল লেফটেন্যান্ট আবদুল হাফিজ পীরজাদার সঙ্গে আলোচনার পর আমি বিষয়টি সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হলাম। ঢাকায় ফিরে এসে আমি বঙ্গবন্ধুকে জানালাম যে, পিপিপি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক আলোচনার জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করা থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থান করছে।

এ-বিষয়টি সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হওয়া গেল যখন ১৯৭১ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে পিপিপি-র শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নিয়ে ভুট্টো ঢাকায় এলেন। তাজউদ্দিন আহমেদের কাছ থেকে আমি এসব কথাও জানতে পারলাম যে, পিপিপি ছয় দফার ভিত্তিতে গঠিত সংবিধানের ব্যবহার ও কার্যকারিতা নিয়ে আলাপ-আলোচনার চাইতে তাদের ক্ষমতার ভাগ নিয়ে আলোচনা করতে বেশি উৎসাহী। পিপিপি নেতারা যখন

ঢাকায় ভ্রমণ করছেন, তখন আমি রফি রাজা এবং মুবাশের হাসান ছাড়াও সংস্কারপন্থি পিপিপি নেতা, যেমন মেহরাজ মোহাম্মদ খান—এঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসি। কিন্তু আমাদের আলোচনা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগুনোর বদলে আপাত-দার্শনিক বিষয়গুলোতেই ঘুরপাক খেল। পিপিপি-আওয়ামী লীগের আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য আমার চাইতে অন্যরাই ভালো দিতে পারবেন, যদিও ঘটনার প্রধান নায়কদের অনেকেই এখন আর বেঁচে নেই। যা-ই হোক, আমার নিজের ধারণা পিপিপি বা ইয়াহিয়া খানের কেউই একাত্তরের ১ মার্চের আগে ছয় দফা বিষয়ে সমঝোতামূলক অবস্থান তৈরির ব্যাপারে কোনো প্রচেষ্টা নেয়নি। আমি যতদূর জানি, ছয় দফা কার্যকর করবার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সংকট নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি কোনো রাজনৈতিক নেতা ও আওয়ামী লীগের মধ্যে কোনো বৈঠকই অনুষ্ঠিত হয়নি। অথচ '৭১-এর মার্চের মধ্যরাতে যখন এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হল, সাংবিধানিক ব্যাপারটি তখন ছয় দফার বাইরেই থাকল। জেনারেলরা ততক্ষণে রক্তপাত এবং বুলেটের মাধ্যমেই বিষয়টি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

মার্চের আগের উত্তেজনাপূর্ণ সময়গুলোতে *ফোরাম*-এ আমার লেখাগুলো প্রকাশ করি, একথা আগেই উল্লেখ করেছি। এগুলোতে আমি এটাই বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি যে, কীভাবে ছয় দফা দাবিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায় এবং কীভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতাদের জন্যে এই দাবিগুলো কার্যকর না হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ফোরাম-এর কলামে আমার লেখাগুলোর শাশ্বত বাণী যেটি ছিল সেটি হচ্ছে, ছয় দফা দাবিই পাকিস্তানি সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের সর্বশেষ সুযোগ। এটি ছাড়াও ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও গণআন্দোলনের দিকনির্দেশনা। খুব কম বাঙালিই সে-সময় মানসিকভাবে পাকিস্তানি ধ্যানধারণা আঁকড়ে ছিল। তাদের সামনে একটিই প্রশ্ন ছিল, কীভাবে ঘটবে এই বিভক্তি—সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায়, নাকি সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে?

১৯৭১ সালের পয়লা মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন সংসদ অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা দিলেন, তখনই আমার মনে হয়েছিল যে, এটাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণ। ঠিক সেদিনই সারা বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে-অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন, সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ অংশে পাকিস্তান সরকারের ক্ষমতাকে অস্বীকার করা। এরপর সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা তারা আর কখনোই ফিরে পায়নি। একাত্তরের ২৬ মার্চের পর পাকিস্তান সরকার তার ক্ষমতাকে সুসংহত করবার জন্যে যেসব প্রচেষ্টা চালিয়েছিল বলে বাংলাদেশের জনগণ দেখেছিল—তার সবটাই তারা দেখেছে বিদেশী সামরিক বাহিনীর ক্ষমতাদখলের প্রক্রিয়া হিসেবে।

অসহযোগ আন্দোলনের যে-ডাক দেওয়া হয়, তার পুরো সাফল্যই অতিদ্রুত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এক সংকটের সৃষ্টি করে। একবার যখনই বেসামরিক প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিল, ঠিক তখনই ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে, বাংলাদেশে পাকিস্তান সরকার আক্ষরিক অর্থেই

সেনানিবাসগুলোর বাইরে প্রশাসনিকভাবে একেবারে অকেজো হয়ে পড়ল। এই শূন্যতা পূরণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ল, যদিও দেশের সামাজিক জীবনপ্রক্রিয়া পুরোপুরি ভেঙে পড়েনি তখনও। এ-অবস্থায় বঙ্গবন্ধুই যেন হয়ে পড়লেন সারা দেশের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ। কেননা তিনি একাত্তরের ৬ মার্চ বরং ইয়াহিয়া খানকেই নির্দেশ দিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে নেবার জন্যে। ১৭৫৭ সালের যুদ্ধের পর সেদিনই ছিল সম্ভবত প্রথম দিন, যেদিন বাঙালিরা নিজেরাই এ-অঞ্চলের শাসনভার হাতে তুলে নিল।

এ-সময়ে বাংলাদেশের কিছু অর্থনীতিবিদ দেশের অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে যে-সমস্যার সৃষ্টি হল, তাতে খুব বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়লেন। আর এই সমস্যাগুলোর মধ্যে ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণ, পাকিস্তানের টাকশাল থেকে পাকিস্তানি মুদ্রার সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবার কারণে স্টকের পরিমাণ, রফতানিনীতি, অর্থপরিশোধের নীতিমালা, কাঁচামালসহ প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি ইত্যাদি ঠিক রাখা।

ধানমণ্ডিতে অবস্থিত অধ্যাপক নূরুল ইসলামের বাসভবন রীতিমতো শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের অর্থ সচিবালয়ে পরিণত হল। আর ডঃ কামাল হোসেনের সার্কিট হাউসের বাসভবন হয়ে উঠল প্রশাসনের তৃতীয় কেন্দ্র। আমাদের অনেকে প্রতিদিনই অধ্যাপক নূরুল ইসলামের বাড়িতে নির্দিষ্ট সমস্যাবলি বিশ্লেষণের জন্যে মিলিত হতেন। সেখানে তাঁদের সঙ্গে থাকতেন বেশকিছু উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যাংকার। এঁদের অনেকেই ছিলেন সরকারি কর্মচারী ও ব্যাংক কর্মচারীদের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। আর বত্রিশ নম্বর ধানমণ্ডিতে বা কামাল হোসেনের বাড়িতে তাজউদ্দিন ও কামাল হোসেন প্রত্যেক সন্ধ্যায় মিলিত হতেন প্রচারসংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার জন্যে।

স্থানীয় অর্থনীতি বিশ্লেষণ ও তার সমাধানের চেষ্টা ছাড়াও আমাদের আরেকটি দায়িত্ব ছিল আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমগুলোকে আমাদের ইস্যুগুলো জানানো। প্রতিদিনই বিদেশী সংবাদসংস্থাগুলোর বাঘা বাঘা সাংবাদিকরা আসতেন এসব বৈঠকে। এঁদের মধ্যে ছিলেন *দি নিউইয়র্ক টাইমস*-এর টিলমান ও পেজি, *দি নিউইয়র্ক টাইমস*-এর আরেক সাংবাদিক সিডনি স্যানবার্গ, যিনি মুক্তিযুদ্ধের কাভারেজ দেবার কারণে পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঢাকা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন, এখন এই পত্রিকার সম্পাদক ; *গার্ডিয়ান*-এর মার্টিন এডেনি, *টাইমস*-এর পিটার হ্যাজেলহার্স্ট, *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর সেলিং হ্যারিসন এবং *ওয়াশিংটন স্টার*-এর হেনরি ব্রাডশার। এসব অভিজ্ঞ সাংবাদিকের সকলেই প্রতিদিন ঢাকা থেকে তাঁদের নিজ নিজ পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত খবর পাঠাতেন যাতে তাঁদের পাঠকরা বাংলাদেশে ক্রমশ প্রকাশ্য হয়ে উঠছে যে-নাটক, সে-সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন।

পিটার হ্যাজেলহার্স্ট আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি কিছুদিন আগে লারকানায় ভুট্টোর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। এই সাক্ষাৎকারে ভুট্টো তাঁকে বলেছেন যে, বাংলাদেশে কিছু শহরে রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে যে-বিক্ষোভ সংঘটিত হচ্ছে তা আসলে চায়ের কাপের ঝড় মাত্র। ঢাকার বিক্ষোভকারীদের ওপর সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে যে-

হত্যা ও সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে এবং নেতাদের অনেককে জেলে নেওয়া হচ্ছে—তা বিক্ষোভের মাত্রাকে কমিয়ে আনবে এবং আরও যুক্তিসঙ্গত আপস-মীমাংসার আবহাওয়া সৃষ্টি করবে। বুদ্ধিদীপ্ত এই কথাগুলো যেন বেদবাক্য, যা ভুট্টো সম্ভবত ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যোগাসাজশ করেই বলেছেন। আর এই পুরো ধারণাটিই মিথ্যে প্রমাণিত হয় যখন '৭১ সালের ২৫ মার্চ তারা রাস্তায় সেনাবাহিনী নামিয়ে দেয় সামরিক অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে। এ-সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্নেল ইসানি এবং টিক্কাভটির এস হুদা—যাঁরা উভয়েই ছিলেন পরস্পরের ভায়রা, নিয়মিত অধ্যাপক নূরুল ইসলামের বাসায় আসা-যাওয়া করতেন। কর্নেল ইসানি ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাদের সরবরাহের দায়িত্বে ছিলেন। কাজেই তিনি এরকম একটি অবস্থানে ছিলেন যে, তিনি ঢাকায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহকারীদের তালিকা পাঠাতে পারতেন। খাদ্য সরবরাহকারীদের এই তালিকা রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়, যারা পরে এইসব সরবরাহকারীদের সঙ্গে দেখা করে এবং ক্যান্টনমেন্টে খাদ্য-সরবরাহ কমিয়ে দেবার ক্ষেত্রে তাদের প্রভাবিত করে। ২৫ মার্চের সামরিক অভিযানের পর এইসব কর্মকাণ্ডের জন্যেই তাঁদের ওপর চরম দুর্ভোগ নেমে আসে। কর্নেল ইসানির ও হুদাকে পাকিস্তানি সৈন্যরা আটক করে নিয়ে যায়। হুদাকে আটক করা হয় ঢাকায় এবং এখানে তাঁকে ভয়ংকর নির্যাতন করা হয় জিজ্ঞাসাবাদের সময়। প্রচণ্ড নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তাঁকে এই স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করা হয় যে, অধ্যাপক নূরুল ইসলাম এবং আমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তিনি আওয়ামী লীগের জন্যে ভারতের সঙ্গে একটি টেলিযোগাযোগব্যবস্থা তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। সম্পূর্ণ সাজানো এই মামলাটি পরে একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর বিচারের সময় তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কর্নেল ইসানি আরও দুর্ভাগ্যের শিকার হন। তাঁকেও আটক করা হয় এবং পরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় লাহোরে। সেখানে তাঁকে অমানুষিক নির্যাতন করা হয় জিজ্ঞাসাবাদের সময় এবং বঙ্গবন্ধুর বিচারের সময় তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে তাঁকে বাধ্য করা হয়। এ-দুজনই এরকম দুর্ভাগ্যের শিকার হন স্রেফ অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও আমার সঙ্গে মার্চের সেই দিনগুলোতে জড়িত থাকার কারণে।

ইয়াহিয়া এবং মুজিবের সঙ্গে যখন আপস-মীমাংসা চলছিল, সে-সময়ে আওয়ামী লীগ দলের সঙ্গে আমাদের অনেককে যুক্ত করা হয়। আওয়ামী লীগ দলের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ এবং কামাল হোসেন প্রমুখ। এই দলের যা করবার কথা ছিল তা হচ্ছে, ইয়াহিয়ার বিশেষজ্ঞদলের সঙ্গে একটি মধ্যবর্তী সাংবিধানিক ব্যবস্থার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছানো। ইয়াহিয়া খানের বিশেষজ্ঞদলে ছিলেন মেজর জেনারেল পীরজাদা, জাস্টিস কর্নেলিয়াস এবং এম. এম. আহমেদ। আমরা প্রতিটি বৈঠকের পরই আওয়ামী লীগের দলটির সঙ্গে আলোচনায় বসতাম ইয়াহিয়ার দল যেসব পরামর্শ দিত সেগুলোর নোট নেওয়ার জন্যে। এ ছাড়াও আমাদের দায়িত্ব ছিল জবাব তৈরি করা বা আমাদের দলের পক্ষ থেকে বিকল্প ভাষ্য প্রস্তুত করার। এ-বৈঠকগুলো হত খুবই দীর্ঘ সময় ধরে, যেখানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত থাকতেন বঙ্গবন্ধু। এর মধ্যে একটি ছিল চরম পরিণতিমূলক

বৈঠক, যেটি অনুষ্ঠিত হয় মতিঝিলে ডঃ কামাল হোসেনের চেম্বারে। এ-বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের উচ্চপর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং এর উপলক্ষগণ। এঁরা সবাই পরের দিনের আলোচনায় ঐকমত্যের দৃঢ়তর অবস্থান খাড়া করবার জন্যে সারারাত কাজ করেন।

বৈঠকে আমাদের শেষ অংশগ্রহণ ছিল আগের দিন রাতে তৈরি-করা প্রস্তাবাবলির ওপর এম. এম. আহমেদ নিজের হাতে যেসব সংশোধন করেছেন তা নিয়ে বসা। ইয়াহিয়ার দল চূড়ান্ত যে-অবস্থান নেয় তাতে এটুকু ইঙ্গিত ছিল যে, অন্তত আঞ্চলিক ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে হয়তোবা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যাবে। আমাদের প্রত্যাশা ছিল, ২৪ মার্চ জেনারেল পীরজাদা ঐকমত্যে পৌঁছুনোর জন্যে শেষ বৈঠকে সমবেত হতে আমাদের আহ্বান জানাবেন। এমনকি পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে একটি ঘোষণাও তিনি দেবেন। পরবর্তী দুদিন আমাদের এই অপেক্ষাতেই কাটল যে, তিনি এই বৈঠকটি ডাকবেন। কিন্তু আমরা ২৫ তারিখেই জানতে পারলাম যে, এম. এম. আহমেদ আগের দিন রাতেই পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তিনিও এ-বৈঠকের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু আকস্মিকভাবেই হয়তো পীরজাদা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং তিনি জাস্টিস কর্নেলিয়াসের সঙ্গে ঢাকা ত্যাগ করতে পারেন। আপস-মীমাংসার সারসংক্ষেপ এখানে আর আলোচনা করছি না এজন্যে যে, পরে সে-বছরেই সাউথ এশিয়ান রিভিউ-র জন্যে লেখা আমার নিবন্ধ 'নেগোশিয়েটিং ফর বাংলাদেশ'-এ আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা ও ধারণার ইঙ্গিত দিয়েছি। ডঃ কামাল হোসেনও আলাদাভাবে এ-বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন, যেটি আরও নির্ভরযোগ্য। উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেও যে-প্রগতিশীল আবহ থাকে, ঐকমত্যের প্রক্রিয়া ক্রমশ তার বিরুদ্ধেই যাচ্ছিল। কেননা প্রতিদিনই বাংলাদেশের সেনানিবাসগুলোতে পাকিস্তানি সৈন্যদের সমাবেশ ঘটানো হচ্ছিল। সম্ভবত মার্চের শেষ সপ্তাহে মুঈদুল হাসান নামে আমাদের এক বন্ধু আমাকে জানালেন যে, বঙ্গবন্ধুকে দেবার মতো তাঁর কাছে একটি জরুরি মেসেজ আছে, যেটি তিনি ক্যান্টনমেন্টের একটি সূত্র থেকে পেয়েছেন। সে-সময়ে তিনি এই সূত্রের নাম প্রকাশ না করলেও পরে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে এই সূত্রটি হচ্ছেন এয়ার ভাইস মার্শাল খোন্দকার। সে-সময়ে তিনি ছিলেন পাকিস্তান এয়ারফোর্সের গ্রুপ ক্যাপ্টেন। যা-ই হোক, একদিন রাত দশটায় আমি মুঈদকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে নিয়ে গেলাম, যেখানে তিনি তাঁর সেই মেসেজটি বঙ্গবন্ধুকে দিলেন। মেসেজটি আর কিছুই নয়, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সামরিক অভিযান চালানোর জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। সম্ভবত তারা যুদ্ধ করবার জন্যেই তৈরি হচ্ছে।

যখন আপস-মীমাংসার সময় চলছিল, তখন আমার সুযোগ হয় পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) কয়েকজন নেতার সঙ্গে দেখা করবার। যতদূর মনে পড়ে, এঁদের মধ্যে ছিলেন এন. ডব্লিউ. এফ. পি.-র আবদুল ওয়ালি খান এবং বেলুচিস্তানের গাউস বক্স বেজেনজো। এঁরা ছিলেন দৈনিক সংবাদ-এর মালিক আহমেদুল কবিরের সঙ্গে। ওয়ালি খান এবং বেজেনজো দুজনেই আমাকে তাঁদের এই আশঙ্কার কথা জানালেন যে, ইয়াহিয়া, মুজিব এবং ভুট্টোর মধ্যকার আলোচনায় অহেই

হচ্ছে, পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশগুলোর স্বার্থকে অগ্রাহ্য করা। পাঠান এবং বেলুচদের এই আশঙ্কার বাস্তব কারণ হচ্ছে, ভুট্টো এইসব আলোচনার মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর পুরো সুবিধাটাই দাবি করছেন। আর এই সুবিধা–আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁর শক্তি হচ্ছে পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা। পূর্বাঞ্চলের জন্যে মুজিব যে–স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছেন, তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভুট্টোও স্রেফ পাঞ্জাব বা সিন্ধু নয়—পুরো পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান নির্বাহী হতে চাইছেন। অথচ এই পিপলস পার্টি এন. ডব্লিউ. এফ. পি. এবং বেলুচিস্তানের দুটো নির্বাচনী এলাকাতেই এ–দুটি দলের কাছে পরাজিত হয়েছে। ভুট্টো ভয় পাচ্ছিলেন যে, সংসদে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাঠান ও বেলুচদের জায়গা করে দেবে এবং কেন্দ্রের ক্ষমতা থেকে পিপলস পার্টিকে একবারে সরিয়ে দেবে।

এ ছাড়াও তাঁর ভয়, এ–পরিস্থিতি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসনের দিকে এগিয়ে দেবে, যা তাদেরকে পাঞ্জাবি নেতৃত্ব থেকেও একসময় সরিয়ে দিতে পারে। ন্যাপ নেতারা এদিকে ভয় পাচ্ছিলেন যে, পূর্বাঞ্চলে পুরো কর্তৃত্ব পাবার জন্যে মুজিব হয়তো পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট অঞ্চলগুলোর স্বায়ত্তশাসনের মূল্যে ভুট্টোকে পশ্চিমাঞ্চলের পুরো কর্তৃত্ব পাবার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারেন। যেহেতু এরকম ঘটছে, কাজেই মুজিবের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁদের আশঙ্কা কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিকই ছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবি শাসনে তাদের স্বায়ত্তশাসন হারাবার ভয়, প্রথমত ভুট্টোর এবং তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বে শুধুই কিছু ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হবার অপেক্ষায়।

আমার মন বলছিল, পাকিস্তানি জেনারেলরা দুমুখো খেলা খেলছে, যারা আসলে আপস–মীমাংসার নামে স্রেফ সময় নিচ্ছে বাংলাদেশের সেনানিবাসগুলোতে তাদের সৈন্য–সমাবেশ বাড়ানোর জন্যে। ২৪ মার্চ ন্যাপ নেতৃবৃন্দ এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ছোট ছোট দলগুলোর রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সকলেই ঢাকা ত্যাগ করলেন। তাঁরা ইঙ্গিত দিলেন যে, ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকে তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে যাবার নির্দেশ পেয়েছেন। তাঁরা আরও ইঙ্গিত দিলেন যে, সামরিক অভিযানের আর বেশি দেরি নেই।

২৫ মার্চ বিকেলে ৫টা কি ৬টার দিকে, তারিক আলির বাবা মাজহার আলি খান এবং একজন খ্যাতিমান সাংবাদিক যিনি *ফোরাম*–এ প্রায়ই কলাম লিখতেন তাঁকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ৩২ নম্বর ধানমণ্ডিতে গেলাম। সে–সময় পুরো বাসভবন ছিল সাংবাদিকে পরিপূর্ণ। এঁরা নিশ্চয় ধরেই নিয়েছেন যে, পাকবাহিনীর সঙ্গে আলোচনার সমস্ত পথ এখন রুদ্ধ।

মাজহার আলি খান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন। আমি তাঁকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম। আমার এ–ধারণা ছিল যে, সেখানে গিয়ে আমি প্রচণ্ড ভিড় দেখতে পাব—যেমন দেখি আমি বরাবর। বঙ্গবন্ধু মাজহারকে চিনতেন সেই সময় থেকে যখন তিনি *পাকিস্তান টাইমস*–এর সম্পাদক ছিলেন। সে–সময়ে এর মালিক ছিলেন মিয়া ইফতেখারউদ্দিন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে বেশ উষ্ণতার সঙ্গেই অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর ঘর খালি করে ফেললেন যাতে আমরা দুজন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি। বঙ্গবন্ধু

আমাদের জানালেন যে, সেনাবাহিনী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে তারা কঠোর ব্যবস্থা নেবে। তিনি কথা বলে যাচ্ছিলেন, আমি স্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি দেবার চেষ্টা করছি, "কুয়াশা মনে করেছে যে আমাকে হত্যা করলেই সে আন্দোলন ধ্বংস করে দিতে পারবে। কিন্তু সে ভুল করছে। আমার কবরের ওপর স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হবে।" বঙ্গবন্ধুর আচরণে তাঁকে বরং অদৃষ্টবাদী মনে হচ্ছিল, কারণ তিনি যেন তাঁর সম্ভাব্য অকালমৃত্যুকে মেনেই নিয়েছেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বললেন যে, নতুন প্রজন্ম এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নেবে। এই বৈঠকের পরপরই মাজহার আলি খান কোনো কোনো পিপিপি নেতা যে আসন্ন রক্তপাত বিষয়ে বলেছেন, সে–সম্পর্কে আলোচনা করলেন। বত্রিশ নম্বর থেকে আমরা মাহমুদ আলি কাসুরির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে গেলাম হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। স্বভাবসুলভ তর্জন–গর্জনে বরাবর কাসুরি সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন আমাদের। এবং অভ্যর্থনা জানাতে জানাতেই অভিযোগ করলেন, "এটা এখন স্পষ্ট যে আওয়ামী লীগ কোনো সমঝোতা চায় না।" অথচ আমি জানি যে, একটি খসড়া চুক্তিপত্র পত্রপত্রিকায় ঘোষণা দেবার অপেক্ষায় রয়েছে এখন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম কোথেকে তিনি এ–বিষয়ে নিশ্চিত হলেন। তিনি জানালেন, জেনারেল পীরজাদা তাঁকে বলেছেন। আবার সেই পীরজাদা যিনি আপস–মীমাংসার একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব। এটা ইতিমধ্যে প্রমাণিত যে, তারা পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতাদের অন্য গল্প শোনাচ্ছে এবং এদিকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তি প্রস্তুত করছে। কাসুরি বলে যাচ্ছিলেন—রাষ্ট্রের ঐক্য এখন বিপন্ন এবং এ–পরিস্থিতিতে যদি প্রয়োজন পড়ে তা হলে একই পদ্ধতিতে রক্তপাত ঘটানো হবে, যেভাবে লিংকন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করবার জন্যে একটি গৃহযুদ্ধের মোকাবিলা করেছিলেন। আমি কাসুরির ওখান থেকে চলে এলাম এটা মনে রেখে যে, তিনি ছিলেন বার্ট্রান্ড রাসেলের যুদ্ধ–অপরাধী ট্রাইবুনালের একজন খ্যাতনামা বিচারক, যিনি ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণহত্যাকে তুলে ধরেছিলেন। যদি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালিদের ওপর কঠোর ব্যবস্থার নামে গণহত্যা চালায়, আমি আশা করি যে তিনি ভিয়েতনামিদের জন্যে যা করেছিলেন, সেভাবেই বাঙালিদের পক্ষে সোচ্চার হবেন।

পাকিস্তানি জেনারেলদের দ্বিমুখী তৎপরতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই আমি সার্কিট হাউস রোডে কামাল হোসেনের বাড়িতে গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। আমি তাঁকে এই মেসেজটাই দিতে গেলাম যে, পীরজাদা নিশ্চয়ই পিপিপি নেতাদের কাছে আলোচনার সময় বানিয়ে কিছু বলেছেন এবং এখন তারা সামরিক অভিযানের জন্যে রীতিমতো প্রস্তুত। সেখান থেকে আমি গুলশানে আমার বাসায় গেলাম। সেখানে পৌঁছেই আমি সামরিক তৎপরতার খবর পেলাম। চিহ্ন হিসেবে দেখলাম কোনো কোনো সড়কে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরা বড় বড় ইটপাথর দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করেছে।

রাত ৯টা–১০টার দিকে আমরা প্রথম কামানের গোলার শব্দ শুনতে পেলাম। এই গোলার শব্দ আমাদের বুঝিয়ে দিল যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হাঁপিয়ে এবং পুলিশ ব্যারাকগুলোতে তাদের সামরিক হামলা শুরু করে দিয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বত্রিশ নম্বর ধানমণ্ডিতে ফোন করলাম এটা জানতে যে, বঙ্গবন্ধু নিরাপদে আছেন কি

না। আমি জানি না, ফোনে কে জবাব দিয়েছিলেন, তবে ফোনে কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল তিনি আশপাশেই আছেন। হঠাৎ অপর প্রান্ত নিশ্চুপ হয়ে গেল এবং এর কিছুক্ষণ পরই সমস্ত টেলিফোন লাইন ডেড হয়ে গেল।

পরবর্তী ৩৬ ঘণ্টা আমরা কামানের গোলা আর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের শব্দ শুনলাম, সেনাঅভিযানে সৈন্যদের অস্ত্রের আগুনের হুলকা দেখলাম এবং অবশেষে ২৬ মার্চ ইয়াহিয়ার ঘোষণা শুনলাম। আমাদের সকলের কাছে তখন এ-বিষয়টি স্পষ্ট যে, স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তবে এটা স্পষ্ট নয়, কবে এ-যুদ্ধ শেষ হবে।

পরবর্তী ৩৬ ঘণ্টা গুলশানে আমাদের বাড়িতে বন্দি থেকে টেলিফোন যোগাযোগবিহীন অবস্থায় আমরা শুধু গোলাগুলির শব্দই শুনেছি। ২৭ মার্চ সকালে প্রথমবারের মতো সাদ্ধ্য-আইন তুলে নেওয়া হল। কয়েকটি কারণে আমি প্রথমেই হাঁটতে হাঁটতে গুলশানে ফোর্ড ফাউন্ডেশন গেস্টহাউসে গেলাম। সেখানে থাকেন ড্যানিয়েল থার্নার। থার্নার একজন ভিজিটিং স্কলার। তিনি সরবোন থেকে পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অভ ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্‌সে এসেছেন। আমি তাঁর গাড়িতে আমাকে অবিলম্বে ধানমন্ডি নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলাম। সেখানে যাওয়ার একটাই কারণ, এটা নিশ্চিত হওয়া যে, অধ্যাপক নূরুল ইসলাম নিরাপদে আছেন কি না। যখন বাড়িতে ফিরে এলাম, দেখলাম আমার বন্ধু মুঈদুল হাসান এবং পাকিস্তান টোব্যাকোর এ. আলম আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। মুঈদ চাইলেন যাতে আমি তক্ষুনি আমার বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাই। তাঁর মতে, সেনাবাহিনী ব্যাপকহারে গণহত্যা শুরু করেছে। তিনি কামাল হোসেনের বাড়িতে যোগাযোগ করেছিলেন এবং যোগাযোগ করতে গিয়ে জানতে পেরেছেন যে, তাঁকে আটক করার জন্যে সেনাবাহিনী তাঁর বাড়িতে অবস্থান করছে এখন। কিন্তু যাঁকে আটক করার জন্যে সৈন্যরা গেছে—সেই কামাল বাড়িতে নেই।

আমি নিজকে অতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করিনি যে আমি সেনাবাহিনীর টার্গেটে পরিণত হতে পারি। যদিও কেউ-কেউ এরকম ধারণা করছিলেন, সৈন্যরা হয়তো তাঁদেরই খুঁজবে যাঁরা সক্রিয় রাজনীতিবিদ। যা-ই হোক, মুঈদ আমাকে পরামর্শ দিলেন যেন আমি এই সুযোগটা না নিই। তাঁর পরামর্শ ছিল, যেন আমি বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাই। এ-বিষয়টি আমি গুরুত্ব দিইনি এটা ভেবে যে, আমার উপস্থিতি আমার পরিবারের জন্যে কোনো হুমকি হবে না। কিন্তু আমার স্ত্রীর ধারণা ছিল অন্যরকম। তার ধারণা—যদি কিছু ঘটে, আমার উপস্থিতিই তাদের জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। আমি না থাকলেই বরং সে যে-কোনো সময় বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে পারবে যাতে আমি নিশ্চিন্তে স্বাধীনতাযুদ্ধের জন্যে কাজ করতে পারি। অতঃপর বেশ নিশ্চিন্তেই সেদিন ভোরে আমি আমার পরিবার ছেড়ে গুলশানেই অন্য একটি বাড়িতে চলে গেলাম। বিকেলে মুঈদ আমাকে খবর দিলেন, তিনি ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারগুলোতে গিয়েছিলেন, সেগুলো এখন গণহত্যার চিহ্ন বহন করছে। জগন্নাথ হলের উলটোদিকে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক এবং অধ্যাপক আনিসুর রহমানদের ফ্ল্যাটের পুরো ব্লকের মেঝে এবং সিঁড়ি রক্তে ভেসে যাচ্ছে এবং সেগুলো রীতিমতো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মুঈদ আরও যে-দুঃসংবাদটি দিলেন—সেটি হচ্ছে,

সৈন্যরা অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাককে মেরে ফেলেছে। এ ঘটনা জানবার পর আমি খুবই মুষড়ে পড়লাম। কিন্তু এটা এজন্যে নয় যে, অধ্যাপক রাজ্জাক আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ; আমার মুষড়ে পড়বার কারণ, এ-ঘটনা এটাই ইঙ্গিত করে যে, সেনাবাহিনী তাদের টার্গেট আরও বড় করেছে, তারা হয়তো এমন লোকেদেরও মারবে যারা সত্যি সত্যি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলির সঙ্গে সরাসরি জড়িত নন।

নতুন যে-বাড়িটিতে উঠেছি, ২৭ মার্চ আমি সেখানেই কাটালাম। পরের দিন সকালে মুঈদ আবার দেখা করতে এলেন আমার সঙ্গে। তিনি জানালেন যে, কার্যকরি জারির ঠিক পরপরই সৈন্যরা আমাকে আটক করবার জন্যে আমার বাড়িতে গিয়েছিল। পরে আমার স্ত্রীর মুখে শুনেছিলাম, কর্নেল সাইয়িদউদ্দিনের নেতৃত্বে দুই ট্রাক ভর্তি পাকিস্তানি সৈন্য আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল। এই কর্নেল নিজেকে 'এসই পার্টির' নেতা বলে দাবি করছিল। তার বক্তব্য অনুযায়ী এ-দলটিই ২৫ মার্চ রাতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।

পাকিস্তানি সৈন্যদের এই দলটি যখন আমাদের বাড়িতে আসে তল্লাশির জন্যে, তখন আমার বড় ছেলে তৈমুর বাড়িতেই ছিল। ওর বয়স তখন মাত্র ৮ বছর। কর্নেল সাইয়িদউদ্দিন ওকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। কিন্তু সে অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত সৈন্যদের সামনেও বেশ শান্ত ছিল। আমার স্ত্রী সালমা তৈমুরের জন্যেই ভয় পাচ্ছিল। সৈন্যরা যখন আমাদের বাড়ির সামনে এসে থামল, তাদের আওয়াজ পেয়ে সালমা বাড়ির পেছনদিক দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, বন্দুকের নল এড়াতে পারেনি ও।

কর্নেল সাইয়িদউদ্দিন আমাদের প্রতিবেশীদের কাছেও আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, জানতে চেয়েছিল, আমি কোথায় আছি। যখন সে জানতে পারল আমি আজ সকালেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি—তখন সে আমার স্ত্রী ও ছেলেদের ধরে ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে যেতে চাইল। ওর ধারণা ছিল, আমার স্ত্রী-সন্তানদের ধরে নিয়ে গেলে আমার খোঁজ পাওয়া সহজ হবে। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীরা তাকে এমনভাবে বোঝাল যে, সে তাদেরকে বাড়িতে রেখেই ফিরে গেল।

অপারেশনের প্রথম ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাকে আটক করতে গিয়েছিল—এটা শুনে আমি বেশ উদ্বেগ বোধ করলাম। কারণ এ-ঘটনা এটাই ইঙ্গিত করে যে, আমিও এখন তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট। মুঈদ আমাকে ঢাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবার জন্যে পরামর্শ দিলেন। ওঁর ধারণা এরপর আমাকে ধরবার জন্যে বাড়ি-বাড়ি সার্চ করা হবে। ফলে যারা আমাকে আশ্রয় দেবে তাদের জন্যেই ব্যাপারটা হবে খুব ঝুঁকিপূর্ণ। সেটা ছিল এমন একটা পরিস্থিতি যে, কী ধরনের লড়াই হবে বা এ-যুদ্ধে আমাদের কী ভূমিকা হবে—এ-সম্পর্কে আমাদের কোনো পূর্বধারণা একেবারেই ছিল না। আমি আমার স্ত্রীকে একটি চিরকুট পাঠালাম যেন সে ঢাকা ছেড়ে অন্য কোথাও, সম্ভব হলে দেশের বাইরে চলে যায়। কারণ, সে দেশের বাইরে চলে গেলে স্বাধীনতাযুদ্ধে আমি আরও নিশ্চিন্তে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারব।

ঢাকা ছেড়ে চলে যাবার আগে মুঈদ আমাকে গুলশানে মোকলেসুর রহমান (সিধু মিয়া)-এর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে আমরা নদী পার হয়ে গেলাম

বারাইদ গ্রামে—সিধু মিয়ার শ্বশুর মতিন সাহেবের বাড়িতে। গুলশান থেকে বারাইদ গ্রামের দিকে যেতে যেতে দেখলাম শুধু আমরাই নই, ঢাকা থেকে অসংখ্য লোক গ্রামের দিকে পালাচ্ছে। এই ভিড়ের মধ্যেই আমি আনিসুর রহমানকে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে ছুটে গেলাম। তিনিই আমাকে প্রথম ২৫ ও ২৬ মার্চের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিলেন। তিনি তখন আরও ভয়াবহ ঘটনার বর্ণনা দিলেন। তিনি জানালেন, কীভাবে সৈন্যরা তাঁদের ফ্ল্যাটে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে এবং স্টাটিসটিক্স্ বিভাগের অধ্যাপক মনিরুজ্জামানকে গুলি করে মেরেছে। অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা থাকতেন ফ্ল্যাটের নিচতলায়, আর অধ্যাপক মনিরুজ্জামান থাকতেন ফ্ল্যাটের একেবারে ওপরের তলায়। কিন্তু অধ্যাপক রাজ্জাক বেঁচে গেছেন স্রেফ ভাগ্যের জোরে। কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য ফ্ল্যাটের দোতলায় তাঁর দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল। তিনি দরজা খুলতে খানিকটা দেরি করে ফেলেছিলেন। ফলে দরজা খোলার আগেই, বাড়িতে কেউ নেই—এটা ভেবে সৈন্যরা চলে যায়। আনিস থাকতেন অধ্যাপক রাজ্জাকের ঠিক উলটোদিকের ফ্ল্যাটে। ভাগ্যক্রমে তিনিও বেঁচে যান। তবে তাঁর বেঁচে যাওয়ার কারণ হচ্ছে—তিনি তাঁর ফ্ল্যাটের একটি দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে রেখেছিলেন যাতে বাইরে থেকে মনে হয়, বাড়িতে কেউ নেই। আনিস তাঁর ফ্ল্যাটের মেঝেতে তাঁর স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে দুই রাত ও একদিন কাটিয়েছেন এবং বাইরে সিঁড়িতে সৈন্যদের ওঠা-নামা এবং মৃতদেহ সরানোর শব্দ শুনেছেন।

বারাইদে মতিন সাহেবের গ্রামের বাড়িতে আমরা আরও কয়েকজন বন্ধুর দেখা পেলাম। এঁদের মধ্যে ছিলেন জামিল চৌধুরী ও তাঁর পরিবার, মতিন সাহেবের মেয়ের জামাই মোকাম্মেল হক ও তাঁর পরিবার এবং ঢাকা টেলিভিশনের মোস্তফা মনোয়ার। বারাইদে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল—যেহেতু আমি এবং সম্ভবত আনিসও সেনাবাহিনীর সরাসরি টার্গেট, কাজেই আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত চলে যাওয়া উচিত। আর সেখানে গিয়ে আমাদের কাজ হবে বাংলাদেশে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমর্থনলাভের জন্য প্রচার চালানো।

২৯ মার্চের ভোরবেলা আনিসুর রহমান, মোস্তফা মনোয়ার এবং আমি মতিন সাহেবের আত্মীয়, এলাকার স্কুল-শিক্ষক রশিদ সাহেব ও রহমতুল্লাহ সাহেবের নেতৃত্বে সীমান্ত অতিক্রম করে আগরতলা চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। সিধু মিয়া আর মুন্সীদ নদীর তীর পর্যন্ত এসে আমাদের বিদায় জানালেন।

সেখান থেকে আমরা নৌকায় করে শীতলক্ষ্যা পাড়ি দিয়ে নরসিংদীর দিকে অগ্রসর হলাম। সমস্ত পথ জুড়েই আমরা একই দৃশ্য দেখতে পেলাম—ঢাকা থেকে মানুষ পালাচ্ছে দল বেঁধে। নরসিংদী এসে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে যেতে নদী পাড়ি দেবার জন্য আমাদের লঞ্চে উঠতে হল। এ-পর্যন্ত আমরা একটামাত্র দৃশ্যই দেখেছি—সৈন্যদের ভয়ে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে মানুষ। পথে এরকম গুজব শুনলাম যে, চট্টগ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু তাতে পুরোপুরি প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু হবার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। এজাতীয় ঘটনার প্রথম দৃশ্য আমরা দেখলাম যখন মেঘনা পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের পতাকাবাহী একটি লঞ্চ নরসিংদীতে এল যাত্রী নেওয়ার জন্য।

কিছুক্ষণ পরই আমরা দেখতে পেলাম, লঞ্চটি নদীর অপর তীর ধরে চলছে এবং যাচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে অনেক দূরে। এখানে কিছু ছাত্র লঞ্চে তাদের সঙ্গী হবার জন্য আমাদের অনুরোধ করল। এরকম এক পরিস্থিতিতে আমি বা আনিস, আমরা কেউই এই ভিড়ে পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের কাছে আমাদের পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়ে পড়তে পারে এ নিয়ে কোনো উৎকণ্ঠায় ছিলাম না। আমরা দ্বিধা করছিলাম আমাদের অধিক পরিচিতি নিয়ে যে, কীভাবে লোকজন তা গ্রহণ করবে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বিস্তারিত পরিচয় দেবার আগেই আমরা তীরে পৌঁছে গেলাম। তীরে এসে আমরা প্রত্যাশিত অবস্থায় পড়লাম। কারণ কিছু-কিছু লোক আমাদের পরিচয় নিয়ে অনিশ্চয়তা বোধ করছিল। পরিস্থিতি আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে এই আশঙ্কায় হঠাৎ করেই মোস্তফা মনোয়ার একটা বুদ্ধি বের করে ফেললেন। তিনি তাদের কাছে জানতে চাইলেন আশেপাশের গ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্র আছে কি না। তিনি বললেন, তাদেরকে ডেকে আনলে নিশ্চয়ই তারা তাদের শিক্ষকদের চিনতে পারবে। আনিস আর আমি বরং জানতে চাইলাম, সংগ্রাম পরিষদের কোনো স্থানীয় নেতার কাছে আমাদের নিয়ে যাওয়া সম্ভব কি না। এই বিশাল ভিড়ের মধ্যে বলার চাইতে তাঁর কাছেই বরং আমরা আমাদের পরিচয় স্বচ্ছন্দে বলতে পারব।

এ-সময়ে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের এক পিওন আমাকে চিনতে পারল। কারণ সে আমাকে বহুবার দেখেছে সেখানে। সে আমার সম্পর্কে বলবার পর জনগণ আমাদের প্রস্তাবে রাজি হল। অতঃপর আমাদের স্থানীয় একটি স্কুলে নিয়ে যাওয়া হল। এই স্কুলটি চলে সংগ্রাম পরিষদের এক নেতা যিনি নিজে একজন আওয়ামী লীগার—তাঁর এবং অন্যান্য কয়েকজনের নেতৃত্বে। সেখানে আমরা আমাদের বিস্তারিত পরিচয় দিলাম। কিন্তু এর পরও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছিল না যে, আমরা নিজেদের সম্পর্কে যে-পরিচয় দিচ্ছি তা সঠিক কি না। কেউ-কেউ আমার নাম শুনেছে বলে মনে করতে পারল। কিন্তু তার পরও আমাদের পরিচয় সম্পর্কে তাদের আশ্বস্ত করতে আমাদের অনেকটা সময় লেগে গেল। এ-অবস্থায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, আমরা বাইরে গিয়ে জনতার উদ্দেশে বলব, আমাদের পরিচয় সঠিক এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আমরা বাইরে আসতেই মুকতাদা নামে আনিসের এবং আমার এক ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র। ওর সঙ্গে ছিল ওর চাচাতো ভাই মোফাখখার। সে ইতিহাস বিভাগের ছাত্র। ওরা থাকে পাশের গ্রামে। মোস্তফা মনোয়ার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের খোঁজ করছিলেন তখনই এই খবর কীভাবে যেন শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। কয়েক মাইল ছুটে তারা শুধু এসেছে আমরা যে-পরিচয় দিয়েছি সেটা নিশ্চিত করতে।

আমাদের পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে উঠলাম সেই এলাকাটিতে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল আমাদের। সেই অবস্থায় একটি গুজব সারা গ্রামে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল যে, আমরা যে জায়গাটিতে ছিলাম সেখানে অসংখ্য লোক এসে জমা হতে শুরু করল। যা-ই হোক, ভাগ্যক্রমে সেই গুজব থামানো গেল। কিন্তু যদি পরিচয় গোপন রাখার প্রয়োজন পড়ে—সেই সম্ভাবনা টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা স্থানত্যাগ করব—এই সিদ্ধান্ত নিলাম।

স্থানীয় নেতারা আমাদের এরকম বলেছিলেন যে, গ্রামবাসী এখন একটাই সতর্ক অবস্থায় আছে যে, পাকিস্তানি সৈন্য বা তাদের দোসর ঘাতকদের দেখলেই তারা

আটক করবে। স্থানীয় জনগণ হাতের কাছে যেসব অস্ত্র পেয়েছে সেসব নিয়েই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এ ছাড়াও তারা রাত্রিকালীন কড়া পাহারারও ব্যবস্থা করেছে। এ সত্ত্বেও এটাই আমাদের দেখা সবচাইতে বড় প্রমাণ যে, বাংলাদেশের গ্রামের জনগণ গত চার সপ্তাহ ধরে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করবার জন্য বেশ ভালোভাবেই নিজেদের সংগঠিত করেছে। সারা দেশেই তারা সংগঠিত হয়েছে স্থানীয় নেতৃত্বে।

এই এলাকা থেকে মুকতাদা ও মোফাখখার আমাদেরকে তাদের গ্রামে মোফাখখারের ভাই অধ্যাপক নোমানের (ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল) বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখানে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্দেশে রওনা দেব এবং সেই ভ্রমণ হওয়া উচিত রাতের বেলায়। কারণ আমাদের আশঙ্কা—নিশ্চয়ই পাকিস্তানি সৈন্যরা নদী পাহারা দেবে। ৩০ মার্চ ভোররাতের দিকে নৌকায় করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যাবার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিলাম। আমাদের সঙ্গী হল মুকতাদা, মোফাখখার ও তার বড় ভাই রেডিও পাকিস্তানে কর্মরত মোহদ্দেস। রশিদ ও রহমতউল্লাহ সেখানে আমাদের বিদায় জানাল। আমরা তাদের অনুরোধ জানালাম যেন তারা আমাদের পরিবারের কাছে আমাদের খবর পৌঁছে দেয়।

৩০ মার্চ সকালে আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছুলাম। প্রথমেই যে-জিনিসটি আমাদের চোখে পড়ল সেটি হচ্ছে, শহরের রাস্তা পাহারা দিচ্ছে সেনাবাহিনীর একটি জীপ, যেটিতে উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা। সে-সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের অংশ। এটা বোঝা গেল যে, শহরটি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আমরা তাদের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলাম। সেদিন বিকেলেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিতাস গ্যাস কোম্পানির রেস্ট হাউসে নিয়ে যাওয়া হল আমাদের। সেখানেই আমি প্রথম দেখি বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর থালেদ মোশাররফকে। তিনি আমাদের বললেন, কীভাবে তাঁর ইউনিট তাদের পাকিস্তানি কমান্ডিং অফিসারকে গ্রেফতার করেছে এবং মুক্ত করেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে। এখন তারা পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করার পরিকল্পনা করছে।

মেজর মোশাররফ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ঘুরে দেখানোর জন্য আমাদের সঙ্গে নিলেন। তারপর যখন রাত হয়ে এল, তিনি আমাদের তিনজনকেই তেলিয়াপাড়া টি এস্টেটের কাছে তাঁর কমান্ড পোস্টে আমাদের নিয়ে গেলেন। এটি ছিল তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। পুরো এলাকা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। পাকিস্তানি এয়ারফোর্সের বিমান-আক্রমণ হতে পারে ভেবেই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। চা-বাগানের ম্যানেজারের বাংলার সমস্ত বাতি ছিল নেভানো। মেজর মোশাররফ সেখানে তাঁর ব্যাটেলিয়নের দুর্দশার কথা বর্ণনা করলেন। তিনি আমাদের আরও জানালেন কীভাবে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে তাঁর বাঙালি সহকর্মীদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন কুমিল্লা সেনানিবাসে। অন্যান্য এলাকার প্রতিরোধযুদ্ধে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন না তিনি। ফলে অন্যান্য এলাকার প্রতিরোধযুদ্ধ সম্পর্কে খুব বেশি ধারণা ছিল না তাঁর।

সেদিন রাতে চা-বাগানে আমরা সবাই রেডিওতে শুনলাম, প্রবাসী বাঙালিরা স্বাধীনতাযুদ্ধের জন্য অস্ত্র কিনতে টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করছে। মোশাররফ পরামর্শ দিলেন যেন আমরা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যাই এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে আরও যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করার জন্য প্রবাসী বাঙালিদের কাছে অনুরোধ পৌঁছে দিই।

এ ছাড়াও তিনি আরও পরামর্শ দিলেন যেন প্রবাসী বাঙালিদের জোগাড়-করা অর্থ বিদেশী অস্ত্রসংগ্রহে তাঁদের সহায়তা করি। মোশাররফ তাঁর এই উপলব্ধির কথা আমাদের জানালেন যে, যদি অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ তাঁরা না পান, তা হলে মুক্তিযোদ্ধারা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছে তারা মার খাবে। তিনি আমাকে আরও বললেন, এখন তিনি ও তাঁর অফিসাররা বিদ্রোহীর পর্যায়ে আছেন। কাজেই বেসামরিক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তাঁরা প্রয়োজনীয় নির্দেশ চান। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল সৈন্য ও অফিসারকে স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে পুনরায় কমিশন প্রদান করা উচিত। থালেদ মোটেও বুঝতে পারেননি যে, এসব কর্মকাণ্ড সম্পাদন করার ক্ষমতা আমার নেই। তবু আমি তাঁকে জানালাম, যদি আমার সঙ্গে নির্বাচিত কোনো রাজনৈতিক নেতার দেখা হয় তা হলে আমি তাঁকে তাঁর এই মেসেজ অবশ্যই পৌঁছে দেব। আমরা তখন সকলেই সৈনিকদের কর্তব্যপালনে ভীষণভাবে মুগ্ধ। কারণ এরা নিজেদের পরিবারবর্গকে সেনানিবাসে ফেলে শ্রেফ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মরণপণ যুদ্ধ করছে।

৩১ মার্চের সকালে মেজর মোশাররফ ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা যাবার সীমান্তে পৌঁছে দিতে আমাদের জন্য একটি জীপের ব্যবস্থা করে দিলেন। ওখানে গিয়ে এটাই মনে হল যে, ততদিন সীমান্ত হয়ে উঠেছে খুবই নিষ্কণ্টক, ফলে অসংখ্য লোক বেশ নির্বিঘ্নেই তা অতিক্রম করতে পারছে।

আগরতলা গিয়ে আমরা জানতে পারলাম যে অজস্র নিরুপায় বাংলাদেশী স্পোর্টস স্টেডিয়ামে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে আমরা এম. আর. সিদ্দিকী, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ছাড়াও আওয়ামী লীগের বেশকিছু এমপি ও কর্মী এবং ছাত্রের দেখা পেলাম যাঁরা চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লা থেকে এখানে এসেছেন। সেখানে পৌঁছেই জানা গেল, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যাবেলায়ই এম. আর. সিদ্দিকী ও তাহেরউদ্দিন ঠাকুর দিল্লি যাচ্ছেন। সেখানে তাঁরা ভারত সরকারের কাছে গণহত্যার প্রকৃত তথ্য তুলে ধরবেন এবং সাহায্যের জন্য অনুরোধ করবেন যাতে প্রতিরোধযুদ্ধ স্থায়ী করা যায়। সিদ্দিকীই বললেন, অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা বেঁচে আছেন কি না বা বেঁচে থাকলেও কোথায় আছেন তা তিনি জানেন না। তিনি নিজে চট্টগ্রামে প্রতিরোধ সংগঠিত করবার কাজে জড়িত এবং ত্রিপুরা এসেছেন শ্রেফ সামরিক সহায়তা চাইবার জন্য যাতে চট্টগ্রামে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়।

সিদ্দিকী ও ঠাকুরের সঙ্গে বৈঠকের পর এটাও জানা গেল যে, তাঁরা দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের খুব অল্প ক'জনকেই চেনেন। ফলে তাঁদের ধারণা, বেশকিছু খ্যাতনামা ভারতীয় অর্থনীতিবিদের সঙ্গে আমাদের যে যোগাযোগ আছে, তা হয়তো বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরবার ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কাজেই সেদিন সন্ধ্যায় এম. আর. সিদ্দিকীর সঙ্গে একই ফ্লাইটে দিল্লি যাওয়ার জন্য আমাদেরও অনুরোধ করা হল। অবশেষে আমি আমার একমাত্র সম্বল—ধার করে আনা পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরেই আগরতলা থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিলাম।

৩১ মার্চ ১৯৭১ রাতে দিল্লি পৌঁছুলাম আমরা। সেখানে পৌঁছেই আমি আর আনিস অমর্ত্য সেনকে ফোন করলাম। তিনি তখন দিল্লি স্কুল অভ ইকনোমিক্সের অধ্যাপক। ফোন পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ও তাঁর স্ত্রী চলে এলেন এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পরদিন সকালে অধ্যাপক সেন আমাদের নিয়ে গেলেন ডঃ অশোক মিত্রের বাসভবনে। ডঃ মিত্র তখন ভারত

সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকারের অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন)। যা-ই হোক, ডঃ মিত্র আরেক ধ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ডঃ পি. এন. ধরকে অবিলম্বে সেখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। অধ্যাপক ধর তখন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সচিব। তাঁর কাছেই আনিস আর আমি এই গণহত্যার প্রকৃত কারণগুলো যতটা জানি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলাম। এ ছাড়াও বললাম, ঢাকায় কী পরিমাণ হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে এবং বাংলাদেশের জনগণ যে তাদের প্রতিরোধ করছে তা কী অবস্থায় আছে। অধ্যাপক ধর এরপর আমাদের নিয়ে গেলেন শ্রী পি. এন. হাকসারের কাছে। শ্রী হাকসার তখন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। তাঁর কাছেও আমরা একইভাবে বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করলাম।২

আমি নিশ্চিত নই, স্বাধীনতাযুদ্ধ বিষয়ে ভারত সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের এটাই প্রথম পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা কি না। তবে এটা জানা গেছে যে, আমরা যখন দিল্লিতে পৌঁছাই, প্রায় সেই সময়েই ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সঙ্গে তাজউদ্দিন আহমেদও দিল্লিতে এসে হাজির হন এবং ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আরও বেশি কর্তৃত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট তৈরি করতে সক্ষম হন। দিল্লিতে পৌঁছানোর অল্প সময়ের মধ্যেই আমি তাজউদ্দিন আহমেদের সংস্পর্শে আসি। তিনি আমাকে জানালেন যে, তাঁর দলীয় সহকর্মীদের কেউ বেঁচে আছেন কি না, তা তিনি নিজেও জানেন না। তিনি এও জানালেন, কীভাবে আমীর-উল ইসলাম, ডঃ কামাল হোসেন এবং তিনি নিজে ২৫ মার্চ রাতে সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার খবর পেয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গেলেন এবং তাঁকে তাঁদের সঙ্গে আরও নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁদের সঙ্গে যেতে রাজি হলেন না। তিনি বরং তাঁদের পরামর্শ দিলেন গোপন জায়গায় লুকিয়ে পড়ার জন্য। তাজউদ্দিন ও আমীর-উল ইসলাম তখন কামাল হোসেনের কাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়েন। আর কামাল হোসেন লুকোনোর চেষ্টা করেন ধানমন্ডিতেই এবং এক পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। তাজউদ্দিন ও আমীর-উল ইসলাম তখন একই সঙ্গে কুষ্টিয়া হয়ে সীমান্ত অতিক্রমের জন্য মনস্থির করে ফেলেন।

আমরা যখন দিল্লিতে একত্রিত হলাম, ঠিক তখনই রেডিও মারফত জানতে পারলাম যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ডঃ কামাল হোসেনকে গ্রেফতার করেছে। এই খবরে আমরা খুবই বিচলিত হয়ে পড়লাম। যা-ই হোক, ততদিনে আমরা খবর পেতে শুরু করলাম যে, একের পর এক আওয়ামী লীগের উর্ধ্বতন নেতারা সীমান্ত অতিক্রম করে এপারে আসতে শুরু করেছেন। তাজউদ্দিন আহমেদ ছিলেন খুবই উদ্বিগ্ন—কত দ্রুত তিনি সীমান্তে উড়ে যাবেন এবং তাঁর দলীয় সহকর্মীদের সঙ্গে মিলিত হবেন এই নিয়ে। তিনি আরও উদ্বিগ্ন ছিলেন এ নিয়েও—কতক্ষণে তাঁদের নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন করবেন এবং মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেবেন।

এরকম একটি সরকারের ঘোষণা দেবার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই অনুভব করলাম, একটি আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণার খসড়া তৈরি করা দরকার। অবশ্য এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে প্রথমে আওয়ামী লীগের আবদুল হান্নান এবং পরে মেজর জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম রেডিও থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা জনসাধারণ্যে প্রচার করা হয়েছে। এখন শুধু এ-দুটোকে মিলিয়ে স্বাধীনতার একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন।

স্বাধীনতার ঘোষণার খসড়া তৈরি করা ছাড়াও ঘোষণাপত্রের প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশের জনগণের ওপর পাকিস্তানি সৈন্যদের গণহত্যার বিষয়টি উল্লেখ করে একটি পৃথক বিবৃতি তৈরি করার জন্যও তাজউদ্দিন আহমেদ আমার ওপর দায়িত্ব দিলেন। এই দায়িত্ব আমি নিলাম খুবই ভয়ে ভয়ে, কেননা এ-কাজগুলো একসময় ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হবে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটির যে-খসড়াটি আমি তৈরি করলাম, তাতে মূল ঘোষণার সমস্ত কিছুই রাখা হল। পাশাপাশি বাংলা সংশোধনের অনুরোধ অনুযায়ী এটিও উল্লেখ করলাম যে, যেসব বাঙালি প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীতে ছিল এবং এখন একাত্তরের ২৫ মার্চের পর থেকে বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা সকলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নবগঠিত সেনাবাহিনীতে পুনরায় কমিশনপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে।

যদিও আমি জেনেছিলাম এ-ধরনের দলিলের আইনগত দিকগুলো ঠিক করার জন্য আমার তৈরি ঘোষণাপত্রের মূল খসড়া সংশোধন করা হবে, তবুও আমার মূল খসড়ার কোনো কোনো জায়গা ঘোষণাপত্রের মর্মবাণী রক্ষা করছিল। যা-ই হোক, ঘটনার প্রেক্ষাপটে আমার খসড়া যা ছিল হবহু তা-ই রাখা হল, এবং ১৪ এপ্রিল কুষ্টিয়ার আম্রকাননে, যেটি এখন মুজিবনগর নামে পরিচিত—বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পর তাজউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এই ঘোষণাপত্র সারা বিশ্বের কাছে উত্থাপন করলেন। একটি কথা বলা দরকার, যা এখন প্রায়ই উদ্ধৃত করা হয়, তা হচ্ছে এই যে 'এক পাহাড় পরিমাণ লাশের নিচে পাকিস্তানের কবর রচিত হল' এই অনুভূতিই সে-সময়ে নাড়া দিয়েছিল আমাকে এবং আমার কার্যকলাপের মধ্যে তার মর্মকথাই রক্ষিত হয়েছিল।

তাজউদ্দিন ও আমীর-উল ইসলামের সঙ্গে যখন ছিলাম তখনই একদিন বিবিসিতে শুনলাম যে, ইয়াহিয়া খানের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এম. এম. আহমেদ ওয়াশিংটন যাচ্ছেন পাকিস্তানের দাতাদেশগুলোর কনসোর্টিয়ামে তাদের সাহায্য অব্যাহত রাখার আবেদন নিয়ে। তাজউদ্দিন বুঝতে পারলেন যে, সাহায্যের নামে পাকিস্তানে যুদ্ধ-প্রক্রিয়ায় কোনোরকম সহায়তাকে আমাদের সকল রাজনৈতিক শক্তির বিনিময়ে হলেও প্রতিহত করতে হবে।

তাজউদ্দিন আমাকে দায়িত্ব দিলেন, অবিলম্বে লন্ডন ও ওয়াশিংটন যাওয়ার জন্য, যাতে ওখানে গিয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পাকিস্তানের প্রধান দাতাদেশগুলোর কাছে তাদেরকে এ-ধরনের সাহায্যপ্রদান বন্ধ রাখার জন্য প্রচার চালাতে পারি। আমার দ্বিতীয় কাজ ছিল, পাকিস্তানের কূটনৈতিক মিশনগুলোতে কর্মরত সকল বাঙালি কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাঁদের সমর্থন দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। আমার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশন—যেখানে অসংখ্য বাঙালি কর্মচারী রয়েছে, তাদের সমর্থন আদায় করা। কারণ, তাদের সমর্থন বাংলাদেশের পক্ষে প্রচার চালানোর পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে লন্ডনে যাবার সুযোগ হল আমার। লন্ডনে গিয়ে আমি জানতে পারলাম যে, আমার স্ত্রী ও তিন ছেলে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা এখন আমার স্ত্রীর বোনের সঙ্গে জর্ডানে রয়েছে। এই খবর আমার জন্যে ছিল খুবই আনন্দদায়ক। কারণ আমি এখন নিশ্চিন্তে এবং স্বাধীনভাবে প্রকাশ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে কথা বলতে পারব। লন্ডনে আমি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তিনি তখন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস

চ্যালেঞ্জের। লন্ডনে তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে তাঁর সমর্থন ঘোষণা করেছিলেন এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন।

লন্ডনে আমার যোগাযোগ ছিল ব্রায়ান ল্যাপিং নামে এক সাংবাদিকের সঙ্গে। তাঁর মাধ্যমে আমি ব্রিটিশ লেবার পার্টির সংসদীয় এলাম এবং হাউস অভ কমন্সে লেবার পার্টির একদল সদস্যের উদ্দেশে বক্তৃতা করলাম। আমি তাঁদের অনুরোধ করলাম, কনজারভেটিভ সরকার যাতে পাকিস্তানে নতুন সাহায্যপ্রদান স্থগিত রাখে তার জন্য তাঁরা যেন সরকারের প্রতি চাপ প্রয়োগ করেন। তাঁরা ছিলেন আমার প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। পাশাপাশি আমি দেখা করলাম ডেনিস হিলির সঙ্গেও। হিলি তখন হাউস অভ কমন্স সভায় লেবার পার্টির বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধি।

টোরি সরকারের সিনিয়র এমপি স্যার ডগলাস ডড্স্ পার্কারের মাধ্যমে আমি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। স্যার পার্কার আমার স্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে আমি পররাষ্ট্র সচিব স্যার এলিস ডগলাস হোমেরও সংস্পর্শে এলাম। স্যার হোমও আমার স্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে পরিচিত। ডড্স্ পার্কার আমাকে বললেন, তিনি পররাষ্ট্র সচিবকে বাংলাদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন। এবং তিনি তা করলেনও। কিন্তু এসব ব্যাপারে পররাষ্ট্র সচিবের পক্ষ থেকে আমার সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগই করা হল না। সম্ভবত একটি বিদ্রোহী সরকারের মুখপাত্রের সঙ্গে বৈঠক করার মতো রাজনৈতিক ঝুঁকি তিনি নিতে চাইছিলেন না। এর পরও আমি তাঁর ব্যক্তিগত সচিব নিকোলাস ব্যারিংটনের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম এবং যথারীতি এবারও ব্যর্থ হলাম। বলা দরকার, নিকোলাস ব্যারিংটনের সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল। যা-ই হোক, এই ব্যারিংটনই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পররাষ্ট্র সচিবকে পৌঁছানোর ব্যাপারে খুব সাহায্য করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে আসল ঘটনার সূত্রপাত ঘটল ওয়াশিংটনে, যখন এম. এম. আহমেদ সেখানে গিয়ে পৌঁছুলেন। আমরা জানতে পারলাম যে, পাকিস্তানি সরকারের বহিঃসম্পদের পরিমাণ কমে গেছে। পাট রফতানির মাধ্যমে আয় এবং জাতীয় রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থ ছাড়াও যুদ্ধে টিকে থাকার জন্য পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন।

এপ্রিলের শেষদিকে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছুলাম। সেখানে পৌঁছেই আমি নিউইয়র্কে ছুটলাম অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও অধ্যাপক আনিসুর রহমানের কাছে—যাঁরা উভয়েই নিজেদের মতো করে আকস্মিকভাবে আমার জন্যই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছেন। ঢাকার বাইরে অধ্যাপক ইসলামের এটা ছিল খুবই নাটকীয় ভ্রমণ। তিনি অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের আগে দিল্লিতে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

নিউইয়র্ক থেকে হারুন-উর রশিদের সঙ্গে আমি ওয়াশিংটনের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। হারুন-উর রশিদ ছিলেন একজন সিএসপি অফিসার এবং তিনি তখন বিশ্বব্যাংকে কর্মরত। ওয়াশিংটনে এ. এম. এ. মুহিত আমাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করলেন। তিনি তখন ছিলেন পাকিস্তান দূতাবাসের ইকনমিক মিনিস্টার। সেদিনই সন্ধ্যায় আমি ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মচারীদের সঙ্গে মিলিত হলাম। এঁরা সকলেই অভিজাত গোষ্ঠীর, যাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন এনায়েত করিম, শামসুল কিবরিয়া—যাঁরা পরে পররাষ্ট্র সচিব হয়েছিলেন, ছিলেন অধ্যাপক আবু রুশদ মতীনউদ্দিন—তিনি তখন সেখানে শিক্ষাবিষয়ক অ্যাটাশে, ছিলেন মোয়াজ্জেম আলী—সম্ভবত তখন তিনি থার্ড সেক্রেটারি ; এ ছাড়াও ছিলেন বেশ কয়েকজন নন-পিএফএস

অফিসার, যেমন—রুস্তম আলি, রাজ্জাক খান এবং শরিফুল আলম প্রমুখ। সে-সময়ে এঁদের কেউই বিদ্রোহ করেননি। এঁরা সকলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতি তাঁদের পরিপূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। বলা দরকার, এঁদের অনেকেই তখন গোপনে কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলার জন্য। আমি তাঁদের কাছে দলত্যাগ করার তাজউদ্দিন আহমেদের মেসেজ পৌঁছে দিলাম। তাঁরা সকলেই পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করার জন্যে তখন প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জনগণের ত্যাগ সম্পর্কে তার আগে নিশ্চিত হতে চাইছিলেন। যা-ই হোক, তাঁরা সে-অবস্থায় বিদ্রোহ করবার ক্ষেত্রে বেশকিছু সমস্যার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশের পক্ষে গোপনে প্রচার চালাতে রাজি হলেন। এই সময়েই, রাজ্জাক খান এবং শরিফুল আলম বাংলাদেশের ছাত্র মোহসীন সিদ্দিকীকে নিয়ে প্রকাশ্যেই আমাকে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে এলেন। প্রেস, টিভি এবং কংগ্রেসিদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরির ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্যই তাঁরা মূলত এগিয়ে এলেন। প্রেস বা টিভির সাহায্য আমাদের প্রয়োজন ছিল এজন্যে যাতে আমি পাকিস্তানের প্রতি সাহায্য বন্ধ রাখার জন্য দাতাদের কাছে আমার মেসেজ পৌঁছাতে পারি। আমাকে বাংলাদেশ বিষয়ে কথা বলবার জন্য বেশ কয়েকবার টিভিতে সুযোগ দেওয়া হল। এর ফলে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ ব্যাপক প্রচার পেল। আর এ-কাজে আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করলেন খ্যাতনামা সাংবাদিক এবং টিভি ভাষ্যকার ওয়ারেন ইউনা। তখনও পর্যন্ত রাজ্জাক এবং আলম পাকিস্তান দূতাবাসের কর্মী থাকা সত্ত্বেও তাঁরা অনেকটা আমার সচিবালয়ের মতো কাজ করছিলেন। পত্রিকাজগতের বিশিষ্ট সাংবাদিকদের সঙ্গে আমি দেখা করলাম। আমি বিশেষভাবে দেখা করলাম, *ওয়াশিংটন স্টার*-এর হেনরি ব্রুভশার, *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর লুইস সাইমন, *ব্যাল্টিমোর পোস্ট*-এর অ্যাডাম কাইমার, *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর বেন ওয়েলস এবং অভিজাত সাপ্তাহিক *নিউ রিপাবলিক*-এর সম্পাদক গিলবার্ট হ্যারিসনের সঙ্গে। ওয়াশিংটনে এগুলোই তখন উল্লেখযোগ্য কাগজ। এসব কাগজের কলাম-লেখকরা এবং এই কাগজগুলোর নেতৃস্থানীয় লেখকরাই কংগ্রেসিদের মতামতকে যথাসম্ভব প্রভাবিত করতে পারেন। কাজেই এটা ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি বড় রকমের ভড়্যাঁন। কেননা, এমন এক সময়ে চার-চারটি কাগজে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়, যখন এম. এম. আহমেদ ঘটনাচক্রে ওয়াশিংটনে এসে উপস্থিত। সম্পাদকীয়গুলোতে মার্কিন সরকারের কাছে এই অনুরোধ করা হয়, যেন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশে অব্যাহত গণহত্যার কারণে পাকিস্তানে তাদের সাহায্যপ্রদান বন্ধ রাখে।

কংগ্রেসেও আমি একইভাবে কাজ চালিয়ে গেলাম। এখানে আমি বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি দুজন কার্যকর সমর্থকের সংস্পর্শে এলাম, এঁদের একজন সিনেটর এডোয়ার্ড কেনেডি এবং অপরজন ফ্রাংক চার্চ। এঁরা দুজনেই সিনেট ফরেন রিলেশন্স কমিটির মর্যাদাসম্পন্ন সদস্য। অল্প সময়ের মধ্যেই সিনেটর চার্চের সহকারী টম ডাউন এবং সিনেটর কেনেডির সহকারী গেরি টিংকার ও ডেল ডেইহান আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সক্রিয় মুখপাত্রে পরিণত হলেন। তাঁদের মাধ্যমে আমি বেশ কয়েকজন সিনেট সদস্যের সঙ্গে দেখা করলাম।

সে-সময়ে কেনেডি, চার্চ ও গ্যালাগারের নেতৃত্বে হাউস অভ রিপ্রেজেন্টেটিভসে কংগ্রেসম্যান ও সিনেটররা বাংলাদেশের যুদ্ধের পক্ষে কথা বলতে শুরু করলেন এবং সরকারের কাছে দাবি জানালেন বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার নিন্দা জানানোর

জন্য। তাঁরা পাকিস্তানে মার্কিন সাহায্য দেওয়া যায় কি না তা খতিয়ে দেখার জন্যও অনুরোধ করলেন। ২৬ মার্চের পর বাংলাদেশ থেকে যেসব মার্কিন নাগরিক দেশে চলে এসেছিল, তাদের প্রেরিত অনেক চিঠিপত্র, দলিল এবং কাগজপত্রও কংগ্রেশনাল নথিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

ঠিক সে-সময়েই আমি জানতে পারলাম যে, পাকিস্তানের কিছু পুরোনো বন্ধু সিনেটর সিমিংটনের নেতৃত্বে এম. এম. আহমেদের সম্মানে এক চাচক্রের আয়োজন করছেন যাতে তিনি সেখানে পাকিস্তানের পক্ষে তাঁর বক্তব্য সিনেটরদের উদ্দেশে পেশ করতে পারেন। এম.এম. আহমেদ বেশ একটা সুযোগ পেলেও আমাদের বন্ধুদের ধারণা ছিল যে এটা সামলানো যাবে। যেহেতু চার্চ ও কেনেডি উভয়েই ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, কাজেই ঠিক করা হল যে, একজন নির্দলীয় সিনেট সদস্যকে উদ্বুদ্ধ করা হবে আমাকে উদ্দেশ করে একটি লাঞ্চের আয়োজন করবার জন্য। আমাদের ধারণা, এটা হলে, তা রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট—উভয় দলের লোকদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হবে। ওহাইও'র সিনেটর স্যাক্সবি এ-ধরনের একটি লাঞ্চের আয়োজন করতে রাজি হলেন। এবং সত্যি সত্যিই এটি শেষ পর্যন্ত একটি বিশাল অনুষ্ঠানে পরিণত হল এবং এম. এম. আহমেদের অনুষ্ঠানটির চাইতেও অনেক বেশিসংখ্যক মর্যাদাসম্পন্ন সিনেটর এ-অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে অন্যান্যকে ছাড়াও আমি পেলাম সিনেট ফরেন রিলেশনস কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর চার্চ ফুলব্রাইট এবং রিপাবলিকান পার্টির সংখ্যালঘুদের নেতা সিনেটর স্কটকে। মার্কিন রাজনীতির এইসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি পাকিস্তানিদের গণহত্যার বিস্তারিত ঘটনা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন। অনুষ্ঠানে এও বলা হল যে, যতদিন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রধান দাতাদেশের ভূমিকায় থাকবে, ততদিন পর্যন্তই পাকিস্তানিদের দুষ্কর্মে সাহায্য করা হবে। সিনেটে অবিলম্বে এইসব পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে স্যাক্সবি-চার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্য বিল সংশোধনের উদ্যোগ নিলেন এবং পাকিস্তানে মার্কিন সাহায্য বন্ধের উপক্রম হল। যদিও শেষ অবধি বাংলাদেশে যতদিন গণহত্যা চলেছিল মার্কিন সাহায্য ততদিন অব্যাহত ছিল। কিন্তু এ সবই গল্পের পরবর্তী অংশ এবং তখন আমাদের জন্য আরও বেশি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়ল।

সিনেটে আমাদের সাফল্যের পরপরই আমরা শুনতে পেলাম যে, ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে এম. এম. আহমেদ একটি সংবাদ সম্মেলন করবার উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, এক্ষেত্রেও তাঁকে পরাস্ত করতে হবে। হলও তা-ই। রাজ্জাক খান ও তাঁর সহযোগীদের নিয়ে আমরা আমাদের নিজেদের জন্য একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করলাম। এটিও ছিল একটি সফল অনুষ্ঠান যেখানে রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রজগতের অসংখ্য ব্যক্তির আগমন ঘটেছিল। ভয়েস অভ আমেরিকা আমার বক্তৃতার অংশবিশেষ প্রচার করল, যা শুনতে পেল সারা দুনিয়ার মানুষ। ডন-এর সংবাদদাতা নাসিম—যিনি পরে ভুট্টোর তথ্যসচিব হয়েছিলেন, পাকিস্তান তাঁকে পাঠাল আমার প্রচারের পালটা জবাব দেওয়ার জন্য। তাঁর সঙ্গে সহযোগী হিসেবে এলেন আরও এক সাংবাদিক কুতুবুদ্দিন আজিজ। নাসিম আহমেদ আমার সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বটে, তবে অনুষ্ঠান শোনার চাইতে প্রশ্নকর্তাদের আমার উদ্দেশে সিরিয়াস প্রশ্নের জোগান দিতেই তিনি বেশি উৎসাহী ছিলেন। আমার সম্মেলনের সাফল্য ছাড়াও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ সকল প্রচারমাধ্যমকে যেভাবে আকৃষ্ট করল এবং ব্যাপক প্রচার পেল তা এম. এম. আহমেদকে এতটাই হতাশ করল যে তিনি তাঁর নিজের সংবাদ সম্মেলন শেষ পর্যন্ত বাতিল করে দিলেন।

যে-সময়ে ইউএস কংগ্রেস ও প্রচারমাধ্যমসমূহ আমার প্রতি এতটা সমর্থন দিচ্ছে, সে-সময়েও নিক্সন প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছুনো ছিল আমার জন্যে খুবই কষ্টসাধ্য। তখন আমরা হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরিকল্পনা করলাম। কিসিঞ্জার হার্ভার্ডে তাঁর আন্তর্জাতিক সেমিনারে বেশকিছু বাঙালিকে শিক্ষাদানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ফলে, আমাদের এরকম ধারণা হয়েছিল যে, তিনি হয়তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিবহাল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা দেখতে পেলাম যে, মার্কিন প্রশাসন বাঙালিদের হাতের নাগালে চলে এসেছে। আমাকে পরামর্শ দেওয়া হল যেন আমি কেমব্রিজে চলে যাই এবং কিসিঞ্জারের প্রাক্তন সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করি। কিসিঞ্জারের সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করবার পেছনে একটি উদ্দেশ্যই কাজ করেছিল। আর তা হচ্ছে, যাতে তাঁরা আমাকে কিসিঞ্জারের শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত হবার জন্য সুযোগ করে দেন। সেখানকার বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ডর্‌ফম্যান ছাড়াও আমি দেখা করলাম সরকার বিভাগের কয়েকজন কিসিঞ্জার-সহকর্মীর সঙ্গে। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক ও কিসিঞ্জারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অধ্যাপক স্যামুয়েল হান্টিংটন এবং অধ্যাপক লজের সঙ্গেও দেখা করলাম। কিন্তু এসব যোগাযোগ কোনো কার্যকর ফল বয়ে আনল না।

ওয়াশিংটনে কর্মকর্তা পর্যায়ে আমি সবচাইতে বেশি যা করতে পারতাম তা হচ্ছে—স্টেট ডিপার্টমেন্টের বাংলাদেশ ডেস্ক-এর কর্মকর্তা এনায়েত করিম, ক্রেইগ বেক্সটার এঁদের সঙ্গে এঁদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করা, যদিও আমি বিশ্বব্যাংকের কনসালটেন্ট টম হাক্সহারের মাধ্যমে ইউএস এইড-এর ডেপুটি ডিরেক্টর মরিস উইলিয়ামসের সঙ্গে দেখা করলাম। আমার মনে পড়ে, সেই বৈঠক করা হয়েছিল শুধু এজন্য, যাতে মরিস উইলিয়ামস এই বক্তব্য দেন যে, বাংলাদেশ প্রত্যাশা করছে, যদি ওয়াশিংটন বাংলাদেশ প্রসঙ্গ সিরিয়াসলি নেয়, তা হলে দেশটি সামরিক তৎপরতায় তার সামর্থ্য দেখাতে পারবে।

ওয়াশিংটনে আমার অন্য টার্গেটটি ছিল বিশ্বব্যাংক। এটি তখন পর্যন্ত পাকিস্তান কনসোর্টিয়ামের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং সত্যিকার অর্থেই এটি তখন আন্তর্জাতিক কমিউনিটিতে পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান মুখপাত্র।

বিশ্বব্যাংকে আমার প্রথম যোগাযোগ ঘটল এক ইংরেজের সঙ্গে যাঁর নাম আই. পি. কারগিল। তিনি তখন তার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং এমন এক ব্যক্তি যিনি পাকিস্তান কনসোর্টিয়ামে সভাপতিত্ব করেন। তিনি আবার এম. এম. আহমেদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন এবং এটা তাঁদের আই. সি. এস.-এর সময় থেকেই। ফলে, পাকিস্তান বিষয়ে তিনি বেশ ভালোই জানেন। প্যারিস কনসোর্টিয়ামের সদ্যসমাপ্ত এক বৈঠকে কারগিলের পরামর্শে এর সদস্যরা ব্যাংক-ফান্ড মিশনের পূর্ববাংলার পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখে রিপোর্ট করবার আগ পর্যন্ত সাময়িক সময়ের জন্য পাকিস্তানে তাদের পরবর্তী সাহায্য বন্ধ করে দেয়। কারগিল দীর্ঘ সময় ধরে আমার বক্তব্য শুনলেন। তিনি আমাকে এই ধারণা দিলেন যে, বাংলাদেশে সামরিক অভিযান বন্ধ না হলে পাকিস্তানের জন্য নতুন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নাও আসতে পারে।

বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারার ব্যাপারে কারগিলের সহযোগিতা ছাড়াই ব্যাংকের অন্যান্য বন্ধুর যথেষ্ট চেষ্টার পর আমাকে জানানো হল যে, ম্যাকনামারা আমার সঙ্গে বৈঠকে বসতে রাজি হয়েছেন। আমাকে বলা হল যে তাঁর কম্পিউটারপ্রবণ মন শুধুমাত্র মূল তথ্যগুলোই ধারণ করতে পারবে। ওয়াশিংটনে আমার অন্যান্য বন্ধুর সহায়তায় এ-ব্যাপারে প্রস্তুতি নেওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করলাম যেখানে এই আবেদনের কথা উল্লেখ করা হল যেন পাকিস্তানে সাহায্যপ্রদান বন্ধ রাখা হয়। এই কাগজপত্রগুলো একই সঙ্গে ছাপানো হল এবং সর্বত্র প্রচারের জন্য ছড়িয়ে দেওয়া হল। আমার যতদূর মনে পড়ে—এই পেপারটির শিরোনাম ছিল 'এইড টু পাকিস্তান : ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড অপশনস'। এই পেপারটি প্রকাশিত হবার পর আমাদের এই সংক্ষিপ্ত বৈঠকে ম্যাকনামারাকে সমস্যার মানবিক দিকগুলোর কারণে যথেষ্ট প্রভাবিত বলেই মনে হল। অন্তত তিনি আমাকে এই আশ্বাস দিলেন যে, সঙ্কটের প্রকৃতি বিবেচনা করে বিষয়টির ওপর ভালোভাবেই খেয়াল রাখা হবে। বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে ম্যাকনামারার কর্মকাণ্ডের ভূমিকাকে বাদ দেওয়া খুবই কষ্টকর। বিশেষ করে, পাকিস্তানে এইড কনসোর্টিয়ামের ব্যাপারে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা ছিল বেশ ইতিবাচক। যে-দিকগুলো দেখা দরকার তা হচ্ছে, ব্যাংক পাকিস্তানে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাল এবং সেই প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংসতার ওপর একটি ভয়াবহ রিপোর্ট পেশ করল যেখানে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হল যে, এই অঞ্চলে সকল উন্নয়ন-প্রক্রিয়া একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। মিশনের এই রিপোর্ট হারুন-উর রশিদের কাছে ফাঁস করা হল এবং তিনি *নিউইয়র্ক টাইমসে* তা প্রকাশ করে দিলেন। আর এই রিপোর্ট শেষ পর্যন্ত আমেরিকায় মূল্যবান অবদান রাখল—যার ফলে স্যাক্সবি-চার্চ সংশোধনী করা সম্ভব হল এবং পাকিস্তান এইড কনসোর্টিয়ামের সদস্যরা ১৯৭১-এর জুনে প্যারিস বৈঠকে পাকিস্তানকে সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে নতুন প্রতিজ্ঞাপত্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কংগ্রেস, বিশ্বব্যাংক এবং প্রচারমাধ্যমসমূহের সঙ্গে বৈঠক করা ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল বাঙালি অধিবাসীদের মধ্যে বেড়ে গজিয়ে-ওঠা নেতৃস্থানীয় কয়েকটি গ্রুপের সঙ্গেও আমি যোগাযোগ অব্যাহত রাখলাম। এফ. আর. খানের (বর্তমানে মৃত) নেতৃত্বে বাঙালিদের অন্যতম প্রধান গ্রুপটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাঙালিদের বাংলাদেশ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবার কাজে নিয়োজিত ছিল। এ ছাড়াও তারা নিয়োজিত ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধে সহায়তার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের কাজে।

আমার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাস ও নিউইয়র্কের জাতিসংঘ মিশনের বাঙালিদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহের কাজে এই গ্রুপটিকে কাজে লাগানো। কেননা, এরা বেশ আগেই বাংলাদেশের পক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। বাঙালিদের মধ্যে এবং মিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বেশ ভুল-বোঝাবুঝি ছিল, যেটি আমি কাটানোর চেষ্টা করলাম। ওয়াশিংটনে আমার চূড়ান্ত কাজ ছিল মিশনের সকল সদস্যের সঙ্গে তাঁদের সাহায্য করবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের একটি হিসেব তৈরি করা এবং তাঁদের বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা করে দেওয়া। যতটুকু মনে পড়ে, একটি তারিখও ঠিক করা হল—এটা ছিল সম্ভবত ১ জুলাই ; যেদিন তাঁরা সকলেই জনসমক্ষে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁদের অনাস্থা প্রকাশ করবেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে তাঁদের সংহতি ঘোষণা করবেন। এরপর আমি ওয়াশিংটন থেকে নিউইয়র্ক গেলাম এবং সেখানে বসবাসরত বাঙালি কমিউনিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করলাম। শিকাগোতে আমি এফ. আর. খানের সঙ্গেও কথা বললাম। তাঁর সঙ্গে কথা বলার মূল কারণ ছিল, তাঁর কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা আদায় করা যে, তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ মিশনকে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগান দেবেন।

এসব কর্মকাণ্ড ছাড়াও আমি বাকি সময়গুলোতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে তাঁদের সমর্থন আদায়ের জন্য আলাপ করলাম। নিউইয়র্কে আমি *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর জিম ব্রাউনের সঙ্গেও আলাপ করলাম, তিনি পরে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হামলা নিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনামূলক লেখা লিখেছিলেন। এ ছাড়াও আমি টিভিতে আরও কয়েকটি অনুষ্ঠান করলাম। এরপর ফিলাডেলফিয়ার সুলতানা আলমের আমন্ত্রণে আমি একটা বেশ মূল্যবান সফর করলাম সেখানে। ক্রিপেনড্রফে তিনি বাংলাদেশের সমর্থনে এক সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন, সেখানে আমি তাঁদের উদ্দেশে এক জরুরি ভাষণ দিলাম। অন্যান্য গ্রুপও, যেখানে বাঙালি ছাড়াও ছিল আমেরিকানরা ; আমার বক্তব্য শোনার জন্যে হাজির হল। বাঙালিরাই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এ-কাজে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমার অবস্থানের শেষদিকে বাঙালিদের একটি অ্যাকশন গ্রুপের অনুরোধে অটোয়ায় গেলাম আমি। এদের ধারণা ছিল, বাংলাদেশ সরকারের একজন মুখপাত্র হিসেবে সেখানে আমার উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ হবে। অটোয়ায় পৌঁছেই আমি সেখানে একটি সংবাদ সম্মেলনে ভাষণ দিলাম। সংবাদ সম্মেলনে প্রচুর দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি ছিল। অনুষ্ঠানের পর আমি অটোয়ার সংসদের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে লাঞ্চ করলাম। দুপুরের এই ভোজসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বিরোধী শিবিরের একজন ছায়া বিদেশমন্ত্রী। বিকেলবেলা একজন ক্যাবিনেট সদস্যের সঙ্গে গোপন সাক্ষাৎকারে মিলিত হবার জন্য আমাকে একটি প্রাইভেট ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হল। একজন মন্ত্রী হিসেবে তিনি প্রকাশ্যেই আমাকে নিয়মমাফিক সাক্ষাতের সুযোগ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি আমার প্রতি ছিলেন বেশ সহানুভূতিশীল। সন্ধ্যায় আমি অটোয়ায় বসবাসরত বাঙালিদের সঙ্গে মিলিত হলাম। অটোয়ায় আমার একদিনের সফর ছিল পুরো কর্মসূচির মধ্যে সবচাইতে কার্যকর দিবস।

মে মাসের শেষদিকে আমি লন্ডনে ফিরে এলাম। লন্ডনে অল্প কয়েকদিন অবস্থানকালে দেখলাম যে, জনমতের হাওয়া বাংলাদেশের পক্ষেই বইছে—এবং তা বেশ ভালোভাবেই। কিউ গার্ডেনে জুডিট হার্টের বাসভবনে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। এই মহিলা ছিলেন বৈদেশিক সাহায্যের লেবার ফ্রন্ট বেঞ্চের একজন মুখপাত্র। সৌভাগ্যক্রমে তিনি পরবর্তী লেবার সরকারের বিদেশ উন্নয়নমন্ত্রী হিসেবে তখন নিযুক্ত হয়েছেন। আমাদের বৈঠকের পরপরই তিনি হাউস অব কমন্সে বাংলাদেশের সপক্ষে বেশ কর্তৃত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। লেবার সরকারের বিরোধীদলের পক্ষে তিনি দাবি করলেন যে, পাকিস্তানে ব্রিটেনের সাহায্য স্থগিত করতে হবে এবং ব্রিটেনকে এই সংকল্প ব্যক্ত করতে হবে যে, বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ হবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তারা পাকিস্তানকে কোনোরকম সাহায্য প্রদান করবে না। শুধু তা-ই নয়, বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্রিটেনকে সংলাপ চালু করতে হবে। এসব ছাড়াও আমি টোরি ও লেবার-এর সংসদ সদস্যদের সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলাম। আমি আবারও স্যার ডগলাস হোমের কাছে আমার বক্তব্য পৌঁছে দেবার জন্য নিকোলাস ব্যারিংটনের সাথে আমার সম্পর্ককে ব্যবহার করলাম। এ ছাড়া প্যারিস কনসোর্টিয়াম বৈঠকে ব্রিটেনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এবং বিদেশ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করলাম এবং তাঁদের কাছে আমাদের মেমোরান্ডাম পৌঁছে দিলাম।

মার্কিন কংগ্রেস ও ওয়াশিংটনে ম্যাকনামারার কাছে পাকিস্তানে সাহায্যবন্ধের আমাদের যে-দাবি আমরা তুলেছিলাম তা একইভাবে এখানেও উল্লেখ করা হল। ব্রিটেনের বাঙালি সম্প্রদায়ের কাছে প্রচারের এই পদ্ধতিটিই প্রধান কৌশল হয়ে উঠল। প্রবাসী বাঙালি সম্প্রদায় বলে পরিচিত ব্রিটেনে বসবাসরত বাঙালিরা পাকিস্তানে সাহায্যপ্রদানের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের জনমত গড়ে তোলার জন্য এবং অর্থসংগ্রহের জন্য বেশ তৎপর হয়ে উঠল। বাংলাদেশের সংগ্রামের পক্ষে প্রধান মুখপাত্র হিসেবে কথা বলবার জন্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে আফিশিয়ালি দায়িত্ব প্রদান করা হল এবং এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি পূর্ব লন্ডনের লিভারপুল স্ট্রিট স্টেশনের কাছে একটি অফিস খুললেন।

এ-সময় সৌভাগ্যবশত লন্ডন সফরে এলেন গ্যাঞ্জেস (Ganges) রেস্তোরাঁর মালিক তাসাদ্দুক আহমদ ও তার স্ত্রী রোজমেরি। তাঁরা আমাকে বৈঠক করবার জন্য এবং মোটামুটিভাবে লন্ডন অফিস হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য তাদের জেরার্ড স্ট্রিটের রেস্তোরাঁর ওপরে তাঁদের যে-স্টোররুমটি ছিল তা ব্যবহারের জন্য দিলেন এবং অন্যান্য ব্যাপারেও বেশ সহায়তা করলেন। কিন্তু সেখানে আমি বেশকিছু মজার বিরোধিতার মুখোমুখি হলাম। এর একটি ফিজোর সঙ্গে, যিনি নাগা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের একজন প্রবাসী নেতা। তাঁর সঙ্গে আমার একটি বৈঠকের সকল রকমের ব্যবস্থা তৈরি করা হল। এটা করা হল এই ধারণা থেকে যে, যেহেতু বেইজিং-এর ক্ষমতাসীন চীনা নেতাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে, কাজেই তিনি হয়তো বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের সমর্থন আদায়ের জন্য তাঁর অফিসকে ব্যবহার করতে পারবেন। কারণ চীনারা বাংলাদেশের পক্ষে কোনো অবস্থান নেয়নি তখনও। গ্যাঞ্জেস-এ আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ফিজো তাঁর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে চীনাদের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে নাগা বিষয়ে আমাকে প্রভাবিত করতেই তাঁকে বেশি আগ্রহী মনে হল। ফলে সেই বৈঠক মজার হলেও তা একেবারে বিফলে গেল।

ব্রিটেনে অবস্থানের সময় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু লেখার সুযোগও আমি গ্রহণ করলাম। এক ফাঁকে আমি বামপন্থি সাপ্তাহিক *দি নিউ স্টেটসম্যান*-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঝালাই করে নিলাম এবং তাদেরকে বাংলাদেশে গণহত্যা নিয়ে লেখা একটি নিবন্ধ প্রকাশের জন্য দিলাম। সেই নিবন্ধে আমি পাকিস্তানে বিদেশী সাহায্য যে ইয়াহিয়ার শাসনকালকেই আরও স্থায়ী করবে সে-বিষয়েও আলোকপাত করলাম। শেষ পর্যন্ত *দি নিউ স্টেটসম্যান*-এর সম্পাদক আমার লেখার উল্লেখযোগ্য অংশগুলো নিয়ে পত্রিকার প্রথম পাতায় সম্পাদকীয় লেখার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সেখানে পাকিস্তানে সাহায্যবন্ধের দাবিটিই ছিল প্রধান। সম্পাদক জন হোয়াইটের অনুরোধে আমি সাউথ এশিয়ান রিভিউর জন্যও একটি নিবন্ধ লিখলাম। সেখানে আমি প্রথমবারের মতো সমঝোতার পরিপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে সামরিক অভিযানের কথা উল্লেখ করলাম। এসব ছাড়াও আমি *গার্ডিয়ান*-এর জন্যও একটি নিবন্ধ লিখলাম।

আমার এই সফরের সময় অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের একটি বিশাল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতেও আমি অংশগ্রহণ করি। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেন দুজন সহানুভূতিশীল পাকিস্তানি—আকবর নোমান ও তারিক আবদুল্লাহ। এতে প্রচুর লোক অংশ নেয় এবং অধ্যাপক ডানিয়েল থরনার বক্তৃতা করেন। ডানিয়েল যখন ঢাকার পিআইডির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখন তিনি পাকবাহিনীর গণহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি প্যারিসের সোরবোনে ফিরে এসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা

সংগ্রামের একজন নেতৃস্থানীয় মুখপাত্রে পরিণত হন। ডানিয়েল ছাড়াও তারিক আলি নামের অন্য এক পাকিস্তানিও পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অভিযানের কঠোর সমালোচক ছিলেন। এবং তিনিও স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলতে শুরু করেন। তিনি অবশ্য এটিকে দেখলেন একটি বৈপ্লবিক ঘটনা হিসেবে যেখানে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়া হিসেবে দুই বাংলার ঐক্যবদ্ধ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী সম্পর্কে তার কটু মন্তব্যের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্যালাবিতে উপস্থিত একজন প্রশ্নবাণে তাঁকে রীতিমতো জর্জরিত করে ফেলল। পরে জানা গেল যে এই প্রশ্নকারী পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মকর্তা। এই অনুষ্ঠানে ভুট্টোর পিপলস পার্টির একজন প্রতিনিধিও বক্তৃতা করেন। এটা প্রত্যাশা করাই যাচ্ছিল যে পাকিস্তান প্রসঙ্গ এখানে তেমন সহানুভূতি পাবে না। আমি ছিলাম অনুষ্ঠানের সর্বশেষ বক্তা এবং আমি দর্শক-শ্রোতাদের কাছ থেকে বেশ উষ্ণ সাড়া পাচ্ছিলাম। প্রায় সকল গণসমাবেশেই এটা ছিল আমাদের মোটামুটি সাধারণ ধারণা যে আমরা সহানুভূতি পাব।

লন্ডন থেকে আমি গেলাম প্যারিসে। আমার যতদূর মনে পড়ে, ৭ জুন তারিখে পাকিস্তান এইড কনসোর্টিয়ামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের সময় প্যারিসে উপস্থিত থাকার জন্য আমি গিয়েছিলাম সেখানে। এই বৈঠকের প্রতি পাকিস্তানিদের বেশ আস্থা ছিল যে তারা দাতাদেশগুলোর পক্ষ থেকে নতুন নতুন সাহায্যের আশ্বাস পাবে। কেননা যুদ্ধের কারণে তাদের আমদানি-ক্ষমতা প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হয়। প্যারিসে আমি ডানিয়েল ও এলিস থরনারের সঙ্গে অবস্থান করছিলাম। থরনারের সঙ্গে ছিলেন আরও একজন—তিনি ছিলেন পিআইডিই-র ডঃ হাসান ইমাম। মাত্র কিছুদিন আগে তিনি ভারত হয়ে প্যারিসে এসেছেন। ডানিয়েল, হাসান ইমাম ও আমি ম্যাকনামারাকে যে-পেপারটি দিয়েছিলাম সেটা ভিত্তি করেই কনসোর্টিয়ামের জন্য একটি মেমোরান্ডাম প্রস্তুত করলাম। এরপর মেমোরান্ডামটি আমরা কনসোর্টিয়াম বৈঠকের আগের রাতেই সকল প্রতিনিধির কাছে বিলি করলাম। আমরা অবশ্য কনসোর্টিয়ামের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করারও চেষ্টা করলাম। কেউ-কেউ আমাদের কথা শুনলেনও। তবে অধিকাংশই আমাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন না। আমি বৈঠকের আগের দিন রাতে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদলের উপপ্রধান ভোটারের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি ছিলেন একজন আমেরিকান। তিনি আমাকে বললেন যে কনসোর্টিয়াম হয়তো নতুন কোনো সাহায্যের আশ্বাস নাও দিতে পারে। আমি বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট পিটার কারগিলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললাম। তিনি তখন সবেমাত্র পাকিস্তান থেকে ফিরেছেন। তিনি তাঁর দলের উপনেতার কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। তবে বৈঠক শেষ হয়ে যাবার পর তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

আমরা তিনজন কনসোর্টিয়ামে লবি করার চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। এ ছাড়াও বাঙালিদের একটি গ্রুপ প্যারিসে চলে এল এবং কনসোর্টিয়ামের বৈঠক যে-বাড়িটিতে হচ্ছিল তার সামনে মিছিল করল। মিছিলকারীদের প্রত্যেকের হাতেই ছিল প্ল্যাকার্ড, যাতে তারা দাবি করছিল যেন পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কনসোর্টিয়াম বৈঠক শেষ হওয়ার পরদিন সকালে রয়েল মঁশিয়ে নামের একটি পাঁচতারা হোটেলে নাস্তার টেবিলে আমি পিটার কারগিলের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি আমাকে একটি ভালো খবর দিলেন। তিনি জানালেন যে, কনসোর্টিয়াম বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার আগে সাহায্যের নতুন কোনো আশ্বাস দিতে অস্বীকৃতি

জানিয়েছে। কনসোর্টিয়ামের কর্মকর্তারা ঢাকা ও ইসলামাবাদ ঘুরে আসার পর কারণিশ যে-রিপোর্ট দিয়েছেন তার দ্বারা তাঁরা খুবই প্রভাবিত হয়েছেন।

বৈঠকে তিনি এটা বিশ্বাস করাতে পেরেছেন যে পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি ভয়াবহ রকমের অস্থিতিশীল। বেশকিছু সদস্য বৈঠকে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা নিলেও বেশিরভাগ সদস্যই পাকসেনাদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণের চাপকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। পাকিস্তানের অস্থিতিশীল এই পরিবেশে উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে এই অজুহাতে তারা সাহায্যের নতুন কোনো আশ্বাস দেয়নি। মার্কিন প্রতিনিধিরা পাকিস্তানের সমর্থনে বেশ নমনীয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং সাহায্যের ব্যাপারে তাঁরা তেমন জোর করেননি। বরং কনসোর্টিয়ামের সিদ্ধান্তই মেনে নিয়েছেন তারা।

কনসোর্টিয়ামের বৈঠক পাকিস্তানের জন্য ছিল একটা বড় ধাক্কা এবং আন্তর্জাতিক জনমতকে প্রভাবিত করবার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ—যে-কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সাধারণভাবেই প্রাথমিকভাবে একটি সমর্থন আদায় করা গেল।

কনসোর্টিয়ামে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া ছাড়াও ডানিয়েল বাংলাদেশের সঙ্কটকে প্রভাবশালী ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের কাছে তুলে ধরবার জন্য আমার প্যারিস উপস্থিতিকে কাজে লাগাতে শুরু করলেন। আমি সেখানকার সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠক করা ছাড়াও নেতৃস্থানীয় ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে, বিশেষ করে রেমোঁ আরো ও সামাজিক নৃবিজ্ঞানী লুই দুমো, আরবি ভাষাবিদ ম্যাক্সিম রবিনসন—এঁদের সঙ্গে দেখা করলাম। আমি সরবোনে একটি সেমিনারও করলাম। আমরা জানতে পারলাম যে ফরাসি সরকারও পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সে একটি প্রভাবশালী জনমত তৈরির মাধ্যমে এই অস্ত্রবিক্রির পথ বন্ধ করে দেওয়া। সত্যিকার অর্থেই ফরাসি সরকারের ওপর একটি কর্তৃত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করাই ছিল পাকিস্তানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন স্বাধীনতা বিনিময়ে পাকিস্তান অস্ত্র সরবরাহের একটি শিডিউল দাবি করল, তখন সৌভাগ্যক্রমে ফ্রান্সই অস্ত্র সরবরাহের চুক্তি বাতিল করে দিল।

প্যারিস থেকে আমি গেলাম রোমে। সেখানে আমি অল্প সময় থাকলেও ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামকে কিছু প্রস্তাবসমৃদ্ধ একটি স্মারকলিপি প্রদান করলাম। স্মারকলিপিতে প্রদত্ত প্রস্তাবসমূহে বলা হল পাকিস্তানে খাদ্যসাহায্যের ভান করে সাহায্য যেন বাংলাদেশ সরকারের নামে পাঠানো হয়, যাতে পরে এই সাহায্য পূর্বাঞ্চলের জনগণের মধ্যে বিতরণ করা যায়। এটা ছাড়াও আমি আরও কয়েকটি জরুরি কাজ করলাম। আমি তিনটি প্রধান ইতালীয় রাজনৈতিক দল—ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটস, কমিউনিস্টস ও সোশালিস্টদের কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করলাম। আমি তাঁদের কাছে এই সমর্থন চাইলাম যেন তাঁরা পাকিস্তানে ইতালীয় সাহায্য বন্ধ করার উদ্যোগ নেন। যদিও ইতালীয়রা পাকিস্তান বা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের উল্লেখযোগ্য দাতাদেশ ছিল না, কিন্তু তার পরও এই উদ্যোগের অর্থ ছিল তাদের মানসিক ও আচরণগত সমর্থন আদায় করা।

আমি আমার প্রচারকাজের ফলাফলের রিপোর্ট মুজিবনগর সরকারের কাছে পেশ করার জন্য রোম থেকে ফিরে এলাম। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে যখন সেখানে অবস্থান করছিলাম, তখন দেখতে পেলাম যে আমার অনেক বন্ধু ও প্রাতিষ্ঠানিক

সহকর্মী প্রকাশ্যে চলে এসেছেন। আমরা উপলব্ধি করলাম, এটাই উপযুক্ত সময় যখন স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য কিছু দিকনির্দেশনা দেওয়া যায়। এই চিন্তাভাবনা থেকেই আমি বাংলাদেশ সরকারের কাছে বাংলাদেশ পরিকল্পনা পরিষদ গঠন করার জন্য প্রস্তাব দিলাম। আমার প্রস্তাবে একবার উল্লেখও থাকল, সেখানে আমি ছাড়াও এই পরিষদের সদস্য থাকতে পারেন অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, অধ্যাপক সারওয়ার মুরশেদ, ডা: আনিসুজ্জামান এবং ডা: স্বদেশ বসু। এই প্রস্তাবটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সকলে গ্রহণ করলেন, কিন্তু এটি বাস্তবায়ন করতে বেশকিছু সময়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। মুজিবনগর থেকে আমি আবার যখন মাসখানেক পর ইউরোপে গেলাম, তখন পরিকল্পনা পরিষদ বাস্তবায়নের পুরো দায়িত্ব পড়ল অধ্যাপক মোশাররফ হোসেনের ওপর। এদিকে অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী প্রকাশ্যে চলে আসার পরপরই তাঁকে এই পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হল। এবং যুদ্ধের প্রায় শেষদিকে মন্ত্রণালয়ের জন্য কিছু নীতিনির্ধারণী খসড়া প্রস্তুত করার জন্য এই পরিষদ তার কাজ শুরু করে দিল।

মুজিবনগরে থাকার সময়েই আমি আবার মেজর খালেদ মোশাররফের সঙ্গে দেখা করলাম। মেজর খালেদ তখন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তিনি ছিলেন একজন সেক্টর কমান্ডার। তিনি আমাকে বেলোনিয়ার যুদ্ধসংক্রান্ত তাঁর প্রতিবেদনটি দিলেন। এটি তিনি তৈরি করেছিলেন একজন ব্রিটিশ টেলিভিশন সাংবাদিক ভেনেসা কাউলির জন্য যিনি ছিলেন যুদ্ধের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। এই মহিলা সাংবাদিকটির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল লন্ডনে। তখন আমি তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, যদি তিনি সরাসরি যুদ্ধ দেখতে চান—তা হলে যেন তিনি মেজর খালেদের সঙ্গে দেখা করেন। এই সফরের সময়েই আমি প্রথমবারের মতো মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি ছিলেন অন্য একটি সেক্টরের কমান্ডার। জিয়ার কাছ থেকে আমি চট্টগ্রামের লড়াই সম্পর্কে বিস্তারিত শুনলাম। যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কেও তিনি তাঁর বিশ্লেষণ বললেন। এ ছাড়াও আমি মুক্তিবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওসমানী এবং ডেপুটি চীফ অভ স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন খোন্দকারের সঙ্গে দেখা করলাম।

মুক্তিবাহিনীর যেসব ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির সঙ্গে আমি কথা বলেছি, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই বললেন যে, প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য স্বতঃস্ফূর্ততাবেই যুবকরা আকৃষ্ট হচ্ছে এবং এগিয়ে আসছে। মেজররা আমাকে এও জানালেন, কী পদ্ধতিতে গেরিলাযুদ্ধ সংগঠিত করছেন তাঁরা। তবে, অসংখ্য যোদ্ধা এই অভিযোগও করেছেন যে, ভালো এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক যুদ্ধাস্ত্রের অভাবের কারণেই তাঁরা কার্যকর প্রতিরোধ তৈরি করতে পারছেন না। পরে আমি জানতে পারলাম যে, আগস্ট মাসে ভারত সরকার তাদের নীতি নির্ধারণ করে ফেলেছে যে তারা মুক্তিবাহিনীকে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করতে এবং এর সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এগিয়ে আসবে।

বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমার প্রচারকাজসংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং পরিকল্পনা পরিষদসংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেই পাকিস্তানে বিদেশী সাহায্য বন্ধ করার জন্য আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের কাজে ইউরোপ ও আমেরিকায় চলে গেলাম। এবার আমি আগের চাইতে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী এজন্য যে, এবার সরকারিভাবেই আমাকে অর্থনৈতিক বিষয়ে অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। আগস্ট মাসে আমি লন্ডন পৌঁছে দেখলাম, স্থানীয় বাঙালিরা বাংলাদেশ বিষয়ে প্রচার চালানোর ক্ষেত্রে রীতিমতো ঢেউ তুলেছেন। তাঁরা ট্রাফালগার স্কোয়ারে একটি বিশাল

র‍্যালি পর্যন্ত সংগঠিত করেছেন। সংবাদপত্রের প্রবল সমর্থন ছাড়াও সকল রাজনৈতিক
দল পাকিস্তানে সাহায্য পাঠানোর বিরোধিতা করে তাদের সংসদ উত্তপ্ত করে তুলেছে।
তা ছাড়া টোরি সরকারও বাধ্য হয়েছে নতুন সাহায্য বন্ধ রাখতে।

লন্ডনের চ্যাটহাম হাউসে একটি সমাবেশের আয়োজন করল রয়েল ইন্সটিটিউট
অভ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ারস, যেখানে আমাকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ
জানানো হল। সমাবেশের দর্শক-শ্রোতারা ছিলেন খুবই অভিজাত শ্রেণীর। কিন্তু আমি
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সময়মতো সেখানে উপস্থিত হতে পারলাম না। কারণ আমার স্ত্রী
সালমা আমাদের ছেলেদের নিয়ে তখন মাত্র ব্রিটেনে পৌঁছেছে। আমার বাসায় তখন
তার সঙ্গে ছাড়াও আমি কথা বলছিলাম লেবার পার্টির এমপি আর্থার বটমলির সঙ্গে
যিনি কিছুদিন আগেই মাত্র পাকিস্তান সফরশেষে ব্রিটেনে ফিরেছেন। আর্থার বটমলিকে
পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছিল ব্রিটিশ সংসদ সদস্যদের প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে
পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখে এসে রিপোর্ট করবার জন্য। সালমা পরিস্থিতি
সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জানাল আমাকে। বটমলিও তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা
করলেন। চ্যাটহাম হাউস থেকে আমি আবার আমন্ত্রিত হলাম অক্টোবরে অনুষ্ঠিতব্য
সমাবেশে বক্তৃতা করার জন্য।

ব্রিটেন থেকে আমি আবার ওয়াশিংটন গেলাম। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই
ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের সকল বাঙালি কর্মচারী এবং জাতিসংঘে কর্মরত
বাঙালিরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ঘোষণা করল। এটা ছিল একটি
বিশাল কূটনৈতিক অভ্যুত্থান—যেহেতু এটি ছিল একটি বিরাট গ্রুপ এবং এঁদের মধ্যে
ছিলেন পদের দিক থেকে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন
গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। বিদ্রোহী এই গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য জাতিসংঘের পাকিস্তান
মিশনের ডেপুটি স্থায়ী প্রতিনিধি এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা
এস. এ. করিম চলে এলেন নিউইয়র্ক থেকে এবং এই গ্রুপটি সকলের উজ্জ্বল
উপস্থিতিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করল। নজর এড়ায় না এমন
একজন বাঙালি শুধু এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না—তিনি এনায়েত করিম।
সংবাদ সম্মেলনের মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে
হাসপাতালে পাঠানো হয়। যা-ই হোক, তিনি রোগশয্যায় থেকেই অন্যান্য বাঙালির
সঙ্গে তাঁর একাত্মতা ঘোষণা করলেন। জুনের প্রথম দিকেই আমরা জানতে
পেরেছিলাম যে, পাকিস্তানে প্রেরিত বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর মিশনের রিপোর্ট
বিশ্বব্যাংকের কয়েকজন কর্মকর্তা *দি নিউইয়র্ক টাইমস*-এর কাছে ফাঁস করে
দিয়েছেন। শুধুমাত্র কনসোর্টিয়ামেই যে এই রিপোর্টটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলল তা-
ই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও কংগ্রেস ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের
দাতাদেশগুলোর ওপরও এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ল।

এ-সময়ের মধ্যেই নানারকম যোগাযোগের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ
আন্দোলন অনেকটাই সংগঠিত হয়ে উঠেছে। মার্কিন জনগণের সমর্থন ততদিনে
এতটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কমিটেড ও আদর্শবাদী আমেরিকানরা মিলে গঠন
করলেন বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যেখানে তাঁরা নিজেরাই বাংলাদেশের
সংগ্রামের জন্য কাজ করতে তাঁদের প্রবল উৎসাহের কথা জানালেন। এই
সংগঠনগুলোর মধ্যে সবচাইতে কার্যকর গ্রুপটি হচ্ছে—ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ তথ্য
কেন্দ্র। এই গ্রুপটি স্যাক্সবি-চার্চ সংশোধনীর জন্য কার্যকর লবিং করার দায়িত্ব নিল।

বাঙালি কূটনীতিবিদদের প্রয়োজনীয় সংখ্যা ও উপস্থিতি এবং মার্কিন জনগণ ও
কংগ্রেসের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ক্রমবর্ধমান সমর্থন
বাংলাদেশের সরকারকে উদ্বুদ্ধ করল ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের একটি স্থায়ী মিশন
স্থাপন করার ব্যাপারে। ওয়াশিংটনের উপকণ্ঠে কানেকটিকাট অ্যাভিনিউতে এর অফিস
নেওয়া হল। মিশনের প্রধান করা হল এম. আর. সিদ্দিকীকে। এ ছাড়া বিদ্রোহী অন্য
বিশিষ্ট কূটনীতিবিদরাও যুক্ত হলেন এই মিশনের সঙ্গে। জাতিসংঘ এবং নিউইয়র্ক
অঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া হল এস. এ. করিমকে। নবগঠিত বাংলাদেশ দূতাবাস এবং
বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র ওয়াশিংটনে স্যাক্সবি-চার্চ সংশোধনীর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা
গ্রহণের প্রধান কার্যক্ষেত্রে পরিণত হল। সংশোধনীতে এই প্রস্তাব রাখা হল যে, মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী-সাহায্য বিলে অন্তর্ভুক্ত পাকিস্তানে মার্কিন সাহায্য বাংলাদেশের
গণহত্যা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে এবং বাংলাদেশে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের
সঙ্গে সংলাপের আয়োজন করতে হবে।

এ ছাড়া মার্কিন সিনেটের বহুদলীয় গ্রুপটি একজন প্রভাবশালী রিপাবলিকান ও
ডেমোক্র্যাটের নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই সিনেটের একটি বিরাট অংশকে প্রভাবিত করতে
সক্ষম হয়েছে। সিনেটসভায় সেই মুহূর্তে সবচাইতে জরুরি রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল
সংশোধনীর জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট অর্জন করা। যখন সংশোধনীর পক্ষে প্রবল
সমর্থন দেখা গেল তখনই এর সমর্থকরা মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকেও জোরালো
পালটা চাপের মুখোমুখি হল। মার্কিন প্রশাসন ইয়াহিয়া প্রশাসনের প্রতি তাদের
সমর্থনকে যথার্থ বলে প্রমাণ করতে চাইল এই অজুহাতে যে তারা ইয়াহিয়া সরকারের
ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চায় এবং সাহায্যবন্ধের যে-কোনো উদ্যোগ পাকিস্তানিদের
প্রতি তাদের প্রভাবকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তারা
পাকিস্তানে অস্ত্রশস্ত্র এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহ অব্যাহত রাখল এবং সিনেটসভায় সিনেটর
কেনেডির মাধ্যমে তা প্রকাশও করল। অন্যদিকে আমেরিকানদের একটি বাংলাদেশ-
সমর্থক গ্রুপ দূরদর্শী প্রচেষ্টা হিসেবে পাকিস্তানে সরবরাহকৃত অস্ত্রশস্ত্রের জাহাজটিকে
নিরস্ত্র করার জন্য পূর্বাঞ্চলীয় বন্দরে পাহারার আয়োজন করলে এই ঘটনা ব্যাপক
মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ওয়াশিংটনে ফিরে আসার পর আমার নিজের চেষ্টা ছিল হিলে কাজ করার ব্যাপারে
মনোনিবেশ করা। আর এটা দরকার ছিল স্যাক্সবি-চার্চ সংশোধনীর ক্ষেত্রে সমর্থন
আদায় করার জন্য। এ-কাজে আমি বাংলাদেশ মিশন এবং বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র—
এই দুটি সংস্থার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলাম। বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র বা বিআইসিকে
এ-বিষয়ে লবি করার জন্য তার কর্মীদের দায়িত্ব দিল। এ-দায়িত্বের মধ্যে ছিল
প্রত্যেক কংগ্রেসম্যানের রাজনৈতিক অবস্থান এবং বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে
ফাইল তৈরি করা। এরপর গোপন সমর্থন আদায়ের একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনামা তৈরি
করা হল। ওয়াশিংটন ছাড়াও সারা দেশের সহানুভূতিশীল আমেরিকান ও বাঙালিদের
আহ্বান জানানো হল ওয়াশিংটনে আসার জন্য এবং এই লবি করার কাজে সহযোগিতা
করার জন্য। এই আহ্বানে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেল। অজস্র লোক ওয়াশিংটনে
আসার জন্য তাদের কাজ ছেড়ে দিল এবং গোপন সমর্থন আদায়ের কাজে তাদের
সময় দিল। আমেরিকানদের পাঠানো হল তাদের নিজ নিজ স্টেটের সিনেটরদের
কাছে। অন্যদিকে নির্দিষ্ট সিনেটরদের প্রভাবিত করার জন্য পাঠানো হল বাঙালিদের।

এই গোপন সমর্থন আদায়ের কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকবার কারণে আমি মার্কিন রাজনীতির জটিল দিকগুলো জানবার সুযোগ পেলাম। আমি আরও জানলাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কীভাবে রাজনৈতিক মতামত প্রভাবিত হয়। এই দলের সঙ্গে জড়িত কিছু-কিছু মার্কিন বন্ধু এবং হিলের কর্মীদের মধ্যে যে বিপুলসংখ্যক বাঙালি একত্রিত হয়েছিল তাদের কারুর কারুর ত্যাগ আমার স্মৃতিতে দীর্ঘদিন জাগরুক থাকবে। হিলের এই কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ দলের যে কয়েকজনের কর্মতৎপরতার কথা আমার মনে পড়ছে, তাঁদের মধ্যে আছেন হিলের একজন ঘোরতর সমর্থক টম ডাইনের স্ত্রী জোয়ান ডাইন এবং ডিগ্রী ক্লাসের তরুণ ছাত্র ডেইভ ওয়েসরো যিনি পরে বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্রের ফুলটাইম সেক্রেটারি হয়েছিলেন। এঁরা ছিলেন বাঙালি তরুণ কায়সার হকের সহযোগী। কায়সার হক এই অফিসে খুবই ভালো কর্মতৎপরতা দেখিয়েছিল। হিলে টম ডাইন, গেরি টিংকার ও ডেল ডাইহান আগে থেকেই ছিলেন পরস্পরের বন্ধু। এঁরা এ-কাজের সঙ্গে যুক্ত হন সিনেটর স্যাক্সবির সহযোগী মাইক গার্টনারের মাধ্যমে। মে মাসে তিনি আমার উদ্দেশ্যে দুপুরের ভোজসভার যে-আয়োজন করেছিলেন—তখন থেকেই সিনেটর স্যাক্সবি ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের একজন ঘোরতর সমর্থক। তিনি যে সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল, তার বড় প্রমাণ তিনি তাঁর নিজের প্রশাসনের বিদেশী সাহায্য বিলে স্বেচ্ছায় সংশোধনী এনেছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান রাখতে গিয়ে হোয়াইট হাউসের নানান চাপের শিকার হয়েছিলেন। এই পর্বে তাঁর সহযোগী মাইক গার্টনার ছিলেন সমর্থন ও পরামর্শদানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য উৎস।

স্যাক্সবি-চার্চ সংশোধনীর ক্ষেত্রে আমাদের গোপন সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা শেষতক এই সংশোধনীকে বাতিলের পর্যায়ে পৌঁছে দেয় এবং সিনেটের ফ্লোরে এ নিয়ে তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এখানে একটি অদ্ভুত রকমের কোয়ালিশন হয়, বিশেষ করে উদারপন্থি সিনেটর ফ্রাংক চার্চ ও দক্ষিণি রক্ষণশীলদের মধ্যে। ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে যে-গণহত্যা চালাচ্ছে তার সমর্থনে উদারপন্থিরা মার্কিন সাহায্যের অপচয় নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। কার্যত দেখা গেল, সংশোধনীর সমর্থক সকল উদারপন্থিই একই ভঙ্গিতে কথা বলছেন। যা-ই হোক, তাঁরা সকলেই যুক্ত হয়েছিলেন রক্ষণশীলদের মাধ্যমে।

১৯৭১ সালে, বিপ্লবের প্রায় ২২ বছর পর সমাজতান্ত্রিক চীন জাতিসংঘে তার আসন থেকে তাইওয়ানকে সরিয়ে ফেলে। পুরো ঘটনাটিই রক্ষণশীল কংগ্রেসিদের ভয়ানকভাবে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তারা এটিকে দেখল মার্কিন সাহায্যনির্ভর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর একটি অকৃতজ্ঞ খেলা হিসেবে। ফলে তাদের আচরণ ছিল অনেকটা এরকম যে, যে-কোনো সময় তারা তাদের সাহায্য বন্ধ করে দিতে পারে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। যেহেতু পুরো বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে গেছে, ফলে সিনেটেরসভায় পুরো সাহায্য বিলটিই অনুকূলে আসবার বদলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। এটি অবশ্যই বাকি দুনিয়ার জন্য বিষয়টিকে অনুকূলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এটি এক অর্থে বাংলাদেশের গোপন সমর্থন আদায়ের যে-প্রচেষ্টা সেদিক থেকে বিজয় বলেই পরিগণিত হল। কারণ কার্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানসহ তার সাহায্যপ্রার্থী সকল দেশের জন্যই নতুন সাহায্য দেওয়ার সকল প্রতিশ্রুতি বাতিল করে দিল।

তবে ঘটনা যা-ই হোক, এই বিজয় অবশ্য যথেষ্ট নয় যে মার্কিন প্রশাসনের পাকিস্তানে সাহায্যপ্রদানকে সত্যিকার অর্থেই আটকে রাখতে পারে। কারণ তখনও নিক্সন প্রশাসন ও তার ন্যাটোভুক্ত সকল দেশই ইয়াহিয়া প্রশাসনের সমর্থকে পরিণত হয়েছিল। কাজেই মার্কিন জনগণ এবং কংগ্রেসিদের মধ্যে আমাদের লবি করবার যে প্রয়োজনীয়তা ছিল, তা ধরে রাখা খুবই জরুরি হয়ে পড়ল। আর এটা দরকার হয়ে পড়ল স্রেফ পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে মার্কিন সাহায্য দেওয়ার যে-কোনো নতুন আশ্বাসকে ঠেকানোর লক্ষ্যে।

ওয়াশিংটনে যখন গোপন সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চলছে, তখনও পাকিস্তানের দাতাদেশগুলোর এইড কনসোর্টিয়ামে প্রভাব খাটানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়ে গিয়েছিল আমাদের জন্য। কাজেই ১৯৭১ সালের অক্টোবরে ওয়াশিংটনের শেরাটন হোটেলে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ বৈঠক আমাদের সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টার অন্য লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হল। যদিও পাকিস্তানকে সাহায্য দেওয়া বৈঠকের আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তবু আমাদের বন্ধুরা পরামর্শ দিল যে, পাকিস্তান এই বৈঠকটিকে তাদের দেশে সাহায্য পাঠানোর প্রতিশ্রুতি-আদায়ের কাজে লাগাতে পারে এবং তাদের সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনা করার জন্য কনসোর্টিয়ামের কাছে আবেদন জানাতে পারে। আমি আর এ. এম. এ. মুহিত পাকিস্তানের ঘটনাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করে নতুন কাগজপত্র তৈরি করলাম। তাতে আমাদের বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ যেহেতু একটি জটিল অবস্থায় আছে, কাজেই পাকিস্তানে এ-সময়ে যে-কোনো সাহায্য এ-পরিস্থিতিকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

আমি আর মুহিত কনসোর্টিয়ামভুক্ত দেশগুলোর প্রতিনিধিদের প্রভাবিত করার দায়িত্ব নিলাম। আমাদের কাজ ছিল যেসব প্রতিনিধি বৈঠকে যোগ দিতে আসবেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলা এবং আমাদের কাগজপত্র তাঁদেরকে দেওয়া। এই কাজে আমাদের একদিন সহযোগিতা করলেন অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কর্মস্থল ছিল ইয়েলে এবং তিনি ছুটে এসেছেন সেখান থেকেই। হোটেলের বাইরে একদিন বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র বা বিআইসি একটি ছোট মহড়ার আয়োজন করল। মহড়ায় অন্যরা ছাড়াও জোয়ান ডাইন অংশ নিলেন। জোয়ান ডাইনের সঙ্গে তাঁর শিশুসন্তানটিও ছিল যে তার বহন করবার ছোট্ট বাহনে করে সেই মহড়ায় এসেছিল। একদিন ঘটনাচক্রে হোটেলের বাইরে মহড়ায় অংশ নিতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন মুহিত এবং নিরাপত্তা প্রহরীরা তাঁকে শেরাটন হোটেল থেকে বের করে দিল। সৌভাগ্যবশত আমি এ-ঘটনার সময় কাছাকাছি ছিলাম এবং মুহিতকে আমাদের কাগজপত্রসহ উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। এ ছাড়াও গোপন সমর্থন আদায়ের সকল কাজ হোটেলের ভেতরে থেকেই করার বিষয়টি ব্যবস্থা করে ফেললাম। এটা ছিল পুনরায় আমাদের জন্য একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা যে, হোটেলের রুমে ও লবিতে প্রতিনিধিদের ধরছি এবং আমাদের কাজে সমর্থন-আদায়ের চেষ্টা করছি। কেউ-কেউ আমাদের কথা শুনলেন, আবার কেউ-কেউ আমাদের বিন্দুমাত্র পাত্তা দিলেন না। আমরা কিছু বিস্ময়কর বিরোধিতারও মুখোমুখি হলাম। এরকম এক ঘটনায় আমি ছুটে গেলাম আমার এক পুরোনো ক্লাসমেটের কাছে। তাঁর নাম শাহপুর শিরাজী। কেমব্রিজে পড়াশোনা শেষ করার প্রায় ১৮ বছর পর দেখা হল আমাদের। তিনি তখন ইরানের ব্যাংক অভ মারকাজির গভর্নর। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,

ইরানের শাহ্ পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য দিচ্ছেন কি না। শাহপুর জানালেন যে বঙ্গবন্ধুর বিচার ঠেকানোর জন্য ইরানের শাহ্ বরং ইয়াহিয়ার সঙ্গে এ-বিষয়ে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করছেন। এই বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করার কোনো উপায় অবশ্য আমার ছিল না।

অন্য ঘটনায় আমরা দেখা করেছিলাম কেমব্রিজে আমাদের অন্য এক বন্ধুর সঙ্গে। তাঁর নাম লাল জয়বর্ধনে। তিনি তখন শ্রীলঙ্কা সরকারের ইকনোমিকস অ্যাফেয়ার্স-এর সচিব। লাল অধ্যাপক ইসলাম ও আমার জন্য শ্রীলঙ্কার অর্থমন্ত্রী এন. এম. পেরেরার সঙ্গে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা তাঁকে জানালাম যে পিআইএ এবং পাকিস্তান এয়ারফোর্স শ্রীলঙ্কায় ল্যান্ড করার যে অধিকার পায় সেটিকে বাংলাদেশে সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র বহন করবার কাজে অপব্যবহার করছে। কিন্তু তিনি এ-ঘটনা অস্বীকার করলেন। তবে আশ্বাস দিলেন যে তিনি বিষয়টি দেখবেন এবং ল্যান্ডিং রাইটকে যাতে পাকিস্তান অন্যায় কাজে ব্যবহার করতে না পারে তা তিনি দেখবেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে সফল হয়েছিলেন কি না তার প্রমাণও পাইনি আমি।

সে-সময়ে আমার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব ছিল। জাতিসংঘে প্রচার চালাবার জন্যও আমি নিয়োজিত হলাম। ১৯৭১ সালের অক্টোবর শুরু হতে যাচ্ছে এমন একটি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রতিনিধিদল পাঠানোর জন্য সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশ সরকার। এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেওয়া হল বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে। ম্যানিলা দূতাবাস থেকে বিদ্রোহ করে চলে আসা রাষ্ট্রদূত কে. কে. পন্নী, ইরাক থেকে বিদ্রোহ করে আসা রাষ্ট্রদূত এ. ফতেহ, ডঃ এ. আ. মল্লিক এবং আমি ছাড়াও আরও বেশ কয়েকজনকে এই প্রতিনিধিদলের সদস্য করা হল। কিন্তু জাতিসংঘে গোপন সমর্থন আদায়ের ফলাফল ছিল আরও হতাশাজনক ; যদিও আমাদের লক্ষ্য ছিল সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার পক্ষে একটি সিদ্ধান্ত (রেজোলিউশন) নেওয়ার জন্য সমর্থন-আদায় করা। আমাদের আশা ছিল, অধিবেশনে বা কোনো কোনো কমিটিতে হয়তো আমাদের পক্ষে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই ঘটল না। কেননা, জাতিসংঘের বেশিরভাগ সদস্য-দেশই নিরুৎসাহী ছিল তাদের অন্য একটি সদস্য-দেশের বিরুদ্ধে কথা বলতে। তারা এটিকে মনে করছিল একটি সদস্য-দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ হিসেবে। এমনকি সেই অবস্থায় 'ভেটো' দেওয়ার ক্ষমতা আছে— এমন কোনো দেশও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে তাদের দেশের জনগণের সমর্থন আমাদের ধার দিল না। ফলে, গোপন সমর্থন আদায়ের প্রাথমিক পর্ব একেবারেই বিফলে গেল।

এ সময়ে আমি বাংলাদেশের পক্ষে বেশকিছু বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করলাম। এসব সমাবেশের প্রতিটিই ছিল দর্শক-শ্রোতায় পরিপূর্ণ। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সিরাকুজ বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক আনিসুর রহমান কর্তৃক আয়োজিত উইলিয়ামস কলেজ এবং অধ্যাপক নূরুল ইসলাম কর্তৃক আয়োজিত ইয়েলের সমাবেশ। এসব ছাড়াও বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ডঃ মহিউদ্দিন আলমগীর ও আমি এম.আই.টি.-তেও একটি সমাবেশে বক্তৃতা দিলাম। সেসব সমাবেশের অনেকগুলোতেই পাকিস্তানিরা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হবার ভয়ে উঠে চলে যেত এবং শেষদিকে রাগ করবার বদলে দুঃখের ভঙ্গিতে তাদের কেউ-কেউ নালিশ জানাত।

এভাবে আমি বেশকিছু সমাবেশে হাজির হলাম এবং বেশ কয়েকটি পত্রিকার জন্য লেখালেখিও করলাম। আমেরিকায় অবস্থানের শেষদিকে আমার দুটি চমৎকার উপস্থিতি ছিল টিভিতে। এ-দুটোর একটি ছিল বস্টনের ব্যক্তিমালিকানাধীন টেলিভিশনের অনুষ্ঠান।

এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছিল আদালতে এবং তা জনগুরুত্বসম্পন্ন কয়েকটি ইস্যুর ওপর ভিত্তি করে, যেখানে দুজন আইনজীবী মামলা রুজু করা এবং তা রক্ষা করার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আইনজীবীদের প্রত্যেককেই তিনজন করে সাক্ষী আনবার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল যাঁরা নিজেদের অভিযোগ বর্ণনা করবেন। যতদূর মনে পড়ে, এই অনুষ্ঠানের আলোচ্যসূচিতে মামলার বিষয় ছিল— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা দিচ্ছে। এই মামলায় বাংলাদেশের পক্ষে আইনজীবী কে ছিলেন তা এ-মুহূর্তে মনে পড়ছে না। কিন্তু বিপক্ষে ছিলেন উইলিয়াম রাশার। রাশার ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচাইতে প্রভাবশালী রক্ষণশীল সাপ্তাহিক *ন্যাশনাল রিভিউ'র* মালিক। এ-সাপ্তাহিক কাগজটি আবার সম্পাদনা করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপরিচিত ডানপন্থি ব্যক্তিত্ব উইলিয়াম এফ. বাকলি জে. আর। রাশার ছিলেন বাকলি'র ডান হাত এবং সম্ভবত চেঙ্গিস খানেরও। উপমহাদেশ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি জন ফস্টার ডালাস-এর সময়ে এসে থেমে ছিল। তিনি এখনও ভারতকে আলাদা করতে পারেন না, যে-ভারত ইন্দিরা গান্ধীর নাকি তাঁর বাবার, যিনি ক্ষমতায় ছিলেন পঞ্চাশের দশকের প্রথমভাগে। তিনি এখনও মনে করেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন। এই টেলিভিশন অনুষ্ঠানটির ব্যাপক দর্শক-শ্রোতা না থাকলেও একটি বেশ চমৎকার অনুষ্ঠান ছিল। কারণ এ অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে বা বিপক্ষে যা-ই হোক না কেন, অন্তত কিছু প্রশ্ন ও অভিযোগ তোলা সম্ভব হয়েছে। রাশার তার মামলার কারণে ভুট্টোর সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য টেলিভিশনের কুশলীদের পাকিস্তানে পাঠালেন। এ ঘটনা বরং আমাদের কাছে একটি পক্ষপাতমূলক প্রমাণ হিসেবেই পরিগণিত হল। এ ছাড়াও রাশার নিউ জার্সির কংগ্রেসম্যান ফ্রেলিংহাউসের সঙ্গে আঁতাত করার চেষ্টা করলেন। ইনি হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং পেপসি-কোলার অন্যতম ব্যবসায়ী। বাংলাদেশের পক্ষে আমাদের আইনজীবী লোবার এমপি জন স্টোনহাউজের সহায়তা চাইলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের একজন ঘোরতর সমর্থক। শুধু টেলিভিশনের এই অনুষ্ঠানটির জন্যই তিনি লন্ডন থেকে উড়াল দিলেন। এ ছাড়াও যুক্ত হলেন ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত এম. কে. রাসগোত্র, যিনি পরে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানে আমিই ছিলাম একমাত্র বাংলাদেশী। অনুষ্ঠান ধারণের সময় স্টুডিওতে দর্শক-শ্রোতা ছিল পরিপূর্ণ। আমি তাঁদের সামনে এবং উৎসাহী অগণিত টিভি-দর্শকদের সামনে আমার বক্তব্য পেশ করলাম।

টিভিতে আমার দ্বিতীয় উপস্থিতি ছিল আরও ঐতিহাসিক মুহূর্তে—এর আগে জাতিসংঘের প্রতিনিধিদলে আমাদের কর্মতৎপরতা আরও বেড়ে গেল, যেহেতু শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ অধিবেশনে উত্থাপিত হয়েছে। কারণ ততদিনে ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক শত্রুতামূলক মনোভাব প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে উত্তর ভারতকে লক্ষ্য করে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর আকস্মিক বোমাহামলা ও আগ্রাসন বাংলাদেশ সীমান্তের একদিকে যেমন চরম উত্তেজনার জন্ম দিল, অন্যদিকে এর ফলে স্বাধীনতাযুদ্ধের তীব্রতাও বৃদ্ধি পেল। এই সময় পর্যন্ত পাকিস্তান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল যে তারা বাংলাদেশ প্রসঙ্গ জাতিসংঘের আলোচ্যসূচিতে

তুলবে না, কিন্তু এখন তারা এই বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক চেহারা দেবার জন্য উঠেপড়ে লাগল। তারা চাইল বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বরং পাক-ভারত যুদ্ধ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে।

এদিকে বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্যদের অভাবিত ফলাফল এবং অন্যদিকে পাকিস্তানি সৈন্যরা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবার কারণে পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির জন্য এবং সীমান্তের অপর পারে ভারতীয় সৈন্যদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে চাপ দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন চাইল। এ-কাজে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রবল সমর্থন পেল। জাতিসংঘে তাদের প্রথম কার্যকলাপ ছিল পাকিস্তানের মামলাটি একটি চিঠির মাধ্যমে পরিচালনার চেষ্টা করা। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ও সাধারণ অধিবেশনে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব বা ভারতীয় সৈন্য-প্রত্যাহারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তারা সুযোগ খুঁজছিল এবং এটা ছিল তাদের জন্য একটি অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্ত। আপাতদৃষ্টিতে প্রায় সকল সদস্য-দেশকেই এই সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ বলে মনে হলেও, যখন তারা এ-বিষয়ে একটি প্রস্তাব নেওয়ার জন্য তৈরি হল তখনই দেখতে পেল যে—তারা মোটামুটিভাবে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে উপস্থিত। এরকম পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন যৌথভাবে নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানে যুদ্ধবিরতির জন্য সিদ্ধান্তের প্রস্তাব দিলে তা সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেল। কিন্তু এই পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নই তার এক 'ভোটো' দিয়ে বন্ধ করে দিল। এই 'ভেটো'-ক্ষমতাকে এড়ানোর জন্য একই রকম আরেকটি প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আনা হল, যেখানে সদস্যরা প্রায় সকলেই প্রস্তুত যুদ্ধবিরতির যে-কোনো প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন জানানোর জন্য। এই সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটিও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। অধিবেশনে এ-সংক্রান্ত বিতর্কে যেসব বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল আমি তা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখছিলাম, খুব কম দেশই প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের পক্ষে ইতিবাচক অর্থে সমর্থন দিয়েছে—বরং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সাধারণ বিধিবিধানের আওতায় শান্তির সমর্থনেই তারা যুদ্ধবিরতির পক্ষে সমর্থন দিয়েছিল।

জাতিসংঘে সংঘটিত এই নাটকের দর্শক ছিলাম আমরা বঙালিরা। এই নাটক আমরা দেখতে পেলাম গ্যালারিতে বসেই। জাতিসংঘে আমরা গোপন সমর্থনের যে-চেষ্টা চালিয়েছিলাম তাতে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে অনেকের ব্যক্তিগত সহানুভূতি পেলেও অধিবেশনের সময় ফ্লোরে খুব সামান্যই সমর্থন পেলাম। বেশির ভাগ বক্তা বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের জনগণের ওপর পাকিস্তানি সৈন্যদের গণহত্যা এবং ৯ মাসের আগ্রাসনের ব্যাপারটি ভুলে গেলেও অবিলম্বে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে খুবই মনোযোগী ছিলেন। নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমি নিজে যেসব লবি করেছিলাম তার ফলে নিউইয়র্কের ব্যক্তিমালিকানাধীন টেলিভিশনে উপস্থিত থাকবার জন্যে আমি আমন্ত্রণ পেলাম। এই চ্যানেলের বৈশিষ্ট্য ছিল, এটি নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ অধিবেশনের কার্যাবলির ওপর একটি ফিচার অনুষ্ঠান করবে। সাধারণ অধিবেশনে যে-বিতর্ক হয়েছিল—সেটার সঙ্গে যুক্ত করেই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এতে প্যানেল করা হয়েছিল দুটো যার একটি গঠিত হয়েছিল শুধু আমেরিকানদের দিয়ে। যতটুকু মনে পড়ে, এই প্যানেলে ছিলেন টম ডাইন, *নিউজউইক*-এর আর্নল্ড ডি বোর্চগ্রেভ এবং অন্য একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। এঁদেরকে যুক্ত করবার ফলে আলোচনার ধরন হয়ে উঠল ক্রিকেটীণক—যেখানে আলোচনা চলবে নিউইয়র্কে অবস্থিত পাকিস্তানি কনসাল জেনারেল নাজমুস সাকিব খান, ভারতীয় কনসাল জেনারেল ও আমার মধ্যে। আর এতে আমি কথা বলব বাংলাদেশের পক্ষে।

পাকিস্তানি কনসাল জেনারেলকে নির্দেশ দেওয়া হল যেন তিনি আমার সঙ্গে একই প্লাটফর্মে উপস্থিত থাকতে অস্বীকার করেন, যাতে তাঁকে এবং তাঁর ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে একই সঙ্গে পর্দায় দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এর ফলে যখন আমি পর্দায় এলাম—অদ্ভুতভাবে ঠিক তখনই সাধারণ অধিবেশনের ভোটগণনা হচ্ছে ফলাফল ঘোষণার জন্য। ঠিক যে-সময়ে আমি আমার বক্তব্য পেশ করার জন্য মুখ খুলেছি, ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে এবং প্রায় সকলেই অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং ভারতীয় সৈন্য-প্রত্যাহারের পক্ষে তাঁদের রায় দিয়েছেন। ক্যামেরা ঘুরে আবার আমার ওপর এসে নিবদ্ধ হল এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাপারে কোনো সমর্থন যে পাওয়া গেল না, তার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে এবং এ-বিষয়ে আমার জবাব কী? আমার যতদূর মনে পড়ে আমি খুব দ্রুত জবাব দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে, 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যেখানে গণহত্যা চালাচ্ছে, সেই বাংলাদেশ যুদ্ধের মূলে থাকলেও বাংলাদেশ-পাকিস্তান বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশকে সাধারণ অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কাজেই বাংলাদেশের জনগণ এবং বাংলাদেশের সরকার সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের কোনো পক্ষ হিসেবে অংশ নেয়নি, ফলে যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানি আগ্রাসনকে পরাজিত না করছে, ততদিন পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব।' বাংলাদেশ পরিস্থিতি এবং জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সংঘটিত বিতর্কের ওপর আমার বক্তব্য এবং উপস্থিত বিশ্লেষণ দর্শক-শ্রোতারা বেশ ভালোভাবেই গ্রহণ করলেন। এই ঘটনার মাত্র একদিন পরেই কয়েকজন অজ্ঞাত ব্যক্তি আমাকে নিউইয়র্কের রাস্তায় থামালেন। এঁরা টেলিভিশনে আমার বক্তব্য শুনেছেন এবং আমার যথার্থ মন্তব্যের জন্য খুবই প্রশংসা করলেন।

যা-ই হোক, তখন প্রকৃত নাটক চলছে বাংলাদেশে। তা ছাড়াও কিছু অংশ অভিনীত হচ্ছে জাতিসংঘে। ইতিমধ্যে আমরা জানতে পারলাম যে, প্রায় শেষ মুহূর্তে ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলি ভুট্টোকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তিনি নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তান প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার জন্য শিগ্‌গিরই নিউইয়র্কে আসছেন। কিন্তু, বাংলাদেশের মাটিতে সংঘটিত বেশকিছু ঘটনা শেষ পর্যন্ত ভুট্টোর নিউইয়র্ক ফ্লাইটকে অনিশ্চিত করে তুলল। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর অভাবিত অগ্রগতি এবং পাকিস্তানি প্রতিরক্ষাব্যবস্থা একেবারে তছনছ হয়ে যাবার কারণে জাতিসংঘ বিতর্কে নিজেদের মুখ তাদের নিজেদেরকেই বন্ধ করে দিতে হল। পাকিস্তানের জাতিসংঘ মিশনে কাজ করেন এমন একজন বাঙালি 'সাইফার ক্লার্কের' (গুপ্ত ও সাংকেতিক লেখা লিখতে ও পড়তে পারেন যাঁরা) মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম, একজন 'টপ সিক্রেট' সাইফার এই রিপোর্ট নিয়ে এসেছে যে জেনারেল নিয়াজি এখন অগ্রবর্তী বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য অনুমতিলাভের অপেক্ষা করছেন। আমরা আরও জানতে পারলাম যে, ঢাকায় জাতিসংঘ প্রতিনিধি পল মার্ক হেনরি রাও ফরমান আলির পক্ষ থেকে এরকম একটি মেসেজ পেয়েছেন যাতে তিনি বলেছেন তাঁর অফিস এখন একটি আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করছে যেখানে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হবে যে, বাংলাদেশ থেকে নিরাপদে পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রত্যাহার করা যাবে।

বিমানবন্দরেই ভুট্টোকে সংবর্ধনা জানাবার পাশাপাশি এ-খবর জানিয়ে দেওয়া
হল। আর এই খবর নিঃসন্দেহে তাঁর জন্য ছিল বিব্রতকর। নিরাপত্তা পরিষদে তাঁর
অভ্যুত্থান-পরিকল্পনাদাতারা তাদের উন্নাসিকতার জন্য তখন খুবই বিপদে পড়ল।
এরকম একটি পরিস্থিতির জন্য ভুট্টো মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে তিনি পরবর্তী
কয়েকটি দিন জাতিসংঘে মার্কিন প্রতিনিধি জর্জ বুশ এবং জাতিসংঘে চীনা প্রতিনিধি
হিসেবে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত হুয়ান হুয়াংয়ের সঙ্গে গল্পগুজব করে কাটালেন। আমাদের
কাছে এটা স্পষ্ট ছিল না, তাঁদের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছিল। কিন্তু শিগ্‌গিরই আমরা
জানতে পারলাম যে, না, কোনো আত্মসমর্পণের কথা নয়। আমাদের মনে হল—
ইসলামাবাদ থেকে নিয়াজি এবং ফরমান আলির আত্মসমর্পণের বিষয়টি বাতিল করে
দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের এই ভরসা দেওয়া হয়েছে যে তাঁদের জন্য নতুন সহায়তা
আসছে শিগ্‌গিরই। ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর কাছে এরকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল যে,
উত্তর দিক থেকে চীন এবং সমুদ্রপথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক সাহায্য দেবে। হঠাৎ
করেই আমরা দেখতে পেলাম যে, নিরাপত্তা পরিষদের আরেকটি অধিবেশন ডাকা
হয়েছে, যেখানে ভুট্টো ভাষণ দেবেন।

আবারও জাতিসংঘের বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা নিরাপত্তা পরিষদের গ্যালারির দর্শকে
পরিণত হলেন নিরাপত্তা পরিষদে ভুট্টোর অভিনয় দেখার জন্য। এদিকে আমরা
নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য-দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা
চালানোর চেষ্টায় সময় ব্যয় করতে থাকলাম। তাদের পেছনে সময় ব্যয় করবার
উদ্দেশ্য একটাই—তাদের কাছে এই আবেদন জানানো, যাতে তারা যুদ্ধবিরতির
দাবির ব্যাপারে তাদের অবস্থানকে আরেকটু নমনীয় করে। আমরা তাদেরকে এটা
বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, এ-মুহূর্তে বাংলাদেশের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। নিরাপত্তা
পরিষদে বেশিরভাগ মুখপাত্রই তখন একমত হলেন যে বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তব
বিষয় এবং এর সমাধান একটাই—সম্মিলিত বাহিনীর দ্রুত বিজয় এবং যত শিগ্‌গির
সম্ভব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ। তাঁরা আরও একমত হলেন যে, মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্র ও চীন নিরাপত্তা পরিষদকে ব্যবহার করছে। তারা এরকম একটি ধারণা তৈরি
করতে চেয়েছিল—যেহেতু তারা তাদের বন্ধু ইয়াহিয়া খানকে সমর্থন জানিয়েছে,
কাজেই তার জন্য তারা সম্ভাব্য সবকিছুই করছে। নিরাপত্তা পরিষদের এই সভায়
আমরা অক্সফোর্ডে পরিচিত আরও একজন ব্যক্তিকে পেলাম যিনি পরিষদের জাপানি
প্রতিনিধি। তিনি এরপর নিয়মিত দেখা করতেন আমার সঙ্গে এবং নিরাপত্তা পরিষদের
সর্বশেষ তথ্য ও পরিস্থিতি আমাকে জানাতেন।

পরিষদে আমি পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের চোখেই পাক-ভারত-বাংলাদেশ
বিতর্কটি দেখছিলাম। ভুট্টো যখন নিরাপত্তা পরিষদে তাঁর ভূমিকা পালন করছিলেন,
তখনই এরকম একটি খবর আমরা শুনতে পেলাম যে, নিক্সন তাঁদের সপ্তম নৌবহরকে
বঙ্গোপসারের দিকে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তবে নৌবহরটি কেন এ-অঞ্চলে
আসবে তা ব্যাখ্যা করা হল না। মার্কিন প্রশাসন হঠাৎ করেই ভারতের নিন্দায় পঞ্চমুখ
হয়ে উঠল। এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিপর্যয়
ঠেকানোর জন্য এ-ব্যবস্থা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেষ মিনিটের সিদ্ধান্ত। আমাদের
ধারণা নিয়াজির কারণেই এই হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে যুদ্ধবিরতি
কার্যকর করবার জন্য একটি ভিত্তি তৈরি করা যায় এবং পাকিস্তানের মর্যাদা রক্ষা পায়।
নিরাপত্তা পরিষদের নাটকে যে-পার্শ্বঅভিনয় চলছিল সেটারই পূর্ণাঙ্গ অভিনয় শুরু হয়
বাংলাদেশে।

হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বা ভারতের উত্তর-পূর্ব সেক্টর থেকে চীনাদের [illegible]
বিষয়টি ছিল শুধুই সম্ভাবনা মাত্র। আমরা শুনেছিলাম, ভুট্টোর প্ররোচনায় পাকিস্তানি
সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সামরিক কর্মকর্তা পিকিং-এর এই
হস্তক্ষেপের উদ্যোগ নিয়েছিল। আমি নিজে এ-সম্পর্কে আগে থেকেই জানতাম।
অক্টোবরের শেষদিকে আমি বেইজিং-এ পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত কে. এম. কায়সারের সঙ্গে
একটি গোপন সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছিলাম। কায়সার জেনেভায় এসেছিলেন
পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতদের একটি সম্মেলনে যোগ দিতে। এই সম্মেলনের আয়োজন
করেছিলেন পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। কায়সার গোপনে প্যারিসে উড়ে গিয়েছিলেন শুধু
আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। তিনি আমাকে এই গোপন তথ্যটি জানিয়েছিলেন যে,
চীন পাকিস্তানকে রক্ষা করবার জন্য কোনোরকম সামরিক হস্তক্ষেপ করবে না। তারা
তাদের অস্ত্রসাহায্য এবং কূটনৈতিক সহায়তা দিলেও গোপনে পরামর্শ দিয়েছিল
পাকিস্তানকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌছানোর জন্য,
যদিও তারা প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে সমর্থন জানানোর নানান কায়দা দেখাচ্ছিল। আমি
তাঁর কথামতো সব তথ্যই জানিয়েছিলাম বাংলাদেশের সরকারকে যদিও পরে
জেনেছিলাম এসব তথ্য জোগান দেওয়ার জন্য আমিই একমাত্র চ্যানেল ছিলাম না।
বেইজিং-এর পাকিস্তান দূতাবাসের বেশকিছু বাঙালিও ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে
বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশে এসব তথ্য পাচার করেছিলেন। আমি অবশ্য জানি না,
এসব গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এ-অঞ্চলে বিশেষ কোনো সামরিক কৌশলের পরিকল্পনা
নেওয়া হয়েছিল কি না।

নিরাপত্তা পরিষদের ভেতরে ও বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও পাকিস্তান এমন
কৌশল গ্রহণ করল যে, ক্ষমতা থাকলে সম্মিলিত বাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে
আত্মসমর্পণের জন্য বাধ্য করুক। এই পরিস্থিতি ১০ ডিসেম্বরের সময়। কিন্তু শেষ
মুহূর্তে ইসলামাবাদ এই নির্দেশ দিল, যে-কোনোভাবেই হোক পাকিস্তানি সেনাবাহিনী
যেন আত্মসর্মপণের জন্য কিছুটা সময় নেয়। কারণ তাদের ধারণা ছিল, বাইরের সাহায্য
হয়তো এসে পড়বে এরই মধ্যে। আমি যখন দেশে ফিরবার পথে নিউইয়র্ক ত্যাগ করে
লন্ডনে এলাম, ততদিনে পুরো পরিস্থিতি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের কারণে যুদ্ধের নতুন মাত্রা পাবার সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়ে গেল। কল্পনাতেও
আর ঠাঁই পেল না সপ্তম নৌবহর।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বহুপ্রত্যাশিত আত্মসমর্পণের খবর আমরা যখন পেলাম
তখন আমি অক্সফোর্ডে। আমরা টেলিভিশনে এই দৃশ্য দেখতে পেলাম যে, জেনারেল
নিয়াজি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তাঁর অস্ত্র লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার
কাছে সমর্পণ করছেন। তবে এটা তখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত যেখানে জেনারেল
নিয়াজির সেনাবাহিনীকে সহায়তা দেবার জন্য সপ্তম নৌবহর আসছে তখন তিনি কেন
আত্মসমর্পণ করছেন। হয়তোবা এটাই নিক্সনের আরেক ধরনের সম্পর্কের নমুনা যে
সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েই তিনি এটা প্রমাণ করতে চাইলেন যে তারা সত্যি সত্যি
পাকিস্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমর্থন এ-
ধরনের হস্তক্ষেপের পক্ষে একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। প্রচারমাধ্যম এসব বিষয়ে তখন
রীতিমতো উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে চার্চ, কেনেডি এবং বাংলাদেশের অন্যান্য
বন্ধুর নেতৃত্বে জ্যাক এন্ডারসন তাঁর প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলেন যেখানে তিনি ফাঁস
করেছিলেন নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবগুলো। এতে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের

উদ্দেশে নিক্সন যে ভারতের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সে-সম্পর্কে কিসিঞ্জারের প্রতিবেদনগুলোও তুলে ধরলেন। এটা যদিও দেখা গেছে যে মার্কিন জনগণ, প্রচারমাধ্যম বা কংগ্রেসিদের মতামত বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তত সহানুভূতিশীল নয়, কিন্তু নিক্সন প্রশাসন ছিল আরেক কাঠি এগিয়ে—তারা এসব অগ্রাহ্য করেই সমর্থন জানিয়েছিল পাকিস্তানকে। নিক্সন প্রশাসনের সহানুভূতিহীনতা বা মার্কিন জনগণের উদাসীনতার পরেও আমাদের প্রচারকাজের চেষ্টা—এগুলোর কোনোটাই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

আমরা শেষ পর্যায়ের দাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করলাম এটা দেখার জন্য যে, তারা পাকিস্তানে নতুন কোনো সাহায্যের আশ্বাস দিচ্ছে কি না। আর এর জন্য নভেম্বরের প্রথম দিকে আমাকে শেষবারের জন্য প্যারিস সফরে যেতে হল পাকিস্তান কনসোর্টিয়ামের বৈঠকের আগে। এ ছাড়াও কারগিলের সঙ্গে আরেকটি প্রাতরাশের বৈঠক নিশ্চিত করতে হল যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ ছাড়াই কনসোর্টিয়াম পাকিস্তানকে নতুন কোনো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি অথবা ঋণ না দেয়।

আমাদের এ-ধরনের অবস্থানে পাকিস্তানের মুখোশ আরও খুলে গেল। তারা হুমকি দিল এ-ধরনের ঘোষণা দেওয়ার যে, তারা একতরফাভাবেই ঋণ-পরিশোধ বন্ধ রাখবে। এ-ধরনের ঘটনা খুব শিগগিরই দাতাদেশগুলোকে, বিশেষ করে জাপানকে খেপিয়ে তুলল। তারা আরও প্ররোচিত হল পাকিস্তানে সকল সাহায্য বন্ধ করে দিতে এবং উদ্যোগ নিল পাকিস্তানের সম্ভাব্য ভূমিকার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নিতে। এ-পর্যায়ে বিশ্বব্যাংক হয়তো উপলব্ধি করল যে পরিস্থিতি সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে এবং পাকিস্তান ও কনসোর্টিয়ামের মধ্যে একটি আপসরফা হওয়া দরকার যেটি পাকিস্তানকে দেনা পরিশোধ না করার উদ্যোগ নেওয়া থেকে বিরত রাখবে।

এখানে আবারও এই সত্য অনুমিত হল যে দাতাদের কাছে আমাদের প্রচার অব্যাহত রাখা প্রয়োজন, যাতে পাকিস্তানে সাহায্যবন্ধের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রতি নমনীয় মনোভাব তৈরি করা যায়। ফলে দেখা গেছে, মে মাসে আমি নিজে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে যে-প্রচারকাজ শুরু করেছিলাম তা থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কনসোর্টিয়ামের সদস্যরা প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানকে কোনো নতুন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়নি। যা-ই হোক, তারা অবশ্য খাদ্য এবং পরিবহন যন্ত্রাংশ সরবরাহের ভঙ্গিতে বিলিয় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। আর ঐ সাহায্যদাতারা দেয় বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনার জন্য এবং শুধুই মানবিক কারণে।

যা-ই হোক, প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের বিদেশী সাহায্যলাভের সম্পূর্ণ সুযোগ তখনও অবশিষ্ট ছিল। তবে বাংলাদেশ অঞ্চলে যে-আমদানি প্রক্রিয়া চালু ছিল, সেটা কঠোরভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার যে-সঞ্চয় এ-অঞ্চলে ছিল কার্যত পাকিস্তান সে-সময় সেটাই খেয়ে ফেলতে থাকে। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, অন্তত পশ্চিম পাকিস্তানে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় আমদানি-প্রক্রিয়া চালু রাখতে চাইছিল পাকিস্তান। তবে দাতাদের কাছে পাকিস্তানে সাহায্যবন্ধের আমাদের যে-আবেদন ছিল, সেটি খুব একটা সার্থক হতে পারেনি। কারণ, দাতারা অভিযোগের সুরে বলছিল—এর ফলে নানারকম আইনগত জটিলতা দেখা দিতে পারে।

ফলে পাকিস্তানের ব্যাপারে আমাদের প্রচার যতটা না ছিল তাদের কার্যকলাপ ধরে রাখার উদ্দেশ্যে, তার চাইতেও বেশি ছিল রাজনৈতিক এবং মানসিক। কিন্তু তারা

সবাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ ভালোভাবেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। পাকিস্তান টিকে গেল, দিনের পর দিন চলে গেলেও তারা সাহায্যের নতুন কোনো আশ্বাসই আদায় করতে পারছে না বরং তারা এই সন্দেহ করতে শুরু করল যে, যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আরও প্রলম্বিত হয়, তা হলে তাদেরকে বড় রকমের অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হবে এবং এর প্রতিক্রিয়া পশ্চিম পাকিস্তান ও তার জনগণের ওপর পড়তে বাধ্য।

নভেম্বরে প্যারিসে আমার শেষ সফরের উদ্দেশ্যই ছিল চূড়ান্ত কনসোর্টিয়াম বৈঠকে 'পুরোনো' পাকিস্তানের পক্ষে যে-সাফাই গাওয়া হবে সে-সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পেশ করা। বৈঠকে আমি বিশেষ সুবিধা ভোগ করলাম বিশিষ্ট ফরাসি নোবেল লরিয়েট আঁদ্রে মালরো (Andre Malraux)-এর সৌজন্যে। কারণ আগেই আমরা পত্রিকায় পড়েছিলাম যে, মালরো ইতিমধ্যেই জনসমক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি তাঁর সমর্থন ঘোষণা করেছেন এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি জার্মান প্রতিরোধযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তাঁর ফরাসি সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করবেন এবং মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য তাঁদের এর সঙ্গে যুক্ত হতে আহ্বান জানাবেন। মালরোর বয়স ছিল তখন ৭০ বছর এবং তাঁর স্বাস্থ্য মোটেও ভালো ছিল না। ফলে এটা স্পষ্ট ছিল না যে, তিনি এ-অবস্থায় বাস্তবে কতটা তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবেন। কিন্তু ড্যানিয়েল থরনার এটা ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারলেন যে, বাংলাদেশ সরকারের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমি অন্তত তাঁর ব্যক্তিত্বকে আমাদের কাজে ব্যবহার করবার জন্য তাঁকে আহ্বান জানাতে পারি।

ড্যানিয়েল আমাকে প্যারিসের অদূরে মালরোর বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে আমি প্রথমবারের মতো এই বিশাল ব্যক্তিত্বের কারণে বৈঠকে বিশেষ মর্যাদা লাভ করলাম। মালরো অত্যন্ত ভালোবাসা দিয়ে আমাদের সম্পর্কে বললেন। তিনি এটাও বললেন যে, স্প্যানিশ সিভিল ওয়ারের সময় তিনি ছিলেন একজন বৈমানিক এবং সে-অবস্থাতেও তিনি এই প্রজাতন্ত্রের জন্য কাজ করার লক্ষ্যে ছুটে গিয়েছিলেন। তবে এটা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন যে, নিজের দেশ ছেড়ে অন্য একটি দেশ নিয়ে উঠেপড়ে লাগতে চান না তিনি সঙ্গত কারণেই। তিনি মনে করেন বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ন্যায়বিচার হওয়া দরকার। যেহেতু যথেষ্ট বয়স হয়েছে তাঁর এবং তাঁর স্বাস্থ্যও ভালো নয়, কাজেই তিনি প্রাক্তন প্রতিরোধযুদ্ধের সৈনিকদের বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করবার জন্য এবং এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাবেন। তিনি উল্লেখ করলেন, এরা গেরিলাযুদ্ধে এদের মূল্যবান দক্ষতা, বিশেষ করে গোলাবারুদ এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে এদের অভিজ্ঞতা দিয়ে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করতে পারবে।

তিনি নিজে যেচেই এরকম একটি দল নিয়ে যেতে রাজি হলেন যারা গোলাবারুদ ও যোগাযোগব্যবস্থার যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত থাকবে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করবার জন্য। তিনি আমার সঙ্গে এরপর এ-অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে একেবারে উৎসমূলভিত্তিক কারিগরি আলোচনায় মগ্ন হলেন। তিনি আমাকে এ-ধরনের যুদ্ধে তাঁর জড়িত হবার ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যার কথাও উল্লেখ করলেন। এ-ব্যাপারে তাঁকে পরামর্শ দেবার ক্ষেত্রে আমার কোনো যোগ্যতাই ছিল না। তবে তাঁর এরকম সহযোগিতাপরায়ণ আচরণের জন্য বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের পক্ষ থেকে আমি তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম। বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাঁর সহযোগিতা-প্রদানের প্রতিশ্রুতির জন্য তাঁকে ধন্যবাদও জানালাম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া ছাড়াও তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি গলিস্ট (Gaullist)

মন্ত্রিসভায় তাঁর প্রাক্তন সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং ফ্রান্স যাতে পাকিস্তানে আর কোনো অস্ত্রসাহায্য না পাঠায় তার জন্য তাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন যদিও পাকিস্তান ঋণ-পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় অস্ত্রসাহায্যের বিষয়টি আপনাআপনিই শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়। পরে অবশ্য মনে হল যে ফ্রান্স অস্ত্রবিক্রির ব্যাপারে রাজনৈতিক বিষয়ের চাইতে তাদের নীতিমালাকেই অধিকতর গুরুত্ব দেয়।

আগেই আমি এটা উল্লেখ করেছি যে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে যখন আমি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর পেলাম সে-সময়ে আমি অক্সফোর্ডে। সে-বছরেরই প্রথমদিকে আমি অক্সফোর্ডের কুইন এলিজাবেথ হাউসের পক্ষ থেকে একটি ফেলোশিপ পেয়েছিলাম, যেটা দিয়ে অক্সফোর্ডে আমি আমার পরিবারের খরচ খানিকটা নির্বাহ করতে পারতাম, যদিও আমি এই ফেলোশিপের খুব সামান্য অ্যাকাডেমিক কাজই করতে পেরেছিলাম। বরং আমি আমার পুরো সময়টাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে ব্যয় করে ফেলি। ফলে একসময় আমার একটি চিন্তা মাথায় এল—অক্সফোর্ডে আমার পরিবারের সঙ্গে থেকেই আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট এবং এর কারণসমূহ নিয়ে একটি বই লিখতে পারি এবং সেটা আমার ফেলোশিপের অর্থের সাহায্যেই করা সম্ভব। যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও অভ্যুদয়ের আনন্দ-উল্লাসের সম্ভাব্য পরিস্থিতির কথা মনে হওয়ায় বাংলাদেশ থেকে দূরে থাকা অসম্ভব একটি বিষয় হয়ে উঠল আমার কাছে। কাজেই আমি ঠিক করলাম কলকাতা হয়ে নিজ দেশ বাংলাদেশে চলে যাব, যদিও তখন পর্যন্ত কলকাতা থেকে ঢাকায় কোনো ফ্লাইট আদৌ ছিল না।

কলকাতায় আমি অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, ডঃ স্বদেশ বসু এবং ডঃ আনিসুজ্জামানের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁরা তখন গত কয়েকমাস ধরেই শরণার্থীদের পুনর্বাসন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করছিলেন এবং এগুলোর জন্য নীতিনির্ধারণী কাগজপত্র তৈরি করছিলেন।

মোশাররফ এরই মধ্যে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার সঙ্গে ঢাকা চলে গেলেন এবং আবার ফিরে এলেন কলকাতায় চলে-আসা তাঁর পরিবারের সদস্যের সংগঠিত করবার জন্য। ১৯৭১ সালের ৩১ ডিসেম্বর জনাব কামরুজ্জামান, মোশাররফ ও আমি অবশেষে ঢাকা বিমানবন্দরের উদ্দেশে উড়াল দিলাম। আমাদের ঢাকা বিমানবন্দর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে এসেছিল ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি প্রাচীন ডিসি-৩ বিমান। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বিমানবন্দরে দেখা হল আমাদের। তাঁর সঙ্গে আমার সর্বশেষ দেখা হয়েছিল এপ্রিলের সেই ভয়াবহ দিনগুলোতে যখন সারা বিশ্বের কাছে প্রচারের জন্য আমি তাঁর ঐতিহাসিক বিবৃতির খসড়া তৈরি করছিলাম।

বিমানবন্দরে যখন পৌঁছুলাম তখন ছিল শীতের সকাল, কিন্তু বেশ উজ্জ্বল ছিল সূর্যের আলো। এরকম একটি অবস্থায় আমাদের মনে হচ্ছিল, যেন বহু বছর ধরে নিগৃহীত এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জনগণের জন্য অফুরন্ত আশা আর সম্ভাবনার বাণী নিয়ে খুব কাছেই অপেক্ষা করছে একটি নতুন বছর।

মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ : ফরিদ কবির

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET